KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪৮/২ ৪৮/৪ ৪৮/৫ ৪৮/৬	Year of Publication জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ ‖ Jun 1987 শ্রাবণ ১৩৯৪ ‖ Aug 1987 ভাদ্র ১৩৯৪ ‖ Sep 1987 আশ্বিন ১৩৯৪ ‖ Oct 1987
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

জুন ১৯৮৭

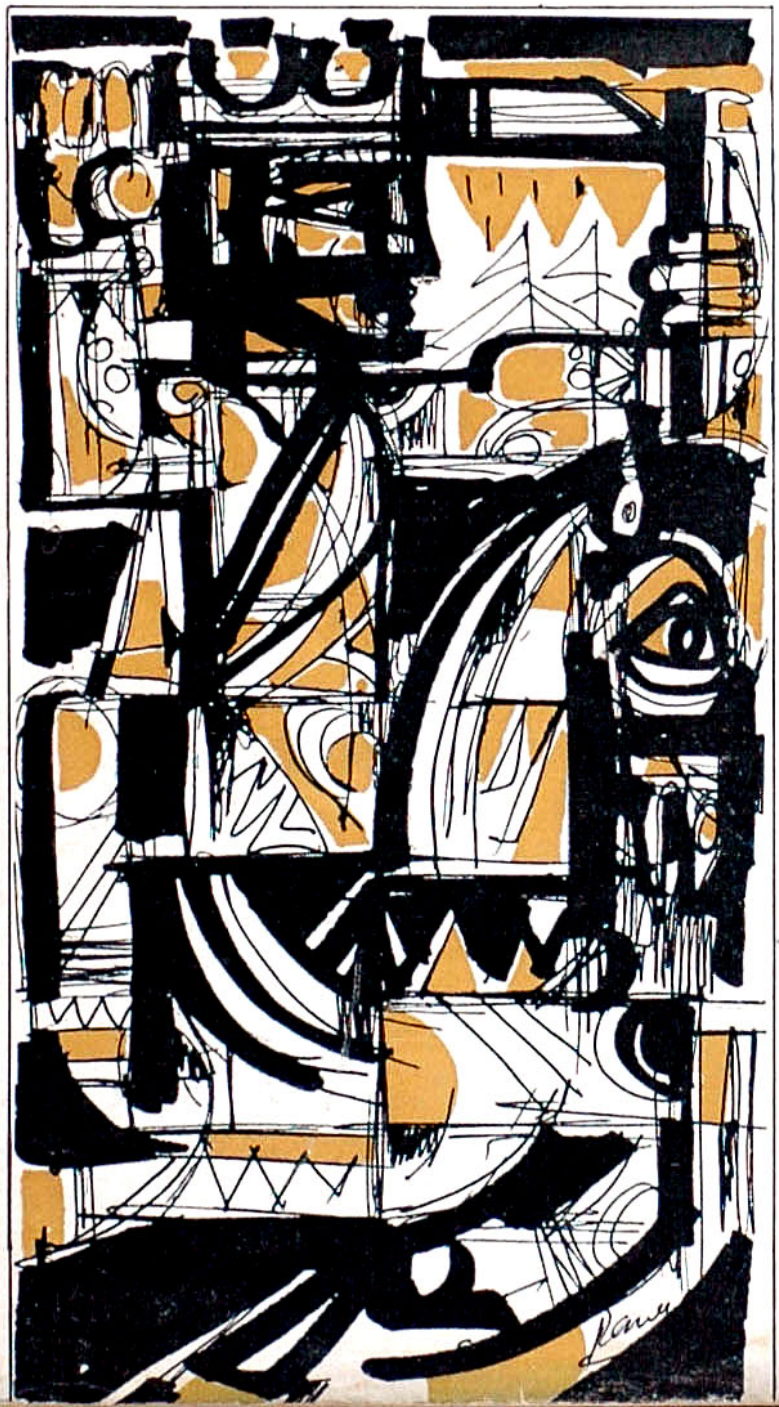

এই সংখ্যায়

ডঃ অমলেন্দু গুহ-র নিবন্ধ "ভারতের জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার প্রশ্ন"— সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রতার উৎস-সন্ধান।

পুঁথির অশুদ্ধ পাঠ সংশোধন করতে গিয়ে মনস্বী পণ্ডিতেরাও পাঠকদের কিভাবে বিভ্রান্ত করেন, সেই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের রচনা "লিপিপ্রমাদ ও শুদ্ধিবিভ্রাট"।

গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিপুল বিস্তার ঘটেছে, কিন্তু প্রদত্ত শিক্ষার মান উন্নীত হয়েছে কি ?— সমীক্ষাভিত্তিক প্রতিবেদন।

বাঙালি মুসলিম সমাজে "বুদ্ধির মুক্তি" আন্দোলনের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ রচনা "মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি"।

সদ্যঃপ্রয়াত চিন্মোহন সেহানবীশের শেষ গ্রন্থ "৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন"-এর আলোচনাপ্রসঙ্গে চল্লিশের দশকে প্রগতি-সাহিত্যের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ের কথা।

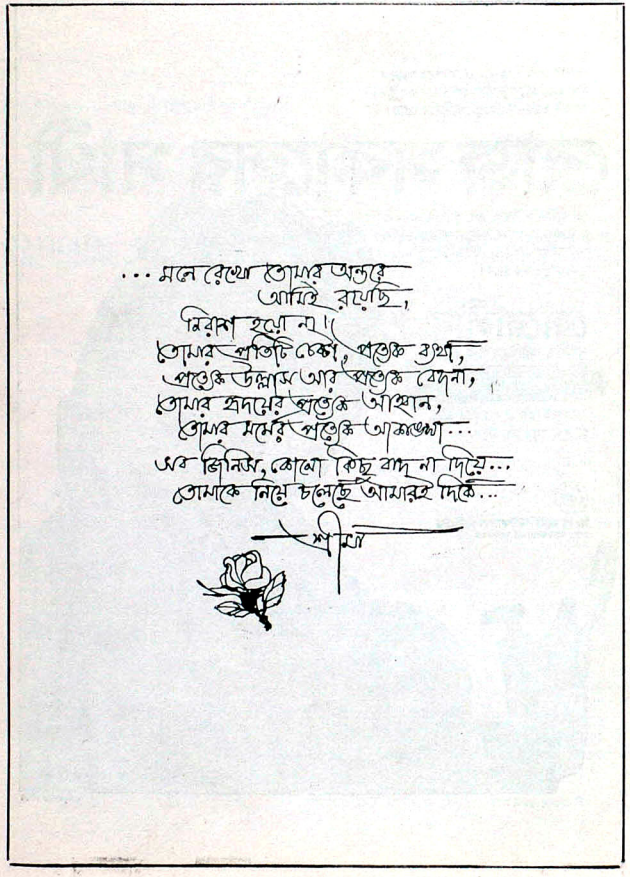

বর্ষ ৪৮। সংখ্যা ২
জুন ১৯৮৭
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

ইতিহাসের আলোকে ভারতের জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার প্রশ্ন অমলেন্দু গুহ ৮৯
লিপিপ্রমাদ ও শুদ্ধিবিভ্রম জ্যোতি ভট্টাচার্য ১২৬
পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ১৪৫
রবীন্দ্রনাথ : মানবতা ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য ১৮২

অগ্রজের অভীচ্ছায়ায় বিরাম মুখোপাধ্যায় ১০৮
ঘরে ফেরার সময় কৃষ্ণ ধর ১০৯
বালখিল্য সুভাষ দে ১১০
নিষ্প্রভ সন্ধ্যায় মেঘ মুখোপাধ্যায় ১১১

অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১১২
পাঁচশো বছর গুণময় মান্না ১৪০

গ্রন্থসমালোচনা ১৫৩
সুশীল জানা, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, কান্তি গুপ্ত

নাটক ১৬৩
থিয়েটার-কর্মীর চোখে সমালোচক সোমেন গুহ

সাহিত্য : সমাজ : সংস্কৃতি ১৬৭
মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি খালিম আহমেদ

প্রতিবেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি ১৭৯
কারিয়ালা কিরণশঙ্কর মৈত্র

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২১

COOK
WITH
RASOI

চলায় পথে নতুন সাথী

VIP III MOPED

- কিক স্টার্ট
- থ্রি-স্পীড গীয়ার
- তেলের সাশ্রয় : 1 লিটারে 89 কি.মি.
- শক্তিশালী ইঞ্জিন
- ফুট ব্রেক
- বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় AGRATI-GARELLI S.p.a.-এর সহযোগিতায় তৈরী

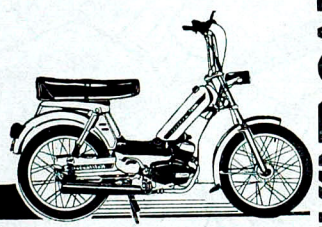

AVANTI GARELLI

AVANTI GARELLI

Sold & Serviced by
Expo Machinery Limited
Santiniketan Bldg. 6th. Floor, 8, Camac Street
Calcutta-700017 Ph: 44-1006/43-1326

A product of
Kelvinator of India Limited

Authorised Dealer

M/s. Karni Trading Corpn.,
N.N. Road,
Cooch Behar-736 101. PH. 205

M/s. Sukanta Pvt. Ltd.,
Hill Cart Road,
Siliguri, Dist: Darjeeling.
PH. 21144

ইতিহাসের আলোকে ভারতের জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার প্রশ্ন*

অমলেন্দু গুহ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের এই তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে মুখ্য ভাষণদানের দায়িত্ব আমার উপরে অর্পিত হয়েছে। সংসদের বয়স মাত্র বছর তিনেক। কিন্তু এরই মধ্যে, ইতিহাসচর্চায় এবং ইতিহাসচেতনার ক্ষেত্র-বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গে সংসদের দান আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাস-সাধনার ঐতিহ্য এই রাজ্যে অনেক কাল ধরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও এখানে এমন একটি সংগঠনের প্রয়োজন ছিল যার মারফত ইতিহাস-গবেষকেরা ইতিহাসপ্রেমীদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে একত্র হয়ে বাঙলা ভাষায় ইতিহাসচর্চার পরিবেশ গড়তে পারেন। সংসদ সেই প্রয়োজনের ফসল।

১

আমাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বপরিস্থিতি তথা ভারতের জাতীয় জীবনের এক মেঘাচ্ছন্ন মুহূর্তে। আজকের পৃথিবীর পয়লা নম্বরের সাম্রাজ্যবাদী দেশ মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা-গরম লড়াই চালিয়েই ক্ষান্ত থাকছে না, মানব-জাতির অধিকাংশের ধিক্কার সত্ত্বেও বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকাকে মদত দিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, মারণাস্ত্রসজ্জা এবং মারণাস্ত্রগবেষণার নেশায় মত্ত হয়ে সারা পৃথিবীকে সম্ভাব্য এক তৃতীয় মহাযুদ্ধ তথা মহাধ্বংসের দিকেও ঠেলে দিচ্ছে। তবে আশার কথা এই যে, দেশে-দেশে, এমন-কি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রেও, অসংবৃত অস্ত্রসজ্জার চরম বিপদ সম্পর্কে চেতনা এবং বিশ্বশান্তির স্বার্থে সোভিয়েত-মারকিন অস্ত্রসংবরণচুক্তি ঘটানোর সপক্ষে আন্দোলন দ্রুত বাড়ছে। জাতিতে-জাতিতে সংঘর্ষ চলতে থাকলে, চলতে দিলে, মানবসমাজ হঠাৎ একদিন এই গ্রহ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কি না—এই প্রশ্নই এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন।

অপর দিকে, ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও আর-এক পর্যায়ে দেখা দিয়েছে এক গভীর সংকট। স্বাধীনতার পরে বহুজাতিসত্তা খণ্ডিত ভারতকে অদূরদর্শী

* ১৯৮৬-র সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে মুখ্য ভাষণ।

বুরজোয়া নেতারা সাচ্চা সম্মিলিত রাষ্ট্রের রূপ না দিয়ে দিয়েছিলেন একীকৃত রূপ, যার মধ্যে ভাষাভিত্তিক রাজ্যের স্বীকৃতি থাকলেও স্বশাসনের পরিসর খুবই সীমিত। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের প্রক্রিয়াটিকেও অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে, এমন-কি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন -নির্দেশিত পুনর্গঠনের পরবর্তী অধ্যায়েও। অথচ, বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে বর্ধমান মূলধনতান্ত্রিক বাজারের ফল হিসাবে নানা ভাঙাগড়া ভারতের জাতিগঠনের প্রক্রিয়ায় লক্ষ করা গিয়েছে। ছোটো-মাঝারি শিল্প, ব্যাবসা এবং চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্কিত নতুন-নতুন উঠতি আঞ্চলিক বুরজোয়াগোষ্ঠী জনসমাবেশের জোরে নিজেদের আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সদাব্যস্ত। ভাষা তো বটেই, এমন-কি সুবিধামতো কোথায়ও ধর্ম (পানজাব), কোথায়ও জাত (হরিয়ানা), কোথায়ও উপজাতি সত্তা (নাগাল্যানড) আর কোথায়ও-বা ভূমিপুত্রত্বের (আসাম) ভিত্তিতে সংকীর্ণ মঞ্চ বানাচ্ছেন। আর তারই ছাঁচে ঢেলে, তাঁরা নতুন করে জাতির সংজ্ঞাও তৈরি করছেন। তারপরে, জাতির নামে ভাই-বেরাদরদের খেপিয়ে তুলছেন ভারতের ভিতরে বা বাইরে স্বরাজ বা গৃহভূমি চাই বলে। শুধু তাই নয়, অঞ্চলভেদে কোনো-না-কোনো বিশেষ সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার দুশমন বলেও চিহ্নিত হচ্ছে।

ভারতীয় বাস্তব পরিস্থিতি থেকে উদ্‌ভূত এ ধরনের গোষ্ঠীচেতনাকে সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, প্রাদেশিকতাবাদ, অথবা সাম্প্রদায়িকতা—যে আখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, তার মর্মবস্তু জাতীয় প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এই প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান না হওয়ায় শুধু যে ভারতের ঐক্য আর সংহতিই বিপন্ন তা-ই নয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রমূল্যবোধে এবং ভারতীয় শ্রমজীবী জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানেও ফাটল দেখা দিচ্ছে। অসম ধনতান্ত্রিক বিকাশের চাপে কি উঠতি জাতিগুলি ক্রমে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে? না, শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের রক্তমূল্যে অর্জিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ঐক্যের ভিতে দাঁড়িয়ে, মহাজাতীয় রাষ্ট্রকাঠামেই শামিল থেকে, অবশেষে তারা এক মহাজাতিতে লীন হবে?—এই প্রশ্নই বর্তমান ভারতে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন।

মহাযুদ্ধের আশঙ্কার মূলে রয়েছে উন্নত মূলধনতান্ত্রিক দেশের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, যার অপর নাম সাম্রাজ্যবাদ বা মূলধনতন্ত্রের শেষ অবস্থা। আর, দেশের সংহতিনাশের আশঙ্কার মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিকতার চাপে অপ-গঠিত, আধা-ধনতান্ত্রিক আধা-সামন্তীয় পরিবেশে জাতিবিন্যাসের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির অসম্পূর্ণতা, বিকৃতি এবং জটিলতা। তাই, উপস্থাপিত জ্বলন্ত প্রশ্ন দুটির প্রেক্ষিতে জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদ সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে চাই। আলোচনা ভারতের দেশকালের বেড়ার মধ্যেই সীমিত রাখার চেষ্টা করব। তবে, তার আগে সাধারণ কয়েকটি কথা বলে নিতে হবে।

২

জাতি কী? জাতীয়তাবাদই বা কী? এক কথায় বলা যায়, স্বরাজ্যের দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা একই সংস্কৃতি- ও মানসিকতা-সম্পন্ন জনসমষ্টিই জাতি, আর এই জনসমষ্টির পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধের ভাবাবেগজনিত প্রকাশই জাতীয়তাবাদ। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। জাতি এবং জাতীয়তাবাদ তো হাওয়ায় উড়ে আসে না, শ্রেণীসমাজের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই এর শিকড়, এবং একদিন এর লয়ও হবে। তাহলে, এর উদ্ভব এবং বিকাশের ক্ষেত্রে কী কী বাস্তব উপাদান কারণ হিসাবে সক্রিয়? সেগুলিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় কি?

প্রচলিত কোনো সংজ্ঞা সম্পর্কেই সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐক্যমত নেই। তবে, ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা আপেক্ষিকভাবে পরিষ্কার। ক্ষমতালোভী বুরজোয়ারা যখন উঠতির মুখে, বাজারই তাঁদের জাতীয়তাবাদ শেখায়। তখন বাজারের প্রসারের পথের অন্তরায় সরানোর জন্য তাঁদের দরকার হয় জনসমাবেশের সহায়ক একটি মতাদর্শের। তাই তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতিতে উপস্থিত একাধিক ঐক্যসূত্রের সুবাদে, সমষ্টিগত ভাবাবেগ জাগিয়ে এই মতাদর্শের গোড়াপত্তন করেন। ক্রমেই জাতীয়তাবাদ পরিণত হয় একটি জনগ্রাহ্য স্বতন্ত্র শক্তিতে এবং, বিশেষ পরিস্থিতিতে, এমন-কি সমাজবাদের সংগ্রাম-এরও সহায়ক হয়ে উঠতে পারে, যেমন হয়েছিল ভিয়েতনামে। জাতিবিষয়ক ব্যাপারটি তাই ইতিহাসে আধুনিক যুগের আওতায় পড়ে। দেশে-দেশে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের যাত্রারম্ভের দিন থেকেই জাতিগঠনের সচেতন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। আবার ঔপনিবেশিক দেশে এই সূত্রপাত ওই সময়ে অন্যভাবেও হয়েছে। সেখানে প্রধানত শোষক বিদেশী মূলধনের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং বাজার স্বদেশী মূলধনের হাতে আনার লড়াইয়ের মারফতই জাতীয়তাবাদ বিকশিত। ভারতেও বাস্তব পরিস্থিতিতে নিহিত সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক ঐক্যসূত্র সম্পর্কে সচেতনতা এই দুই ভাবেই সঞ্চারিত হয়েছে।

ভারতের জাতীয় প্রশ্নের আলোচনায় প্রবেশের আগে, সাধারণভাবে আরো কিছু কথাও বলে নিতে চাই। আমার মনে হয়, 'জাতি'র প্রচলিত নানা সংজ্ঞার মধ্যে স্তালিনের সংজ্ঞাই আপেক্ষিকভাবে সবচেয়ে বাস্তবানুগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংজ্ঞাও যান্ত্রিকতাদোষদুষ্ট। এই সংজ্ঞা অনুসারে ধর্মের ভূমিকা অবান্তর, কিন্তু ভাষাগত ঐক্য জাতিগঠনের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত।[১] স্বয়ং লেনিনও জাতীয় বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষিক বন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে এই বন্ধনকে জাতিগঠনের অন্যতম প্রধান আবশ্যিক উপাদানই বলেছেন। কিন্তু তিনি কখনো ধারণাটিকে ছকে ফেলার চেষ্টা করেন নি। বরং দেখিয়েছেন যে সুইজারল্যানডের মতো দেশও আছে, যেখানে লোকেরা নানান ভাষায় কথা বলেন। তবু, ঐক্যের অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত জাতীয় সংস্কৃতি এবং সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আধারে সুইস জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, অনেক লেখায় লেনিন কাজাক, তাজিক ইত্যাদি জনসমষ্টিকে 'মুসলমান জাতিগুলি' বলতেও দ্বিধা করেন নি।[২] এরও আগে এঙ্গেলস তো স্পষ্টই, বলেছেন, ভাষা সর্বত্র 'জাতীয়তা নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারেনা।' তিনি এই প্রসঙ্গে উদাহরণও দিয়েছেন। বলেছেন, হাঙ্গেরির জারমানভাষীরা নিজেদের ভাষা না ছাড়লেও, অন্য সকল ব্যাপারে একীকৃত (integrated) হয়ে 'মনোভাবে, চরিত্রে ও আচার-অনুষ্ঠানে' পুরোপুরি ম্যাগিয়ার বনে গিয়েছেন।[৩] আমাদের জীবনকালেই দেখেছি, ভাষার ঐক্য একভাষাভাষী পানজাবকে অখণ্ড রাখতে পারে নি। সে কি শুধুই ব্রি..শ ভেদনীতির জন্য? ভাষার ঐক্য সত্ত্বেও আজ ধর্মীয়-ঐক্যাশ্রয়ী ভাবাবেগের ধাক্কায় লেবানন ছিন্নভিন্ন। আবার এও দেখছি যে নানাভাষাভাষী ইহুদিরা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে উড়ে এসে ইজরাইলে জুড়ে বসেছেন আর মৃত হিব্রু ভাষাকেই চালু করে, সেখানে তাঁরা এক নতুন জাতিতে রূপান্তরিত। সেখানে জাতীয়তাবাদ প্রধানত ধর্মীয়-ঐক্যাশ্রয়ী, যেমন দেখছি আমাদের অকালি-শাসিতপানজাব রাজ্যে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্‌ভবের এবং অধুনা সিন্ধি জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে ভাষা এবং ধর্ম উভয়েরই স্পর্শকাতরতা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। জনগণতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তানের সংবিধান-রচয়িতারাও জাতিত্বের অন্যতম উপাদান হিসাবে ক্রমে ধর্মকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের দেশে।

এঙ্গেলসের আর-একটি কথায় আসি। ১৮৮৬ সালেই এঙ্গেলস সাবধান করে দিয়েছিলেন যে অনেক সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা, এমন-কি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিগুলিকে

পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতার পথে উশকিয়ে দেয়। এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লেনিনও ১৯১৬ সালে যা বলেছিলেন, তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

> "Engels emphasises that the proletariat must recognise the political independence and 'self-determination'.....of the great, *major nations* of Europe, and points to the *absurdity of the 'principle of nationalities'* (particularly in the Bonapartist application)' *i.e. of placing any small nation on the same level as* these big ones"—[Lenin, *Collected Works*, Vol. 22 (Moscow, 1964), p. 342n]—(গুরুত্বচিহ্ন আমাদের।)

অর্থাৎ, লেনিন বলতে চেয়েছিলেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা কোথায়ও টানতেই হবে। বড়ো আর খুদে জাতিদের ঢালাওভাবে একই মানদণ্ডে বিচার করাটা অবাস্তব। তাই বিপ্লবের পরে, সোভিয়েত দেশে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছিল অন্তত চার রকমে। ইউনিয়ন রিপাবলিকের ব্যবস্থা শুধু বড়ো জাতিদের জন্য, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ। অন্যদের জন্য ভৌগোলিক বাধ্যবাধকতা, জনসমষ্টির মিশ্র চরিত্র এবং সংখ্যা ইত্যাদির বিবেচনা-সাপেক্ষে স্বশাসিত রিপাবলিক, স্বশাসিত অঞ্চল এবং স্বশাসিত সাংস্কৃতিক এলাকার ব্যবস্থা। সোভিয়েতের জাতিসমস্যার সমাধানসূত্র খোলনলচে সমেত ভারতের বেলায় প্রযোজ্য নয়, তবু এর থেকে অনেকটাই গ্রহণযোগ্য, যেমন নাকি বহুজাতিক চীনের অভিজ্ঞতা থেকেও।

প্রাক-বিপ্লব রুশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে জাতিবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভারতের তফাত অনেকটা। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরে এখন আর আমাদের দেশে কোনো একটি বিশেষ জাতিকে শাসক-নিপীড়ক জাতি বলে চিহ্নিত করা যায় না। এদেশে একচেটে মূলধনীগোষ্ঠী জাতিত্বে পাঁচমিশালি, এবং এই গোষ্ঠীর বৃহদংশের গৃহভূমি কোনো বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ নয়। বড়ো-বড়ো শহর আর পাঁচতারা হোটেলকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা এঁদের সংস্কৃতি ব্যাপক অর্থে সর্বভারতীয়। এঁরা সমগ্র ভারতকে একটি অখণ্ড বাজার হিসাবেই পেতে চান, প্রয়োজনমতো বা চাপে পড়ে বহুজাতিক সংস্থা এবং আঞ্চলিক বুরজোয়ার সঙ্গে সমঝোতা আর ভাগাভাগির ভিত্তিতে। আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীও জাতি-ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি। বড়ো-বড়ো শিল্পশহরে, খনি এবং বাগিচা এলাকায় এরও গড়ন পাঁচমিশালি। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যবহারিক সংস্কৃতিও ক্রমে সর্বভারতীয় চেহারা নিচ্ছে বস্তি এলাকার মিশ্র বসতিগুলিকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকশ্রেণীর বিন্যাসও তাই ভারতের ঐক্য রক্ষার অনুকূল, যদিও অনবরত শিল্পশ্রমিকে রূপান্তরিত গ্রামীণ কৃষকেরা এখনো আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতপাত এবং জাতিদ্বেষকে শ্রমিকদের মধ্যে জীইয়ে রেখেছেন। 'জাতীয় সমস্যা প্রধানত কৃষকসমস্যা' (স্তালিন) এবং কৃষকসমাজই আঞ্চলিক বুরজোয়া স্বার্থ এবং আঞ্চলিকতার উৎসভূমি।

৩

যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'জাতি' ব্যাপারটির আলোচনা করা হল, তা কিন্তু আমাদের দেশের ভাববাদী ঐতিহাসিকদের প্রাসঙ্গিক রচনায় অনুপস্থিত। তাঁদের অনেকের মতেই জাতির উপস্থিতি প্রাক-আধুনিক যুগেও ছিল। অনেকেই অশোক বা আকবরের সাম্রাজ্যকে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন এবং পরবর্তী যুগের মারাঠা রাজ্যের বিকাশকে মারাঠি জাতির উত্থান হিসাবে চিত্রিত করতে প্রয়াসী। প্রাচীন এবং মধ্য যুগে শাসকশ্রেণীকে ঘিরে রাজ্যজোড়া সর্বভারতীয় বা বা আঞ্চলিক উপরতলার সংস্কৃতি যে স্থানবদ্ধ লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি গড়ে ওঠে নি, তা নয়। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে সচেতন সমষ্টিগত ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলার কোনো নজিরই নেই। সমষ্টিচেতনা কুল, উপজাতি, জাতপাত, বর্ণ এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, জীবনযাত্রার এই বেড়াগুলি ডিঙিয়ে সাধারণীকৃত জাতীয় চেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। প্রাচীন যুগে রামায়ণে রামকে দিয়ে বলানো হচ্ছে, 'স্বর্ণপুরী লঙ্কায় আমার রুচি নেই, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের বাড়া'। আবার আদি-মধ্য যুগে দেখি, আপন "জনকভূমি" বা পিতৃভূমি বরেন্দ্রের মাটি আর গাছপালার জন্য ভাগ্যতাড়িত রামপালের উচ্ছ্বসিত মমতা সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত"-এ পরিস্ফুট। এতে স্বভূমিপ্রীতির (patriotism) প্রকাশ থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয়তাবাদ নেই। সে যুগে তো আধুনিক জাতির সমার্থক প্রতিশব্দই ছিল না প্রচলিত কোনো ভাষায়। জাতীয়তাবাদই বা থাকবে কী করে?

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে এ প্রশ্ন ভাবিত করেছিল। ১৯১৯-এ তিনি লিখেছিলেন, '...যাহাদের মধ্যে জন্মগত বন্ধনের ঐক্য আছে তাহারাই নেশন। তাহাদিগকেই আমরা জাতি বলিতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ভাষায় একদিকে অধিকতর ব্যাপক, অন্যদিকে সংকীর্ণ।...এমন স্থলে নেশনের প্রতিশব্দরূপে জাতি শব্দ ব্যবহার না করিয়া ইংরাজী শব্দটাই চালাইবার চেষ্টা করিয়াছি।...'

আলোচনায় nation, race এবং caste-এর বানানো বাঙলা প্রতিশব্দ হিসাবে যথাক্রমে অধিজাতি, প্রবংশ এবং জাতি বা বর্ণ ব্যবহার করা যায় কিনা, এ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ তুলেছিলেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে আসেন নি। বরং অবশেষে মন্তব্য করেছিলেন: 'আমি নিজেই বলিয়াছি 'নেশন' কথাটাকে তর্জমা না করিয়া ব্যবহার করাই ভালো। ওটা নিতান্তই ইংরাজী অর্থাৎ ঐ শব্দের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা হয় সে অর্থ ইহার আগে আমরা ব্যবহার করি নাই।'[৪] আরো পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথই মহাজাতিসদনের নামকরণের মাধ্যমে সর্বভারতীয় জাতীয় ঐক্যের দ্যোতক 'মহাজাতি' শব্দটি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। এই পটভূমিতে race অর্থে প্রবংশ, nation অর্থে মহাজাতি, nationality অর্থে জাতি / জাতীয়তা, subnationality অর্থে অধিজাতি এবং caste অর্থে জাত—এই পরিভাষা ব্যবহার করার কথা ভাবা যেতে পারে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আধুনিক নেশন ও ন্যাশন্যালিটির, এমন-কি প্রায়-সমার্থক প্রতিশব্দেরও অভাবই প্রাক-ব্রিটিশ যুগের ভারতে জাতি ও জাতীয়তার অনুপস্থিতির কথা তুলে ধরে।

ঔপনিবেশিকতার পরিবেশে, ভারতে মূলধনতন্ত্রের এবং জাতীয়তাবোধের দুর্বল উন্মেষ ঘটতে থাকে উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে। এর বাস্তব উপকরণগত ভিত্তি—যেমন ব্যাপক বাজার, আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্য ও শিল্পরীতি এবং ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সংহতির ঐক্যসূত্র ইত্যাদি—ধীরে-ধীরে তৈরি হচ্ছিল আরো আগে থেকেই। কিন্তু এ সম্বন্ধে সমষ্টিগত আত্মসচেতনতা ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকে রাজনৈতিক ফয়দা লোটার জন্য ভারতের উঠতি বুরজোয়ারা এই বাস্তব উপাদানগুলিকেই ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ সৃষ্টির কাজে লাগালেন। ভারতব্যাপী ব্রিটিশ প্রশাসনের লৌহ-কাঠাম, যোগাযোগব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ইতিমধ্যে তাঁদের এই কাজকে সহজ করে তুলেছিল। এই পরিবেশেই অবশেষে ব্রিটিশরাজের বিকল্প হবু স্বাধীন রাষ্ট্রের বনিয়াদ হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম।

প্রথম থেকেই কিন্তু ভারতে জাতীয়তাবাদের চেহারা দ্বৈত—সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক। এমন-কি যাঁরা হিন্দু মুসলমান দুই 'জাতি'র কথা বলতেন, তাঁরাও ১৯৪০-এর আগে পর্যন্ত একই রাষ্ট্রকাঠামে মিলেমিশে থাকার কথাই বলতেন। একই লোক, হিন্দু কিংবা মুসলমান, নিজেকে একাধারে বাঙালি এবং ভারতীয়, অথবা অসমিয়া এবং ভারতীয় বলে

ভাবছেন—উনিশ শতকের এবং পরবর্তী অসংখ্য সাহিত্যকর্মে তার ভূরি-ভূরি প্রমাণও রয়েছে। অন্যত্র এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।* মতাদর্শের ক্ষেত্রে, তাই, প্রথম থেকেই দ্বৈত জাতীয়তাবাদের অনুকূল যুক্তরাষ্ট্রীয়-কাঠাম-ভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তাই বাস্তবানুগ হত। কিন্তু তা হয় নি। প্রথমদিকে কংগ্রেসের রাষ্ট্রচিন্তায় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদই শুধু পরিস্ফুট হয়েছে, অবহেলিত হয়েছে আঞ্চলিক সত্তা। প্রতিপক্ষ ব্রিটেন একীকৃত একজাতিক রাষ্ট্র। অতএব, তার বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছিল একীকৃত একজাতিক ভারতরাষ্ট্রের ধারণাকে। তার জন্য বুর্জোয়া নেতারা প্রয়োজনমতো তথ্যের সঙ্গে কল্পনারও আশ্রয় নিয়ে ভারতবাসীকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন যে ভাষা, জীবনযাত্রা, ধর্ম, মানসিকতা ইত্যাদির অনেক অনৈক্য সত্ত্বেও দেশব্যাপী একই বিমিশ্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শরিকানার দৌলতে ভারতীয়রা একজাতিভুক্ত। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ভারতের সংবিধানও তাই ব্রিটেনের মতো এককেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই আপাত-নিরীহ বক্তব্যের আড়ালে লুকানো ছিল ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রগামী বৃহৎ এবং প্রবল অংশের শ্রেণীস্বার্থ। তাঁরা বুঝেছিলেন, সারা ভারতের শাসনক্ষমতা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত থাকলে দেশের অখণ্ড বাজারের সর্বত্র তাঁদেরই কর্তৃত্ব থাকবে। তা ছাড়া, দীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী ঐক্য থেকেও এক-জাতিত্বের অনুকূল জনমানস গড়ে উঠেছিল।

রাষ্ট্রব্যবস্থার এই মডেল ভারতীয় মুসলমানদের পছন্দ না হওয়ারই কথা। কারণ, ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে অন্তত মুসলমান সংখ্যাধিক্য থাকত এবং সেক্ষেত্রে, সর্বভারতীয় স্তরে দুর্বল মুসলমান বুরজোয়ারা সেই রাজ্যগুলির বাজারে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে, ইস্তাম্বুল থেকে ১৯২৬-এ প্রকাশিত, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী মৌলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রচিত *The Constitution of the Federated Republics of India* উল্লেখ্য। বইটির সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনীতে। আর-একটি ব্যাপারেও মুসলমানদের আপত্তি ছিল। উদারপন্থীদের সেকুলার ভাবধারা সত্ত্বেও, শুরু থেকেই হিন্দুমেলা, আর্যসমাজ, বীরাষ্টমী, গো-রক্ষা, বর্ণদম্ভ ইত্যাদি হিন্দুয়ানির নানা প্রতীকচিহ্ন, ভাবনা এবং তরিকা জাতীয়তাবাদ-প্রকাশের ধারক এবং বাহক হয়ে উঠছিল, যার কোনো আবেদন ছিল না ভারতীয় মুসলমান সমাজের কাছে। এই দুই কারণে এবং মুসলমানদের মধ্যে মৌলপন্থী এবং নিখিল-ইসলামপন্থীদের প্রভাববৃদ্ধির ফলে জাতীয়তাবাদের মঞ্চ মুসলমানদের তেমন আকৃষ্ট করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেসের সর্বজনীন মঞ্চে ঐতিহ্যসম্মত এক ধরনের উদারতা পূর্বাপর বজায় ছিল। কংগ্রেসে থেকেই সদস্যরা রুচি অনুযায়ী স্বধর্মাবলম্বীদের আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনেও যোগ দিতে পারতেন। এইরকম পরি-স্থিতিতেই সাম্প্রদায়িক মঞ্চে হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থান শ্লোগানের ক্রমবিকাশ। এইরকম পরিস্থিতিতেই ১৯০৬-এ মুসলিম লীগের জন্ম, স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচনক্ষেত্রের দাবি এবং পরবর্তী কয়েক বছরের বিকাশ। ভাষাভিত্তিক এবং বর্ণপ্রাধান্যবিরোধী কৃষক-মনস্ক আঞ্চলিকতাবোধ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা নিতে থাকে ১৯২১-এর আন্দো-লনের পরবর্তী দুই দশকে, কিন্তু তখনো মূলত কংগ্রেস আর লীগের আওতার মধ্যেই।

১৯২১-এ বুরজোয়া নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্ট সারা দেশে সাড়া জাগালেও, মতাদর্শের সীমাবদ্ধতার দরুন শেষ পর্যন্ত এর থেকে কংগ্রেস কোনো ফয়দা তুলতে পারে নি। ১৯২৮ সালে নেহরুর রচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রের খসড়ায় 'অবশিষ্ট' (residual) ক্ষমতা কেন্দ্রে ন্যস্ত করার কথা থাকায় মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব এবং

ত্রিশের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায়। 'অবশিষ্ট' ক্ষমতা কংগ্রেস পরবর্তী কালে প্রদেশের হাতে ন্যস্ত করতে রাজি হল বটে, কিন্তু কোনো বিশেষ অঞ্চলের পৃথক হয়ে যাওয়ার অধিকার অস্বীকার করে প্রস্তাব পাশ করল (লালা জগৎনারায়ণের 'অখণ্ড ভারত' প্রস্তাব : এলাহাবাদ এ. আই. সি. সি.)। এই পটভূমিতেই কুখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব চল্লিশের দশকে মুসলিম গণসমর্থন লাভ করে। পাকিস্তানকে যখন আর ঠেকানো গেল না, তখন স্বাধীন ভারতের সংবিধানরচয়িতারা 'অবশিষ্ট' ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতেই রেখে দিলেন। পরবর্তী কালে, নানাভাবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে কেন্দ্রের অনুকূলে আরও রদবদল ঘটানো হল। এর ফলে জাতীয় সমস্যা এক দিক দিয়ে হয়ে দাঁড়াল আরো জটিল।

৪

আমাদের ইতিহাস-সাহিত্যে জাতীয়সমস্যাসংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে জাতিগঠনপ্রক্রিয়ার বিশ্লেষণধর্মী সামাজিক-রাজ-নৈতিক ইতিহাস কিংবা জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গ বৌদ্ধিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা বিরল। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসই কি লেখা হয়েছে? আমরা কি জানি কোচ-রাজবংশীরা কবে, কিভাবে, ধাপে-ধাপে বাঙালি জাতিতে মিশে গিয়েছেন? নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" রয়েছে বটে, কিন্তু তা এমন এক কালপর্বের যখন রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ-বঙ্গাল, হরিকেল ছিল, কিন্তু বাঙালি জাতি ছিল না। আধুনিক যুগে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের কাঠামর মধ্যে কিভাবে হিন্দু-মুসলমান নানা জাত, উপজাতি, ভাষাগোষ্ঠী শ্রেণীগত ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণিত হয়ে বাঙালি জাতিতে পরিণত এবং বর্ণহিন্দুর সমাজপতিত্বে প্রক্রিয়াটির অসম্পূর্ণতা কোথায়—এ সম্পর্কে গবেষণা কমই হয়েছে। জাতিগঠনের আঞ্চলিক এবং সর্ব-ভারতীয়—এই দুই ধারা সমান্তরাল নয়, পরস্পরকে জড়িয়েই প্রবহমান। আঞ্চলিক জাতিগুলি পূর্ণ-বিকশিত না হতেই সর্বভারতীয় জাতিগঠনের অসমাপ্ত ধারার সাথেও মিশে যাচ্ছে। কারণ, আধুনিক যোগাযোগ- এবং গণমাধ্যম-ব্যবস্থার কল্যাণে একটি সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামের মধ্যে একদিকে জাতীয় সমস্যা ক্রমেই জটিলতর এবং তীব্রতর হচ্ছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যগুলির সংমিশ্রণে আর সংশ্লেষণে মহাজাতীয় সংস্কৃতি আর ঐক্যের বনিয়াদও শক্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় অর্থনীতির বিকাশের অসাম্য কমিয়ে আনতে পারলে এবং নিঃশর্ত গণতন্ত্র এবং স্বয়ংশাসনের ধারণাকে তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংহতি নিশ্চয়ই রক্ষা করা যায়। অনুমান করি, ভারতের জাতীয় বিকাশ-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে এই প্রেক্ষিতই বেরিয়ে আসবে।

ভারতের জাতীয় চেতনা অনুধাবনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক মহলের চিন্তাধারার বিকাশে, মার্কসবাদীদের চিন্তাভাবনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাই, এই শেষোক্ত চিন্তা-ভাবনার একটি কালানুক্রমিক রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে, সমাজবিকাশের অমোঘ নিয়মেই ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ মূলধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে, উপজাতীয় এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীচেতনা অতিক্রম করে জাতীয় চেতনার বিকাশ হয়। জাতীয় আন্দোলন জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের অভিমুখী হয়। সে অবস্থায় জাতিসত্তার বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই শ্রমিকশ্রেণীকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্য অন্য একাধিক শ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রামের পথে এগুতে হয়। এই তাত্ত্বিক দূরদৃষ্টির বলেই ১৯২৫ সালেই স্তালিন বলতে পেরেছিলেন : 'ভারতকে আজকাল একটি সমগ্র জাতি বলিয়া প্রচার করা হইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে

ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়া বহু অজ্ঞাত জাতি আত্মপ্রকাশ করিবে।'[৬] ভারতে কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের মতো মার্কসবাদীরাও ভাবতেন, ভারতবর্ষ একজাতি, এবং একজাতিক কাঠামের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। উদীয়মান জাতিগুলির সমস্যার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকে ১৯৪০ থেকে, এবং অচিরেই "ভারত একটি বহুজাতিক দেশ" এই সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হন। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রয়োগ ভারতে কিভাবে হবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা শুরু হয়।

দেখা গিয়েছিল যে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত যতই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, ততই মুসলমান জনসাধারণও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিলেন। তবু—

> কেনই বা জাগ্রত মুসলমান জনগণ বিশেষ করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের সময়ে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হইল, এবং মুসলিম লীগ শক্তিশালী মুসলিম সংগঠন হিসাবে দাঁড়াইতে পারিল? কেনই বা ঠিক এই সময়েই হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ তীব্রতর হইতে লাগিল?··· ('জাতীয় ঐক্য চাই", "পিপল্‌স্ ওয়র", ৮. ৮. ১৯৪২।)[৭]

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তদানীন্তন কমিউনিস্ট দল উক্ত প্রবন্ধে এ-ও লক্ষ করেছিল যে, যত নিম্নস্তরেরই হোক, শিল্পোন্নতির বিস্তারের ফলে এবং নতুন শাসনতন্ত্র মারফত সীমিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ আসায় ওই একই সময়ে বাঙলা, উত্তরপ্রদেশ এবং পানজাবে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন এবং অন্যত্র বাঙালি-বিহারি, বাঙালি-অসমিয়া, মারাঠি-কর্ণাটকি এবং অন্ধ্র-তামিলনাড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। ঘটনার এই উভয়বিধ ধারাতেই যেমন একটি ভেদমুখী দিক আছে, তেমনি একটি প্রগতিশীল দিকও আছে—এই ছিল কমিউনিস্টদের সেদিনকার দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি।

> বুরজোয়া উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে সর্বভারতীয় জাতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন দেশের দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং সবচেয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী জাতি ও সম্প্রদায়ের কৃষককুলকে তাহার আবর্তে টানিয়া আনিতেছে। সর্বভারতীয় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন বহুজাতিক আন্দোলনের সমৃদ্ধিশালী রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিতেছে।···দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্ণাটকের লিঙ্গায়েৎ কৃষকরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এবং স্বভাবতই স্বাধীন ভারতে স্বাধীন কর্ণাটক প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। অন্ধ্র, তামিল, পানজাবি ও পাঠানদের সম্পর্কেও ইহা সত্য। সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বেষারেষির তীব্রতার ইহাই প্রগতিশীল দিক, আমাদের ক্রমবর্ধমান জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলেই ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহা যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের এক নতুন রূপ, এই উপলব্ধিই সমস্যা-সমাধানের চাবিকাঠি।[৮]

১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগ ভারতের জন্য পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, এবং ইতিমধ্যে প্রসারিত গণভিত্তির চাপে শিল্পপতি বুরজোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন হয়ে পড়ছিল। 'অতএব', প্রবন্ধের ভাষায়, 'লীগের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ নহে, বরং মুসলমান জনগণের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনারই ইহা অভিব্যক্তি। বৃহত্তর নিখিল-ভারতীয় জাতীয়বাদের কাঠামোর মধ্যে সিন্ধি, পানজাবি, মুসলমান, পাঠান প্রভৃতির স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধেরই ইহা প্রকাশ।' কমিউনিস্টদের তরফ থেকে কংগ্রেসকে বলা হল—'পুরুষানুক্রমে একই ভূখণ্ডে, একই ভাষা, একই সংস্কৃতি ও একই অর্থনৈতিক জীবন-ব্যবস্থার মধ্যে বসবাসকারী স্বতন্ত্র জাতিদের স্বয়ং-শাসিত রাষ্ট্রজীবন নির্বাহের অধিকার ও তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিলে, তাহার ফলে মাতৃভূমির ব্যবচ্ছেদ কখনো ঘটিতে পারে না।'[৯] আশা প্রকাশ করা হয়েছিল, কংগ্রেস এমন প্রতিশ্রুতি দিলে পাকিস্তান প্রস্তাব মুসলিম জনসমর্থন হারাবে

এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস-লীগ সমঝোতা ও স্বেচ্ছা-মিলনের ভিত্তিতে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠাম বজায় থাকবে। কংগ্রেস এই প্রস্তাব মেনে নেয় নি। মেনে নিলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জোয়ার এবং ভারত-বিভাজন ঠেকানো যেত কিনা, সে প্রশ্ন এখন অবান্তর।

সে যা-ই হোক, প্রবন্ধটিতে উপস্থাপিত দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিত্তিতেই আত্মনিয়ন্ত্রণনীতির প্রয়োগসংক্রান্ত থিসিস ১৯৪২-এর সেপটেম্বর মাসে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত এবং ১৯৪৩-এর মে মাসে দলের প্রথম কংগ্রেসে, ড. গঙ্গাধর অধিকারীর প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনটিসহ, অনুমোদিত হয়েছিল। ভারতের বেলায় কোনো অঞ্চলের জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নির্ণায়ক হিসাবে ভাষা ইত্যাদি উপাদানের পাশাপাশি কোনো-কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত আঞ্চলিক সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকেও উপাদান হিসাবে গণ্য করাটাই বাস্তবানুগ হবে—ড. অধিকারীর এই পরামর্শ ছিল প্রাপ্ত মার্কসবাদী তত্ত্বের সঙ্গে নতুন সংযোজন। এরই ভিত্তিতে পশ্চিমা-পানজাবি ও পূর্ব-বঙ্গীয়দের স্বতন্ত্র মুসলমান-প্রধান জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিবেদনটির উপসংহারে একথাও বলা হয়েছিল :

> জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে রাজনৈতিক-বৈপ্লবিক প্রশ্ন হিসাবে দেখিতে হইবে, নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্ন হিসাবে দেখিলে চলিবে না।
>
> ···পৃথক হইবার অধিকার মানিলেই যে সত্য-সত্যই এই অধিকার প্রয়োগ করা হইবে বা প্রয়োগ করা সমীচীন হইবে, তাহা নহে। সমগ্র সামাজিক পরিস্থিতি ও বিকাশের পটভূমিকাতেই ক্ষেত্র- ও কাল-বিশেষে এই শেষোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব। পৃথক হইলে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশের পক্ষে কিরূপ ফল হইবে তাহা বিবেচনা করিয়াই বাস্তব ক্ষেত্রে এই সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব।[১০]

এই স্পষ্টীকরণ সত্ত্বেও মুসলিম লীগের মধ্যে সামন্তীয় প্রভাব ও সাম্প্রদায়িকতাকে খাটো করে এবং গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে এবং কমিউনিস্টদের অবস্থানে বাস্তবে নিয়মতান্ত্রিক বিচ্যুতি ঘটার ফলে, আত্মনিয়ন্ত্রণের থিসিসটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সরেজমিনে প্রকারান্তরে পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৪৬-এর ১৫ এপ্রিল তারিখে ক্যাবিনেট মিশনের কাছে পেশ করা স্মারকলিপিতে এই ভ্রান্তি অনেকটা সংশোধিত হল। কমিউনিস্টদল অবশ্যই চেয়েছিল অখণ্ড ফেডারেল ভারত এবং একটি সীমানা কমিশনের মারফত ভাষা তথা সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রের বিচারে জাতিভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বলেছিল যে, পুনর্গঠিত প্রদেশগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেবে, না স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোনো ইউনিয়ন গড়বে—সে সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই স্বাধীন-ভাবে নেবে। তখনকার সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধসদৃশ পরিস্থিতিতে, যখন জাতীয় নেতৃত্ব হৃত-উদ্যোগ এবং ব্রিটিশ বাহিনী ভারতত্যাগে বদ্ধপরিকর, মনে হয়, কমিউনিস্টদের এই অবস্থান বাস্তবানুগ ছিল।[১১] অনুরূপ অবস্থানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল তখন, অসমিয়া জাতির বঙ্গাসাম-গ্রুপিং-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ বিরাট আন্দোলন। সর্বোচ্চ কংগ্রেস নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে পালটে দিয়ে সেদিন এই আন্দোলন ক্যাবিনেট মিশনের সর্বশেষ ত্রি-স্তর কনফেডারেশনের প্রস্তাবটিকে ভেস্তে দিতে এবং প্রকারান্তরে আসামের পূর্ব-পাকিস্তানভুক্তি রদ করতে পেরেছিল (আসাম বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাব, ১৬ জুলাই, ১৯৪৬)।[১২] অনুরূপ অবস্থানের ভিত্তিতেই পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গও পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

ভারতবিভাগের আগেই লীগের ভূমিকা এবং পাকিস্তান-প্রস্তাবের প্রতি কমিউনিস্টদের মনোভাব পরিবর্তিত হলেও, নিঃশর্ত জাতিভিত্তিক আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির উপরে তাঁদের আস্থা ছিল অটল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই জায়মান জাতিগুলিকে শৃঙ্খলিত করে এক কারাগারে রেখেছিল, কাজেই প্রাক-স্বাধীনতা

যুগে এই জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ ভাগ্যনির্ধারণের পূর্ণ অধিকার মেনে নেওয়া উচিত—এ অবস্থানে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। বরং, সেটাই ছিলমার্কসবাদসম্মত। কিন্তু অবস্থারজটিলতাকে অতিসরলীকৃত করে নেওয়ার ফলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুলও হয়েছিল। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ব্যাখ্যা কত দূর প্রসারিত ছিল, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট দলের আসাম প্রাদেশিক সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে পার্বত্য অঞ্চল ও কাছাড় সহ সমগ্র আসাম প্রদেশের ভারত থেকে পৃথক হওয়ার অধিকার সহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল। একই সাথে, পার্বত্যাঞ্চল এবং কাছাড়ের জন্যও বলা হয়েছিল আসাম থেকে পৃথক হওয়ার অনুরূপ অধিকারের কথা। অবশ্য এ ছিল অধিকারের কথা, বাস্তব প্রয়োগের কথা নয়।[১৩] নাগাল্যানড, কাশ্মীর, তামিলনাড়ু এবং মিজোরামে উত্থাপিত ভারতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের দাবির প্রতি বাস্তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সাড়া বরাবরই নেতিবাচক ছিল সঠিকভাবেই। তা সত্ত্বেও, ১৯৬৪ পর্যন্তও কমিউনিস্ট কার্যসূচীতে ভারত থেকে পৃথক হওয়ার অধিকারের ধারাটি বলবৎ ছিল। পরে, এই ধারাটিকে কয়েক বছর নিষ্ক্রিয় রেখে, ১৯৭২-এ পাকাপাকিভাবে খারিজ করা হয়।[১৪] তখন থেকে বিচ্ছেদের-অধিকার-বিহীন আঞ্চলিক স্বশাসনের ব্যবস্থাকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট ভাবা হয়, যেমন ভাবা হয় মাও জে-তুঙের আমল থেকেই চীনদেশেও।

আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে আর-একটি ভ্রমাত্মক ঝোঁকও কিছুকালের জন্য প্রকট ছিল। গুজরাতি এবং রাজস্থানী ধনিকদের হাতে একচেটে মূলধনের কেন্দ্রীকৃত অবস্থান এবং এই মূলধনের আধিপত্য দেখে অনেকে আঞ্চলিক আন্দোলনগুলিতে এর বিরুদ্ধে আঞ্চলিক জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে কোনো বিশেষ শোষক-নিপীড়ক জাতি নেই—আলোচনা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সত্যে পৌঁছাতে তাঁদেরও বিলম্ব ঘটে নি।

৫

আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির একটি সঠিক অনুসিদ্ধান্ত হল, যতদূর সম্ভব ভাষা / সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ / রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন এবং পুনর্গঠিত প্রদেশ / রাজ্যসমূহের জন্য ব্যাপক স্ব-শাসনের ব্যবস্থা। সর্বভারতীয় বুরজোয়ারা এই প্রস্তাবকে বরাবর প্রবল বাধা দিয়ে এসেছেন। অপরপক্ষে, মার্কসবাদীরা বরাবর সক্রিয়ভাবে এই প্রস্তাবের সপক্ষে। চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশকে মহা-গুজরাত, সংযুক্ত মহারাষ্ট্র, ঐক্য কেরলম্, বিশাল অন্ধ্র এবং সংযুক্ত কর্ণাটক আন্দোলন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জাতীয় উচ্ছ্বাসের আতিশয্য সত্ত্বেও এ আন্দোলনগুলি ছিল গণতান্ত্রিক এবং কৃষকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পানজাবে ধর্ম, লিপি এবং ভাষাগত আনুগত্যের প্রশ্নে পরিস্থিতিতে জটিলতা থাকায়, সেখানে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। ভেদবাদের পথে শিখিস্তান আন্দোলন হয়েছিল; মার্কসবাদীরা তখন তার বিরোধিতাই করেছিলেন।

ওই দুই দশকে মিজোরামে বিচ্ছিন্নতার বীজ উপস্থিত থাকলেও অঙ্কুরিত হতে পারে নি। বরং সামন্তীয় মিজো সর্দারি-প্রথার উচ্ছেদ, সংস্কৃতি তথা ভাষার প্রশ্নে আসামের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ এবং ভারত ইউনিয়নের মধ্যে আলাদা ভাষাভিত্তিক মিজোরাম রাজ্যগঠন—এই তিন প্রধান দাবির ভিত্তিতে সামন্তবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৫৯-এ দুর্ভিক্ষকবলিত মিজোরামে গঠিত হয়েছিল একটি আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সমিতি (Mizo National Famine Front)। ত্রাণসামগ্রীবিহীন চরম দুর্দশা এবং হতাশার

মধ্যে ষাটের দশকে এই সমিতিই বিদ্রোহের মঞ্চে রূপান্তরিত হয়ে ভারত ও ব্রহ্মের সংলগ্ন সমস্ত মিজো এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাজ্যের আওয়াজ তুলেছিল। কাজেই, প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলনের প্রতি মার্কসবাদীদের নৈতিক সমর্থন থাকলেও, পরবর্তী পর্যায়ে ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে, নাগা জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ত্যাগ এবং ভারতের মধ্যে স্বতন্ত্র নাগাল্যান্ডে রাজ্য গঠনের জন্য ভারত সরকার এবং নাগা জাতীয় নেতৃত্বের বৃহদংশের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সমঝোতা চুক্তি (accord) হয়েছিল, তাতে মার্কসবাদীদের আপত্তি ছিল না। আবার, আকালি শিখদের শিখিস্থানের দাবির মর্মবস্তুই যখন গুরুমুখী লিপি, পানজাবি ভাষা আর সেকুলার পানজাবের পোশাক পরে পানজাবকে আর-একবার দ্বিখণ্ডিত করল, তখনও মার্কসবাদীদের বাস্তবে সে অবস্থা মেনে নিতেই হয়েছে। সিকিমের ভারতভুক্তি আর-এক ব্যাপার। যেভাবে সিকিম-দখল সম্পন্ন হয়েছিল, তা মার্কসবাদী মহলে উগ্রজাতীয়তাবাদী অপকর্ম বলেই সমালোচিত হয়েছিল।

ইতিহাসই দেখিয়ে দেয় যে, আমাদের যুগে ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে রাজ্য / প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রবণতা সমাজবিকাশের নিয়মানুবর্তী একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। প্রথম থেকেই বৃহৎ মূলধনীরা একচেটে বাজারের স্বার্থে একে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি। লখনউ চুক্তি (১৯১৬), ১৯২৮-এ নেহরুর প্রতিবেদন ইত্যাদি এবং অবশেষে সংবিধান ও তার একাধিক সংশোধনের মারফত মোটামুটি এ পর্যন্ত স্বাভাবিক প্রবণতাটিকেই মেনে নেওয়া হয়েছে। গণ-আন্দোলনের চাপেই এভাবে ধাপে-ধাপে জাতীয় প্রশ্নের অনেকখানি সমাধান হয়েছে। বৃহৎ মূলধনীদের চাপে, কংগ্রেসের আগের ঘোষিত নীতি বিসর্জন দিয়ে, ১৯৪৯-এ বুরজোয়া নেতারা দশ বছরের জন্য ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের কাজ বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশ, ষাট আর সত্তরের দশকে আঞ্চলিক-জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারে তাঁদের সব বাধা ভেসে গিয়েছে।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন এবং রাজ্যসীমানার রদবদল করে জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা অনেকখানি সম্ভব হলেও, সর্বাঙ্গীণ মীমাংসা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক বিকাশ সীমিত হলেও, তার ফলে গত দেড়শ বছর ধরে এক অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ অন্য অঞ্চলে গিয়ে হাজারে-হাজারে বসতি গড়েছেন। দেশবিভাগের ফলেও তাই ঘটেছে। এ-ধরনের ব্যাপক প্রব্রজনের ফলে গড়ে-ওঠা একাধিক জাতির মিশ্র বসতিগুলি এমনভাবে ছড়ানো যে, এমন-কি গ্রামভিত্তিক গণ-ভোটের সাহায্য নিয়েও, জাতীয় সীমানা নিখুঁতভাবে সরেজমিনে স্থির করা প্রায় অসম্ভব। কিছু রাজ্য (যেমন, মণিপুর বা কাশ্মীর) আবার একাধিক ক্ষুদ্র জাতির ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত যুক্ত গৃহভূমি—কেউ সেখানে সংখ্যাগুরু, কেউ-বা সংখ্যালঘু। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক জটিলতা ও বাধ্যবাধকতার বিবেচনায়, এইসব রাজ্যের স্থিতাবস্থায় অস্থিরতাসৃষ্টি যুক্তিযুক্ত নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। আসামে প্রধানত বাঙলাভাষী কাছাড়-করিমগঞ্জ এবং পশ্চিম বাঙলায় প্রধানত নেপালিভাষী দার্জিলিং জেলাকে রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করলেই কি জাতি-সংক্রান্ত সব সমস্যার সুরাহা হবে? এই প্রসঙ্গে অকটোবর ১৯৭৩ সালে ভারতের জাতীয় সংহতি-সাধন পরিষদে উপস্থাপিত পি. সুন্দরাইয়ার দলীয় বক্তব্যে এই কথাই স্পষ্ট যে সুরাহা খণ্ডীকরণে নেই। সুরাহা আসামের ক্ষেত্রে ভাষিক সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক অধিকার দান এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তদুপরি নেপালি ভাষাকে সাংবিধানিক মর্যাদাদান এবং নেপালিভাষী এলাকা নিয়ে "বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন স্বতন্ত্র জেলা" সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। যদি এসব রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা না থাকে, তবেই শুধু যেখানে অন্য ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এমন সব এলাকাকে রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক সত্তার রূপ

দিতে হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও, "রাজ্যে ভাষিক সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব ন্যূনতমে এসে ঠেকলেও, তাদের ভাষাগত অধিকার রক্ষার সমস্যা থেকেই যাবে এবং এই অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের দায় এবং গ্যারানটি কেন্দ্রীয় সরকারে বর্তাবে।"[১৫]

মূলধনতান্ত্রিক বিকাশ এবং আগ্রাসনের আবর্তে পড়ে উপজাতীয় সত্তাগুলির ভাঙ্গাবশেষ যা রয়ে গিয়েছে, তা হয় সুসংহত হয়ে নতুন-নতুন জাতির রূপ নিচ্ছে, নয়তো বৃহত্তর জাতির মধ্যে লীন হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য আর থাকছে না। এই বিবর্তনের ধারা বন্ধ করাটা এই মুহূর্তে কাম্যও নয়, সম্ভবও নয়। শুধু এর নিয়ম মেনে চলে, শোষিত শ্রেণীর স্বার্থে এর প্রক্রিয়াকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করা যায় মাত্র। যেখানে জাতিতে রূপান্তর এবং সংরক্ষিত জাতীয় গৃহভূমির ব্যবস্থাপনা সম্ভব, সেখানে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-নীতির প্রয়োগ কঠিন নয়। কিন্তু, যে আদি-বাসী অঞ্চলগুলিতে সাবেক জনবসতিগুলির পাশা-পাশি বহিরাগত ভিন্ন সংস্কৃতির শরিকরাও কয়েক পুরুষের বাসিন্দা এবং সংখ্যায় বিপুল, সেখানে কী করণীয়? ছোটোনাগপুরে কুর্মী-সহ আদিবাসীরা জন-সংখ্যার অর্ধেকও হবেন কিনা সন্দেহ। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রাজবংশী ও অন্যান্য আদিবাসীদের সংখ্যানুপাত বহিরাগত জনাগমনের চাপে আরো অনেক কম। নগণ্যই বলা চলে এখন। পুরুলিয়া-মেদিনীপুর-বাঁকুড়ায় এমন একটি থানা এলাকা পাওয়াও প্রায় দুষ্কর, যেখানে আদিবাসীদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ বলা যেতে পারে। শুধু দার্জিলিঙের তিনটি পার্বত্য মহকুমার ক্ষেত্রেই নেপালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু বাঙালিদের মতোই তাঁরাও ওখানকার আদিবাসী নন, বহিরাগত। ওখানকার আদিবাসী লেপচা এবং ভুটিয়ারা।

উঁচু জাতের বিরুদ্ধে উপজাতীয় এবং নিম্নবর্ণের মানুষের সামগ্রিক সংগ্রাম যে শ্রেণীসংগ্রামেরই একটি রূপ—এই ব্যাপারটা মার্কসবাদীদের কাছে ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে। চল্লিশের দশকে "মার্কসিসট মিসেলেনি"তে প্রকাশিত অজয় ঘোষের Notes on Chhota-nagpur প্রবন্ধটিতেই সম্ভবত সর্বপ্রথম ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যার বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। পরবর্তী কালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং অচিন্ত্য ভট্টাচার্যের নানা লেখায় আমরা জাতীয় এবং উপজাতীয় সমস্যার তাত্ত্বিক আলোচনা পাই। মার্কসবাদী লেখকদের এই-রকম কিছু রচনা ছাড়াও, সি. পি. আই. (এম)-এর নবম কংগ্রেসে (১৯৭২) গৃহীত একটি দলিল থেকে এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

> 'কয়েকটি দিক থেকে, উপজাতীয় জনসমষ্টি, বিশেষত সামান্তবর্তী ক্ষুদ্র জাতিগুলি, শুধু শ্রেণীগতভাবেই নিপীড়িত নয়, অন্য উন্নততর জাতিসমূহের দ্বারা এক ধরনের 'জাতিগত' নিপীড়নও তাদের উপরে চলছে।'

আমাদের আধাসামন্তীয় সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে, দৃশ্য অদৃশ্য নানাভাবে, এমন-কি আপাতপ্রগতিশীল মহলেও, বর্ণহিন্দুপ্রাধান্য এবং জাতিদম্ভ সক্রিয়। অতএব উক্ত দলের কর্মসূচীতে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে :

> 'উপজাতীয় এলাকার জন্য বা, যেখানে বিস্তৃত জন-সমষ্টির গঠন বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার দ্বারা চিহ্নিত, এমন সব এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মধ্যেই আঞ্চলিক সরকার-সহ স্ব-শাসন চালু থাকবে এবং এই এলাকাগুলি উন্নয়নের জন্য পূর্ণ সাহায্য পাবে।'[১৬]

এই নীতির যথাযথ প্রয়োগের মধ্যেই ঝাড়খণ্ড, দার্জিলিং ও অন্য অঞ্চলের অনুরূপ সমস্যার ভবিষ্যৎ স্থায়ী সমাধান নিহিত। একাধিকবার রাজ্যসমূহের ভাঙাগড়া হওয়া সত্ত্বেও এখনো ভাষাসংস্কৃতিতে বিশিষ্ট একাধিক অঞ্চল সমেত গঠিত কয়েকটি রাজ্য রয়েছে। যেমন আসাম, কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর, বিহার ইত্যাদি। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক পরিস্থিতির জটিলতার দরুন, এই রাজ্যগুলির খণ্ডীকরণ এখন সমীচীন নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। যদি কখনো তার প্রয়োজন হয়, শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে গ্রামভিত্তিক

গণভোটের মাধ্যমেই শুধু তার মীমাংসা হতে পারে।[১৭] আর সে প্রয়োজন যাতে আদৌ দেখা না দেয়, তার জন্য স্বেচ্ছায় বিবিধের মিলনের (লেনিনের ভাষায়, voluntary integration) ভিত্তিতে সংহতি-সাধনের ডাক দেওয়াটাই মার্কসবাদসম্মত।

৬

ক্ষুদ্র ভাষণে ভারতের জাতিসমস্যার সব দিক তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই, একটি প্রধান দিক নিয়েই মার্কসবাদীদের চিন্তাধারার একটি ঐতিহাসিক রূপ-রেখা উপস্থিত করার এই চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকে যে কয়টি কথা বেরিয়ে আসে, পুনরুক্তিদোষের ঝুঁকি নিয়েও প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে সেগুলি তুলে ধরতে চাই আবার।

(১) ইতিহাসের শিক্ষা এই যে স্পর্শকাতর কোনো জাতীয় দাবি ন্যায্য বলে স্বীকৃত হওয়ার পরেও যদি দীর্ঘকাল ধরে অপূর্ণ থাকে এবং দায়বদ্ধ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব যদি এই দাবি হাসিলের জন্য যথাসময়ে সক্রিয় - কার্যসূচীভিত্তিক (action - oriented) আন্দোলন গড়ে না তোলেন, তবে রাজনৈতিক উদ্যোগ অবশেষে ভেদবাদী আঞ্চলিক উগ্রজাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে যায় এবং তাঁরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হন।

(২) জাতির নামে বজ্জাতি বড়ো জাতি এবং ক্ষুদ্র জাতি উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। আমরা সাধারণত জাতীয়তাবাদ আর গণতান্ত্রিকতাকে একাকার করে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু তা ঠিক নয়। জাতীয় আন্দোলন গণতান্ত্রিক না-ও হতে পারে। যেমন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, হিটলারের জারমান জাতির একীকরণ আন্দোলন বা সামন্তবাদীদের নেতৃত্বে তিব্বতের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন অবশ্যই জাতীয় আন্দোলন ছিল, কিন্তু গণতান্ত্রিক ছিল না। বিশেষ পরিস্থিতিতে, সত্যিই, বুরজোয়া পণ্ডিতের ভাষায়, 'জাতীয়তাবাদ বজ্জাতদের শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়'—(লর্ড অ্যাকটন)।

(৩) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বিচ্ছেদের অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির সবচেয়ে বড়ো প্রবক্তা ছিলেন বলশেভিকরা। কারণ, সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ ধসিয়ে তখন জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটলে ইউরোপে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হত। কিন্তু মহাযুদ্ধ-পরবর্তী নয়া-ঔপনিবেশিকতার যুগে, মারকিন বুরজোয়ারাই হয়ে পড়েছেন এই নীতির সবচেয়ে বড়ো প্রবক্তা।[১৮] তাঁদের অর্থসাহায্যে তৃতীয় বিশ্বকে ভিত্তিয়ে "তুর্থ বিশ্ব সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং স্পর্শকাতর "আন্তর্জাতিক সীমান্ত-বিভাজিত জাতিগুলির" সমস্যা নিয়ে গবেষণা এবং সেমিনার ইত্যাদি আকছার হচ্ছে। এই দৃশ্যপট মনে রাখা দরকার। তা-ছাড়া মূলধনতন্ত্র থেকে সমাজবাদে রূপান্তরের যুগে জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক ভূমিকাটিই ক্রমে প্রধান হয়ে উঠছে। চাপা পড়ে যাচ্ছে সামন্তবাদবিরোধী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ভূমিকা। এটাও লক্ষণীয়।

(৪) মূলধনতন্ত্রের বিকাশের একটা স্তরে, জন-প্রব্রজনের ফলে অনেক অঞ্চলই আর বিপুলভাবে একজাতি-অধ্যুষিত হয়ে থাকে না। সেখানে প্রধান জাতির সঙ্গে পাশাপাশি সহাবস্থান করে অন্যান্য ছোটো-ছোটো জাতিগোষ্ঠী। আর এ দৃশ্য সবচেয়ে বেশি দেখা যায় রাজ্য বা প্রদেশের সীমান্তঘেঁষা জেলাগুলিতে। এই পরিস্থিতিতে, জাতীয়তার মাপ-কাঠি (Principle of Nationalities) অনুযায়ী বিভাজনপ্রক্রিয়াকে অবশেষে এক জায়গায় থামাতেই হয়। তাই, জাতীয় প্রশ্নের শতকরা এক-শ ভাগ সমাধান জাতীয় চেতনার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। তবে,

> 'বর্তমানে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যসীমা বেঁধে দেয়া, ট্রাইবেল ও উঁচতি জাতিগুলোর জন্য আত্মশাসন ও সমস্ত জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচ, সকল ভাষার সমানাধিকার এবং এক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা

করার পক্ষপাতিত্ব রদ, কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা কমিয়ে রাজ্যগুলির অটোনমি প্রসারিত করা প্রভৃতি দাবি এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিতরেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জোরে কম-বেশী আদায় করা সম্ভব। এই ধরনের সমস্তগুলো যতদূর মিটানো যাবে, ততই গণতান্ত্রিক ও শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের লড়বার সুযোগ বাড়বে।'[১১]

এই কয়েকটি কথা মনে রেখেই, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নতুন-নতুন উঠতি জাতিগুলির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে যথোচিতভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাইরের কলকাঠি নাড়ানোর ফলেই ছোটো-ছোটো জাতিগুলির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে, নচেৎ দেখা দিত না—এমন চিন্তা মার্কসবাদসম্মত নয়। ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতে শ্রেণীসংগ্রামে আলোড়িত জনসমাজের মধ্যে নানা অঞ্চলে নতুন-নতুন জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটছে, আর বাইরে থেকে কলকাঠি নাড়ানো হচ্ছে তাদের বিপথগামী করার জন্য। এভাবে দেখাটাই মার্কসবাদসম্মত।

'জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য গঠনের দাবি উঠলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায় না। এই ধরনের প্রত্যেকটি আন্দোলন ও দাবিকে গণতন্ত্রের দিক দিয়ে বিচার করেই কর্তব্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।'[১০]

স্বভাবত, এখানে ঘরের কাছের দার্জিলিঙ জেলার সাম্প্রতিক গোর্খাল্যানড আন্দোলন তথা স্বতন্ত্র রাজ্যগঠনের দাবির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আলোচনার খেই ধরে এ সম্বন্ধে কিছু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

৭

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বর্তমান দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল ব্রিটিশ ভারত তথা বঙ্গদেশের বহির্ভূত এবং জনবিরল। পরে নেপাল, সিকিম এবং ভুটানের রাজাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বিভিন্ন এলাকা নিয়ে বঙ্গদেশের মধ্যে ক্রমে দার্জিলিঙ জেলার সৃষ্টি। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে সামন্তীয় শোষণে জর্জরিত নেপাল থেকে জনাগমন ঘটেছে এই জেলায়। এখনো অব্যাহত এই জনাগমনস্রোত। চাষবাসের জমি এবং চা ও সিনকোনা বাগিচায় কাজকর্মের খোঁজে নেপাল থেকে হাজারে-হাজারে আগতদের অনেকেই উপজাতীয় এবং লিম্বু, রাই, শেরপা, তামাং ইত্যাদি নানা উপভাষাভাষী। আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য ঐতিহাসিক কারণে যেমন উত্তরবঙ্গে বাঙলাভাষা রাজবংশীদেরও ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনি দার্জিলিঙ জেলায় খাস নেপালি ভাষা (খাস কুরা) ক্রমে হয়ে পড়েছে নেপাল থেকে আগত অধিবাসীদের সার্বজনিক ভাষা। এমন-কি, লেপচা আর ভুটিয়াদের সঙ্গে ভাববিনিময়েরো ভাষা। জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায়, নেপালিভাষীরা মোট জনসংখ্যার সাত শতাংশর (৭%) বেশি হবেন না এখন, কিন্তু বাকি তিনটি পার্বত্য মহকুমার একত্রিত জনসংখ্যার নব্বই শতাংশই (৯০%) নেপালিভাষী। এই তিনটি মহকুমাকে তাই পশ্চিমবঙ্গের গোরখাদের গৃহভূমি বলা যেতে পারে।

প্রধানত, এই গৃহভূমির উপরে দাঁড়িয়েই পশ্চিমবঙ্গে গোরখাদের জাতীয় সংস্কৃতির অনুরণন এবং প্রসারণ ঘটেছে বিগত প্রায় একশ বছর পরে। দার্জিলিং শহর থেকেই ১৮৮৭ সালে টার্নবিল (Turnbill) সাহেবের নেপালি ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল। নেপালি ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরবও দার্জিলিঙের। ১৯০১-এ যখন সেখানে রেভারেনড গঙ্গাপ্রসাদ প্রধানের সম্পাদনায় গোরখা খবর কাগজ প্রকাশিত হয়, তখনো খোদ নেপালে কোনো সংবাদপত্র ছিল না। ১৯১৮ থেকে পরশমণি প্রধানের সম্পাদনায় "চন্দ্রিকা" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ এবং ১৯২১ থেকে এলাহাবাদ এবং

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে নেপালি ভাষার অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় থেকেই জেলার পার্বত্য এলাকার প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নেপালি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার আন্দোলন দানা বাঁধে (ত্রিশের দশকে কার্যকর হয়) এবং নেপালি সাহিত্য আন্দোলনের ভিত্তি প্রশস্ত হয়। তার আগেই, ১৯১৭-তে দার্জিলিঙের পর্বতবাসীদের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করা এক স্মারকপত্রের মাধ্যমে কয়েকজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোক উক্ত জেলার সঙ্গে ডুয়ার্স অঞ্চলকে যুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এই দাবিকে কেন্দ্র করেই, ব্রিটিশ শাসকদের উশকানিতে ও রাজভক্তদের নেতৃত্বে, হিলমেন্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন ১৯২১-২২ নাগাদ গড়ে উঠেছিল। এই অ্যাসোসিয়েশনের সত্যিকার কোনো গণভিত্তি ছিল না। বরং বিশের দশকে গোরখা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেপালি সাহিত্য সম্মেলন এবং পরবর্তী দশকে গোরখা লীগ দার্জিলিঙবাসী গোরখাদের নবলব্ধ জাতীয় চেতনার মঞ্চ হিসাবে দেখা দিয়েছিল।[২১] তা সত্ত্বেও অ্যাসোসিয়েশনের ব্রিটিশঘেঁষা ভেদপন্থী কার্যকলাপ নানাভাবে চলতে থাকে। 'পাহাড়ি'দের সম্পর্কে বাঙালি অভিজাত এবং মধ্যবিত্তের আচার-আচরণে উচ্চমন্যতার প্রকাশও এ ব্যাপারে ইন্ধন যোগাতে থাকে। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের কাছে এবং ১৯৪২-এ আবার ভারতসচিবের কাছে দার্জিলিঙের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টির দাবি পেশ করা হয়। ১৯৪২ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে দার্জিলিঙবাসী গোরখাদের যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। তবু, উন্মেষমুখী গোরখা জাতীয় চেতনায় এই আন্দোলনের ছাপ পড়তে শুরু করেছিল ১৯২১-২২ থেকেই।

১৯৪২-৪৩-এ নদীয়ার সুশীল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে জেলায় কমিউনিস্ট দলের কার্যকলাপের সূচনা হয়েছিল। ফলে, চল্লিশের দশকে পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৯২৮-এ প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় গোরখা লীগের স্থানীয় শাখার প্রতিপত্তি মধ্যশ্রেণীর গোরখাদের মধ্যে বাড়তে থাকলেও, নিম্নবর্গের গোরখারা, বিশেষ করে বাগিচাশ্রমিকরা, কমিউনিস্ট দলের প্রভাবের আওতায় আসতে থাকেন। তখনকার দলীয় কর্মসূচী অনুযায়ী কমিউনিস্টরাই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক নীতিকে গোরখাদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। স্বাধীন ভারতে জাতি হিসাবে দার্জিলিঙের গোরখাদেরও থাকবে অন্তর্ভুক্ত থাকা বা না-থাকার নিঃশর্ত অধিকার—এই আওয়াজের এবং শোষণবিরোধী আর্থ-রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিতেগোরখা জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চে টেনে আনা সম্ভব হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের কথা নীতিগতভাবে বলা হলেও, বাস্তবে কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদকে পরাস্তই করা হয়েছিল। রতনলাল ব্রাহ্মণ, ভদ্রবাহাদুর হামাল, গণেশলাল সুব্বা প্রমুখের পরিণত রাজনৈতিক নেতৃত্বে বাঙালি-অবাঙালি-নির্বিশেষে শ্রমিক-ঐক্য দৃঢ় হয়েছিল। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিতির অনুকূলে জনমত গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে, ব্রিটিশঘেঁষা ভেদবাদীদের পুরানো স্বতন্ত্র পার্বত্যরাজ্য দাবির পক্ষে আর জনসমর্থন ছিল না। বরং, নেপালি ভাষা সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীর অন্তর্ভুক্ত হলে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই স্বশাসিত গোরখাল্যানড এলাকা গড়ার সুযোগ থাকলে স্থানীয় নেপালিভাষীদের জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পাবে—দার্জিলিঙে এমন একটি মনোভাবই গড়ে উঠেছিল। এই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল প্রধানত গোরখা শ্রমিকশ্রেণীর নবজাগ্রত গণতান্ত্রিক চেতনা। এখানে উল্লেখ্য যে ঠিক ভারত-বিভাজনের পরে-পরেই ব্রিটিশ চা-মালিকদের ইঙ্গিতে গোরখা লীগ এবং অন্যান্য ভেদবাদীরা দার্জিলিঙ, ডুয়ার্স, কোচবিহার এবং আসামকে নিয়ে একটা আলাদা প্রদেশ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। তখন

দৈনিক "স্বাধীনতা"য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এর তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছিল।[২২] জনসমর্থনের অভাবে গোরখা লীগ অবশেষে তাদের ভেদবাদী এই অবস্থান থেকে ক্রমে সরে আসতেও বাধ্য হয়েছিল।

এই পরিবর্তনের ফলে, দার্জিলিঙ অঞ্চলে কমিউনিসট দল, গোরখালীগ এবং জাতীয় কংগ্রেস —এই তিন প্রধান সক্রিয় পক্ষের প্রতিনিধিরা যুক্তভাবে স্বাক্ষরিত একটি স্মারকপত্রে ১৯৫৭ সালেই দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকার জন্য স্বশাসনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। অনুরূপ-দাবি-সংবলিত প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভায়ও ১৯৬৭ এবং আবার, ১৯৮১ সালে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত রাজি হন নি এই দাবি মেনে নিতে। যেসব কারণে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পার্বত্য এলাকায় মার্কসবাদীদের প্রভাব বেড়ে চলেছিল, তার অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে গোরখাদের জন্য স্বশাসিত এলাকার অনুকূলে এই রাজনৈতিক অবস্থান। ১৯৫৫-তে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছেও মার্কসবাদীরা অনুরূপ প্রস্তাব রেখেছিলেন।

স্বতন্ত্র গোরখাল্যান্ড রাজ্যের বদলে রাজ্যের মধ্যেই স্বশাসিত গোরখাল্যান্ড এলাকা সৃষ্টির প্রস্তাব কেন শ্রমজীবী গোরখাজনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, তা-ও বোঝা দরকার। ভারতের মোট নেপালিভাষী জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ মাত্র দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা; বাকি ১০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গেই অন্যত্র এবং ৫৭ শতাংশ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালী গণ-আন্দোলন রয়েছে, যা বিপদে-আপদে সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ায়। তা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে খুবই ছোটো রাজ্য। এ অবস্থায় রাজ্যকে দু-টুকরো করলে কারো কোনো লাভ নেই। বরং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, তখন উভয় অংশেই উগ্র-জাতীয়তাবাদের শিকড় আরো শক্ত হবে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে দার্জিলিঙকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আওয়াজ উঠেছিল স্থানীয় রাজভক্ত ভূস্বামীদের কায়েমি স্বার্থের তরফ থেকে। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব থেকে দার্জিলিঙকে দূরে রাখা। আশির দশকে আবার এই আওয়াজ আরো প্রবলভাবে উঠেছে ওই একই গোষ্ঠী এবং উঠতি স্থানীয় বুরজোয়াদের তরফ থেকে। প্রায় ৪০,০০০ নেপালি অধিবাসীকে, নাগরিকত্ব না থাকার অজুহাতে, মেঘালয় রাজ্য থেকে হঠাৎ বহিষ্কৃত করার ফলে উদ্ভূত উত্তপ্ত পরিস্থিতিই গোরখাভেদবাদীদের পুনরুত্থানের সুযোগ এনে দিয়েছে। জনসাধারণের একটি বড়ো অংশকে বিভ্রান্ত করে তাঁরা একটি উগ্র-জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট (গোন্যালিফ) গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। উদ্দেশ্য, দার্জিলিঙের শ্রমিক-কৃষক-দের প্রগতিশীল আন্দোলনকে বিষিয়ে তোলা এবং পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব থেকে গোরখা শ্রমজীবী সমাজকে বিচ্ছিন্ন করা। উন্মুক্ত কুকরি এবং রক্ততিলক প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে, ধোঁয়াটে কথাবার্তার আড়ালে, উগ্রজাতীয়তাবাদীরা এক ফ্যাসিসট-সদৃশ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

কাগজে-কলমে গোরখা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের দাবি ভারতের মধ্যেই স্বতন্ত্র গোরখাল্যান্ড রাজ্য আদায়ের দাবি বটে, কিন্তু মিজোরামের দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় এই দাবির শেষ কোথায় হবে। মিজোরামে যেমন "বৃহত্তর মিজোরামের" আওয়াজ ইতিমধ্যে উঠেছে, তেমনি "বৃহত্তর গোরখাল্যান্ডের" দাবিও যথাসময়ে উঠবে। রাজকীয় নেপাল থেকে এক পূর্বমুখী জনপ্রব্রজনের স্রোত অব্যাহত। ইতিমধ্যে এর ফলে দার্জিলিঙ, সিকিম এবং ভুটানে নেপালি-ভাষীরা বিপুলভাবে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত। ডুয়ার্স অঞ্চলে, এমন-কি, পার্শ্ববর্তী আসামে ও হিমালয়ের সানুদেশে অনেক নেপালি-অধ্যুষিত পকেট গড়ে উঠেছে। অতএব, ভারতের বাইরে এবং

ভিতরে লাগোয়া সমস্ত নেপালিভাষী অঞ্চল নিয়ে বৃহত্তর গোরখাল্যান্ড গড়ার স্বপ্নও অনেকেই দেখতে শুরু করেছেন। কমিউনিসট-প্রভাবমুক্ত এবং গণ-তন্ত্রবর্জিত এইরকম একটি এলাকা সৃষ্টির ব্যাপারে নয়া-সাম্রাজ্যবাদীদেরও উৎসাহ না থাকার কথা নয়। উল্লেখ্য, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ফৌজের জন্য আজও এই বৃহৎ এলাকা থেকে ব্যাপকভাবে গোরখা রংরুট সংগ্রহ করা হয়।

এইসব কথা বিবেচনা করেই ভারতীয় গোরখাদের প্রগতিশীল অংশ গোন্যালিফ-র আলাদা গোরখা রাজ্য দাবির বিরোধিতা করেছেন। এই বিরোধিতা করতে গিয়ে অন্তত ত্রিশজন গোরখা রাজনৈতিক কর্মী উগ্র জাতীয়তাবাদীদের হাতে এ পর্যন্ত নিহত এবং সহস্রাধিক পরিবার গৃহহীন হয়েছেন। উগ্র গোরখা জাতীয়তাবাদ কিংবা উগ্র বাঙালিয়ানার পথে নয়, বরং পারস্পরিক আলোচনা থেকে উদ্ভূত কর্মসূচী অনুযায়ী মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। নেপালি ভাষার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, ১৯৭৬-এর ৩০শে জুলাই-এর মধ্যে আগত নেপালিদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা এবং রাজ্যের মধ্যে স্বশাসিত এলাকা সৃজনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পথেই পশ্চিমবঙ্গের গোরখা-দের জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা বহুলাংশে সম্ভব। মার্কসবাদ অনুযায়ী এটা বর্তমান পর্যায়ে মূলত রাজ-নৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন, অর্থনীতির নয়। তবে, একথাও মনে রাখা দরকার যে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের অগ্রগতির চাবিকাঠি রয়েছে কৃষিসমস্যার সমাধানে, জাতীয় সমস্যার সমাধানে নয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে মার্কসবাদীদের কাছে তাই জাতীয় প্রশ্নের স্থান কৃষিসমস্যার নীচে।[২৩] বিমূর্ত নীতিবাগীশতার বা নিয়মতান্ত্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, রাজনৈতিক-বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই জাতীয় প্রশ্নের সমাধান করা উচিত। পরিস্থিতি বিচার করেই, ভারতে মার্কস-বাদীরা সম্প্রতি ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের জন্য নতুন করে কোনো রাজ্যকে খণ্ডিত করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের খণ্ডী-করণের ফলে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতাই শুধু বাড়বে, এবং সেই রন্ধ্রপথে নয়া-ঔপনিবেশিকতা-বাদীদের অনুপ্রবেশ ঘটবে। এ ব্যাপারে ভারতের প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি, এমন কি আসামের অসম গণপরিষদ দলও একমত।[২৪]

উপসংহারে আবার বলতে চাই যে ছোটোবড়ো অনেক জাতি-উপজাতি, ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং জাত-পাত নিয়ে গঠিত একটি দেশে, উদার ফেডারেল নীতি মেনে চললে জাতীয় প্রশ্নের সমাধান বহুলাংশে সম্ভব। কিন্তু সম্পূর্ণ সমাধান কখনোই সম্ভব নয়। শ্রেণীসমাজে জাতীয় সমস্যা অল্পবিস্তর থেকেই যাবে। এমন-কি, যেসব দেশে সমাজবাদ কায়েম হয়েছে, সেখানেও এর ক্রমক্ষীয়মাণ জের নির্মূল হতে বহুদিন লাগবে। এই বাস্তবকে মেনে নিয়েই, সমাজ আন্তর্জাতিকতাবাদের পথে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে।

তথ্যনির্দেশক পাদটীক।

১. জে. ভি. স্তালিন, *Marxism and the National Question* (মসকো, ১৯১৩)।

২. ভি. আই. লেনিন, "Right of Nations to Self-determination" (*Collected Works*, খণ্ড ২০, মসকো, ১৯৬৪);
"Critical Remarks on the National Question", প্রাগুক্ত এবং
"The Discussion on Self-determination Summed up" (*Collected Works*, খণ্ড ২২, মসকো, ১৯৬৪)।

৩. এঙ্গেলসের রচনা থেকে উদ্ধৃতির জন্য, পি. এন্. ফেদোসেয়েভ, *Leninism and the National Question* (মসকো, ১৯৭৭) পৃ. ৫৯।

৪. রবীন্দ্ররচনাবলী, খণ্ড ১৫, (শতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা) পৃ. ২৮৪-৫।

৫. অমলেন্দু গুহ, "The Indian National Question : A Conceptual Frame", *Economic and Political Weekly*, খণ্ড ১৭, জুলাই ১৯৮২ এবং "Nationalism : Pan-Indian and Regional in a Historical Perspective" (ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বর্ধমান অধিবেশনে পঠিত আধুনিক ভারতের ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ), *Social Scientist*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

৬. উদ্ধৃতির জন্য, গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত এবং সত্যাংকর গুপ্ত অনূদিত, "পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য" (কলিকাতা, ১৯৪৪) পৃ. ৫১।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ এবং পৃ. ১৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৯।

১১. স্মারকলিপির জন্য, এইচ. এন. মিত্র সম্পাদিত, *Indian Annual Register*, খণ্ড ১, জানুয়ারি-জুন ১৯৪৬, পৃ. ২২০-২১।

১২. অমলেন্দু গুহ, *Planter Raj to Swaraj : Freedom Struggle and Electoral Politics in Assam 1826—1947* (নিউ দিল্লী, ১৯৭৭) পৃ. ৩১০-৫।

১৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অসম প্রাদেশিক সম্মেলন : রাজনৈতিক প্রস্তাব : প্রথম অধিবেশন (গৌহাটি, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) পৃ. ১৬-১৭।

১৪. সি. পি. আই (এম), *Work Report (Political) of the Central Committee to the Ninth Congress...Note on National Question and Amendment to Party Programme Adopted by the Ninth Congress* (কলিকাতা, ১৯৭২)।

১৫. পি. সুন্দরাইয়া, *National Integration : A Critique of Govt. Policies* (কলিকাতা, ১৯৭৪),

১৬. উভয় উদ্ধৃতির জন্য, ১৪নং-এ উল্লিখিত "Note on National Question..." (অনুবাদ আমাদের)।

১৭. লেনিন এবং স্তালিন, উভয়ের মতেই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। তবে, এই অধিকার প্রয়োগের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকারও রয়েছে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর ও জনসাধারণের। যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তীয় স্বার্থের অনুকূলে যায়, তবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য তাকে বাধা দেওয়া। লেনিন একথাও বলেছেন যে সীমিত স্ব-শাসন পরিস্থিতিভেদে অধিকতর স্ব-শাসন, এমন কি পূর্ণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ-এর দিকেও একটি পদক্ষেপ হতে পারে। আবার, তা নাও হতে পারে। "The Discussion on Self-determination Summed Up", নং ২, পৃ. ৩৪৪-৫।

১৮. সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ছোটো ছোটো জাতির আন্দোলন ব্যবহৃত হওয়ার বিরুদ্ধে এঙ্গেল্‌স্ এবং লেনিনের সতর্কবাণীর কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট নেতা জেম্‌স্ ই. জ্যাকসনের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। "জাতীয় প্রশ্ন আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদী বুরজোয়ার নয়া-ঔপনিবেশিক নীতির বিশেষ বিচরণক্ষেত্র।...জাতিসমূহের স্বাধীনতা ধ্বংসকারী সাম্রাজ্যবাদীরা আজকাল 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' অতিবড় প্রবক্তারূপে অবতীর্ণ। জাতীয়তাবাদের সকল রকমকেরের বড় মুরব্বী আজ ওয়াশিংটন।" ১৯৭৯ ৭ই আগস্টের বক্তৃতা, *Political Affairs*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ৩।

১৯. উদ্ধৃতির জন্য অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, **ভারতে জাতীয় প্রশ্ন ও মার্কসবাদ** (কলিকাতা, ১৯৮৫) পৃ. ১২। গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টি সর্বপ্রথম প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল "দেশহিতৈষী"তে (শারদসংখ্যা, ১৯৭০)।

২০. উদ্ধৃতির জন্য ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টি "জাতীয় প্রশ্ন ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সমস্যা" শিরোনামায় প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল "দেশহিতৈষী"তে (শারদসংখ্যা, ১৯৭৪)।

২১. বিস্তৃত তথ্যের জন্য, ১৯৭৯-এ ওয়ালটেয়ারে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কার্যবিবরণীর অন্তর্ভুক্ত, বরুণ দে এবং প্রণবরঞ্জন রায়-এর "Notes for the History ot Darjeeling District" দ্রষ্টব্য।

২২. "চা-বাগান অঞ্চলকে বাংলা হইতে পৃথক করিবার প্রচেষ্টা", দৈনিক "স্বাধীনতা", ৩রা অকটোবর ১৯৪৭।

২৩. প্রকাশ কারাত, "Theorteical Aspects of the National Question", *Social Scientist*, খণ্ড ৪, অগস্ট ১৯৭৫।

২৪. সংবিধানের তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী যে-কোনো রাজ্যের সীমানা অথবা নাম পরিবর্তনের এবং নতুন রাজ্য সৃষ্টির ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া রয়েছে। এই ক্ষমতা রদ করার জন্য উক্ত ধারাটির সংশোধন দাবি করেছে All Assam Students' Union (AASU)। সতীশচন্দ্র কাকতি, "Should Assam be Divided?", the *Statesman*, ২৯ অকটোবর ১৯৮৬ দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য, আসাম-কাছাড় এবং পশ্চিমবঙ্গ-দার্জিলিং সম্পর্ক নানা দিক দিয়েই তুলনীয়।

অগ্রজের অভীচ্ছায়ায়

(কবিবন্ধু বিষ্ণু দে-র স্মৃতির উদ্দেশে)

বিরাম মুখোপাধ্যায়

এ-সময়ে এই পরিবেশে একান্ত অঙ্গুলিমেয়
উন্মিত্র উন্মুখ সেই সুদীক্ষিত কান
শতাংশের ভগ্নাংশেও তবু লোভ প্রত্যাশাপ্রাপ্তিতে
এখনও অবিচল। ঠোঁটে মুখে অক্ষিপটে সন্নত ললাটে
মৃদুমন্দ হাসির উপল—প্রেক্ষিতে নন্দন-নক্সা—
সুধীন্দ্র কি জীবনানন্দীয় তুল্যমূল্য
মোনা লিসা-হাসির দ্ব্যর্থকে ম্লান মুকুরিত জয়ে
এই নীল এই লাল সমারোহ উজ্জ্বল উৎসবে
নয়নাভিনন্দনের সব স্বর্ণকণা-অণুকণা
সংযত সুন্দর কৌতুকের উৎপ্রাসেও বিমিশ্র শিল্পের মেলা
দেশজ বিস্ময়ে মনোরম মঞ্জুষা ছাপিয়ে ওঠে
পটে পরিধানে শিষ্ট রৌদ্র-সেঘ-ছায়ার শীতলে
বিরল সে-প্রয়োজনা যামিনী রায়ের চিত্রশালা
যেন—আত্মীয় মাটির শ্যামদূর্বা-ধান প্রাণ কাড়ে।
বাণীশৈলী উপমায় অভিরাম মন্ত্র-উচ্চারণ
রোমহর্ষ, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জে ধৃত চতুরালি
দ্বিতীয়বহিত মর্মের গভীরে বন্ধু
বিষ্ণু দে বিষ্ণু দে!

গোহাটায় কিংবা পাঁঠা-ছাগলের ভিড়-ভাড়াকায়
বোট্‌কা-গন্ধের আমদানি-রফতানি—মোলায়েম মাখনের
জল-স্ফটিকের টলটল ছায়া মুছে কী কুশল
ভেজালের-দূষণের অদৃশ্য দংশনে
সন্ধ্যার মালতী সন্ধানের পরিক্লান্ত কুচ্ছ্রতার
শেষে তিল-পরিমাণ প্রত্যয়ের খিন্ন অবশেষ—
শেষ কেন কখনো সমাধি নেই শিল্পের সংঘাতে॥

ঘরে ফেরার সময়

(কোনো যাযাবর নবদম্পতিকে)

কৃষ্ণ ধর

অনেক হয়েছে, আর যাযাবর হয়ে থাকতে চাই না
কোথাও বসতে চাই স্থিতু হয়ে কোনো গৃহকোণে
দেখতে চাই, আমাদের দুজনের ভিতরে
আর কোন্ কোন্ সংলাপ বাকি আছে বলার
জানতে চাই, ধুলোপায়ে ঘরের ভিতরে এলে
বাস্তবিক এ-শহরে আগন্তুক মনে হয় কিনা।

ঘুরেছি অনেক সরাইখানায় আড়াই দিনকা ঝোপড়িতে,
ওয়েটিং রুমে, কেটেছে অনেক রাত্রি সুপারফাস্ট ট্রেনের কামরায়
অজন্তার গুহাচিত্র দেখতে-দেখতে নিজেদেরও দেখেছি আড়চোখে
কোভালাম সমুদ্রসৈকতে প্রতিটি স্পর্ধিত ঢেউয়ের চূড়া
পৃথক দেখেছি গুনে-গুনে আলস্যে মধ্যাহ্নে

অরণ্যেও গেছি, পাতায়-পাতায় দেখেছি রৌদ্র থেকে
কীভাবে ক্লোরোফিল শুষে নেয় দুর্মর প্রাণের স্পৃহায়
নির্বাক উদ্ভিদ, পেয়েছি নিগূঢ় ঘ্রাণ স্তব্ধতারও

এবার বসতে চাই স্থির হয়ে পরস্পর মুখোমুখি
কিছুদিন, দেখতে চাই নিজস্ব জানলায় রোদ,
সন্ধ্যার অলিন্দে আকস্মিক ভাঙা চাঁদ, বুভুক্ষু ও একা
বুঝতে চাই, বুকের ভিতরে জোয়ার-ভাঁটার টান
খেলে কিনা আজও
দেখতে চাই, প্রতিদিনের ঘষায় প্রতিমার রঙ উঠে যায় কিনা

যাযাবর এসবের খবর রাখে নি কোনোদিন
তাকে ডাকে প্রোজ্জ্বল সকাল আর আচ্ছন্ন গোধূলি
ডাকে মরুস্থলী, ডাকে ছায়াবীথি, নিষিদ্ধ নীলিমা
ঘরকে ডরায় সে, পলাতক তাই বুঝি যেতে চায় পথে

আমি তাকে চারদেয়ালের ভিতর টেনে আনতে চাই
দেখতে চাই, হৃদয়ের তলানিতে উষ্ণতা আছে কিনা তার
বুঝতে চাই, ঘরে ফেরা সাধ ছিল কিনা।

বালখিল্য

সুভাষ দে

এসব বর্ণমালা তোমাকেই দেব
এ হৃদয় চেনে না হীরা পান্না,
মুক্তার ঐশ্বর্য নেই, শুধু এই, শব্দ রঙ সাদা, তোমার বরণ।

পাখির পালক জুড়ে মুকুটে
জ্বলজ্বলে চোখের তারায় আলোময় সম্ভাষণ,
বুক তোলপাড়, এসব জুড়েই, সার-সার বক, হৃদয় হরণ।

অস্থিতে ঢালো জল
এই নাও চিতাভস্ম আমার সম্বল, পুত্রাদিক্রম উত্তরাধিকার
তোমাকে দিলাম, একটু পিণ্ড দিও, মানুষের নামে
মানুষই জানে
শ্মশানের ঐশ্বর্য সন্ধান, গর্ভস্থ শিশুর মতো
মাটিতে লুকানো নরম ভ্রূণ ও তার সম্ভাব্য বপন।

অথচ হিজিবিজি
অক্ষর মুছতে তার বালখিল্য দাগ
ভাঙা পুতুল, ছেঁড়া পোশাক, আগুনে হাত দিয়ে নিজেকে দহন।

নিষ্প্রভ সন্ধ্যায়

মেঘ মুখোপাধ্যায়

নিষ্প্রভ সন্ধ্যায়
আমার রক্তের গন্ধ আমাকে মাতায়
চতুর্দিকে জানালা দরজা বন্ধ
অন্ধিসন্ধি জানি না বিশেষ
কী করে যে কাছে যাওয়া যায়!
অস্তিত্বের কাছে, আরো কাছে
তমস্বিনী সেই নারী ধুনি জ্বেলে
আমার চিতায় করাল বদনে বসে আছে
লোল জিহ্বা, স্বপ্নগুলি নখের আঘাতে
ছিন্ন করে পরেছেন বিশাল গলায়
তার নগ্ন শরীরের সমুদ্র ও গর্জমান তরঙ্গের তীরে
আজ রাত্রি হতবাক—মৃত শিশুদের নাকে
জীবনের রঙ এসে সন্ধ্যার আকাশে
বিপুল বিক্রমে ছয়লাপ অশরীরী গন্ধ হয়ে যায়।
অস্তিত্বের কাছে, আরো কাছে
শতাব্দীশেষের বিভীষিকা, পৃথিবীর ঝরনা
আর জলপ্রপাত বিস্ময়ে পাথর হয়েছে
মানবিক নির্জনতা নেই—চরাচর মস্ত নির্জন
ওঁতপাতা ঠাণ্ডা মাথা পেশাদার দক্ষ ঘাতক;
হাঁটু ও কোমর ভেঙে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছি সন্ধ্যার চাতালে
সম্ভাব্য ধ্বংসের স্মারক—হৃৎপিণ্ডে এক ছুই···
অসংখ্য বিস্ফোরণ, ফুসফুসে ধোঁয়া
পৃথিবী নিলাম করে তিনটি মাতালে, সব হেরে
এইবার সর্বস্বান্ত জুয়াড়িরা বাজি ধরে আলো

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বাইশ

'Oh ! faciles nimium qui tristia crimina caedis
Fluminea tolli posse putatis aqua !'

Fasti—Ovid

রত্নময়ী কেন সেদিন হঠাৎ আমাকে প্রণাম করেছিল, জানি না। খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রামের পর বিকেলে ইচ্ছে হল, পদ্মার চরে ঘুরতে যাব। একজন পরিচারিকা চা দিয়ে গেল। তার কাছে জানতে পারলাম, রত্নময়ীর শরীর খারাপ। শুয়ে আছে। নীচে গিয়ে মুন্সিজির খোঁজ করলাম। বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে শুকনো ফোয়ারার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তখন উনি এলেন। কপালে হাত তুলে নিঃশব্দে আদাব দিলেন। বললাম, একটু বেরুব ভাবছি। 'পাহ্‌লোয়ানকে' আনতে বলুন। মুন্সিজি একটু হেসে বললেন, সে হচ্ছে। রাজবাড়ি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হল, বলুন শুনি। বললাম, কী ধারণা হবে? মুন্সিজি প্রথমে যেন অবাক হলেন। তারপর বললেন, এই বাড়িতে আমি তিরিশ বছর আছি। আমারও তবু যখন ধারণা হয় নি, তখন আপনারই বা কেমন করে হবে? তবে ঠাহর করে দেখুন, বাড়িটার গায়েও মুসলমানি ছাপ। আপনি লালবাগে মোতিমহল দেখেছেন কি? বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ। বাড়িটা নবাবি ধাঁচের মনে হচ্ছে। মুন্সি আবদুর রহিম আমার হাত ধরে ফোয়ারার শুকনো বৃত্তাকার মারবেল চত্বরের কাছে নিয়ে গেলেন। পাশাপাশি বসলাম দুজনে। তারপর বললেন, এখান থেকে একক্রোশ দূরে বিহার মুলুক। নবাবি আমলে এই বাড়িটার মালিক ছিলেন বিহারের ফতেগঞ্জের এক মুসলমান ফৌজদার। পরে লিটন নামে এক ইংরেজ কিনে নেন। তাঁর কাছে কেনেন অনন্তনারায়ণবাবুর বাবা। তাহলে দেখুন, মুসলমানি আর ইংরেজি দুই জমানা এ বাড়িতে গেছে। অনন্তনারায়ণবাবুর দোষ নেই। ইংরেজি আর মুসলমানি দুইরকম কেতায় তিনি বড়ো হয়েছেন।

নবাববাহাদুরের ক্লাসফ্রেনড ছিলেন ইংলনড দেশে। সেই থেকে দোস্তি। দোস্তির ফলে লালবাগ হাভেলি থেকে মন্নুজান বাইজির এ বাড়িতে আসা। কিছু বুঝলেন? বললাম, বুঝলাম। মুন্সিজি হাসলেন।··· বোঝেন নি এখনও। এ বাড়ির চাকর-নোকর-ঝি-আয়া-বাবুর্চি-খানসামা, খাওয়াদাওয়ার রীতিতেই ইংরেজি-মুসলমানি কেতা মিশে আছে। অনন্তনারায়ণবাবুর আত্মীয়স্বজন গোঁড়া হিন্দু এবং তাঁরা বিহারে থাকেন। তাঁরা বহু বছর এ বাড়ির সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। তাতে অনন্তনারায়ণবাবুর আরও সুবিধে হয়েছে। মুসলমানপ্রধান এলাকা। লাঠিয়াল-পাইক-বরকন্দাজ সবাই মুসলমান। কর্মচারীরাও বেশির ভাগ মুসলমান। আর প্রজারাও ভাবে, তাদের 'রাজাবাবু' আধা-মুসলমান। কলমা পড়তে বাকি। ···মুন্সিজি হাসলেন। কিন্তু বাঁকা হাসি। তারপর আস্তে বললেন, একজন ভণ্ড, লম্পট, মাতাল—আস্ত শয়তান! তার অধীনে কেন চাকুরি করছি যদি বলেন, তার জবাব শুনুন। জহরত-আরার জন্য! জিগ্যেস করলাম, কে জহরত-আরা? মুন্সিজি দুঃখিত মুখে বললেন, আপনি পিরের খান্দান। মুসলমান। তবু জিজ্ঞেস করছেন? ইচ্ছে হল, একটা কড়া জবাব দিই। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটির জন্য কেন কে জানে করুণা হচ্ছিল। চুপ করে থাকলাম। তখন মুন্সিজি বললেন, জহরত-আরা ফারসি কথা। জহরত মানে রত্ন। আরা মানে ছটা। এবার হেসে ফেললাম। বললাম, বুঝেছি। মুন্সিজি বললেন, এতটুকু থেকে মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মতো দেখে আসছি। ওর বয়স যখন সাত বছর, তখন ওর মা কড়িকাঠ থেকে ঝুলে—বাধা দিয়ে বললাম, রত্নময়ীর ধারণা, তার মাকে তার বাবা খুন করেছিলেন। মুন্সিজি একটু চুপ করে থেকে বললেন, রাজবাড়িতে গুজব রটেছিল। সে-গুজব বাইরেও ছড়িয়েছিল। জহরত-আরার কানে গিয়ে থাকবে। তবে ওর লালন-পালনের কোনো ত্রুটি করেন নি অনন্তনারায়ণবাবু। মেমসায়েব রেখে বাড়িতে ইংরেজি শিখিয়েছেন। আমার কাছে নিজের চেষ্টায় আরবি শিখেছে। কিছু ফারসিও শিখেছে। একজন হিন্দুপণ্ডিত কিছুকাল বাঙলা-সংস্কৃত শেখাতেন। পরে জাতিপাতের ভয়ে তিনিও গতিক বুঝে কেটে পড়েন। কিন্তু জহরত-আরা বুদ্ধিমতী। অত্যন্ত মেধাবী। ঝটপট সবকিছু শিখে নেওয়ার ক্ষমতা ওর আছে। বললাম, বাবু গোবিন্দরাম কেমন লোক? মুন্সিজি গম্ভীর মুখে বললেন, খুবই সাচ্চা লোক। কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনিও আর থাকবেন না। মালিকের প্রতি আমার মতোই অসন্তুষ্ট। তিনি একজন উদারহৃদয় হিন্দু। জহরত-আরাকে তিনিও আমার মতো স্নেহ করেন। আমরা দুজনে পরামর্শ করেই আপনার আব্বা-হজরতের কাছে ওকে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিলাম। জমিদারবাবুকে দিয়ে চিঠি আমরা লিখিয়ে নিয়েছিলাম। জানেন তো উনি খুব ভালো ফারসি জানেন? মুন্সি আবদুর রহিম তাঁর শীর্ণ আঙুল খুঁটতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্বাস ছেড়ে ফের বললেন, আপনার আব্বা-হজরতের দয়ায় জহরত-আরার অসুখ একেবারে সেরে গিয়েছিল। কিন্তু আবার কিছুদিন থেকে সেই আগের মতো বেহুঁশ হয়ে পড়ছে। বেহুঁশের সময় আরবি জবানে আগের মতো নিজের বাবার বিরুদ্ধে কুৎসিত কথা-বার্তা বলছে। মাঘমাসে ব্রহ্মপুরে—আবার দ্রুত বাধা দিয়ে বললাম, রত্নময়ীর দাদার কথা বলুন, শুনি। মুন্সিজি ভীষণ চমকে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, জহরত আপনাকে কতটুকু বলেছে জানি না। সদর শহরে থেকে কালেজে পড়ার সময় হরিনারায়ণ স্বদেশীদের পাল্লায় পড়ে। কালেকটরকে গুলি করতে গিয়েছিল। একজন দারোগা মারা পড়ে গুলিতে। কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল জানি না। পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেছিল। বিচার চলার সময় জেলহাজত থেকে সে পালিয়ে গেছে। কীভাবে পালাতে পারল কে জানে? অনন্তনারায়ণবাবুর ব্যাপার তো বললাম। ইংরেজদের সঙ্গেও খুব দহরম-

মহরম আছে ওঁর। কাজেই ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঢোলশহরত জারি করেছেন। খবরের কাগজেও সে-কথা ছাপিয়েছেন—ইংরেজি কাগজে! বুঝলেন তো? বললাম, বুঝলাম। হরিবাবু কোথায় আছেন, জানেন কি? মুন্সিজি বিষণ্ণভাবে হেসে বললেন, মাঘমাসে ব্রহ্মপুর থেকে ফিরে এসে জহরত আমাকে সব বলেছে। আমার ধারণা, দাদার সঙ্গে ওর দেখা হওয়াটা উচিত হয় নি। আগে জানলে গোবিন্দবাবুকে নিষেধ করতাম। ব্রহ্মপুর থেকে ফিরে আসার পর থেকেই অসুখটা আবার দেখা দিয়েছে। এখন আমার খালি ভয় হচ্ছে, বেহুঁশের ঘোরে বাঙলা জবানে যদি দৈবাৎ দাদার সম্পর্কে কিছু বলে ফেলে, মুশকিল হবে। সরকার হরিনারায়ণকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবেই জেনে রাখুন। আর দেখুন শফিসাহেব! জীবনে অনেক ঠকে শিখেছি, মানুষকে খুন করে মানুষের ভালো করা যায় না। আপনি কজনকে খুন করবেন? এত বড়ো দুনিয়া, এত মানুষ! কতজনের ভালোর জন্য কত-জনকে খুন করতে হবে? মূর্খ মানুষ এই কথাটা কেন বোঝে না যে খুনীর হাতের রক্ত কিছুতেই ধোয়া যায় না! যতই করুন, রক্তের ছাপ হাত থেকে মোছা যাবে না।···দার্শনিক বৃদ্ধের দিকে করুণা এবং বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ রোমান কবি ওভিদের একটি কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ে গেল: 'হায়! যারা ভাবে, হত্যার মতো কদর্য অপরাধ সহজেই নদীর জলে ধোয়া যাবে, তারা কী গোবেচারা!' শিউরে উঠলাম। বললাম, 'পাহ্-লোয়ানকে' আনতে বলুন সহিসকে। পদ্মার চরে ঘুরে আসি। মুন্সিজিও উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল, আরও অনেক কথা যেন বলার ছিল।···

'Love begins in shadow and ends in light'

"পদ্মার ধসিয়া-পড়া ঢালু তীরে দুর্বাঘাসের হরিদ্বর্ণ কোমলতা এবং তাহারও নিম্নে একফালি নীলাভ জলের অধিকতর কোমলতার পর চরের ধূসর বালির মিশ্রিত কোমলতা একটি কালো চতুষ্পদ প্রাণীর কঠিন খুরে বিক্ষত হইতেছিল। পাহ্লোয়ান, তুই বর্বর! তুই একজন ভ্যানডাল! পাহ্লোয়ান বলিল, কাহাকে গালি দিতেছ? আমি নিমিত্ত মাত্র। পাহলোয়ানের সহিত নির্জনে এরূপ কথোপকথনের সূত্রপাত হইল। চরটি ক্রমে-ক্রমে কচ্ছপের পিঠের আকৃতি বোধ হইল এবং বালি দৃঢ়তর হইতে হইতে মাটিতে পরিণত হইল। শীর্ষদেশে, কেন্দ্রস্থলে একটি বৃক্ষ দেখিলাম। যখন বৃক্ষটি দেখিতেছিলাম, তখন পাহলোয়ান বলিল, অমন করিয়া কী দেখিতেছ? বলিলাম, একটি বৃক্ষ। পাহলোয়ান এবার একটি আশ্চর্য বাক্য উচ্চারণ করিল। যখন প্রান্তরে কোনও বৃক্ষকে দেখ, তখন প্রান্তর দৃষ্টির অগোচরে থাকে। বলিলাম, ঠিক বলিয়াছ। বৃক্ষ ও প্রান্তর একই সঙ্গে দর্শন অসম্ভব বটে। পাহলোয়ান বলিল, অথচ দেখ, প্রান্তর না থাকিলে বৃক্ষ থাকে না। প্রান্তরই বৃক্ষকে প্রকাশ করে। বলিলাম, এমন কথা কেন বলিতেছ? কৃষ্ণকায় অশ্বটি মুন্সী আবদুর রহিমে পরিণত হইল। বলিল, অবতরণ কর। বলিতেছি। তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলে সে বলিল, পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে সকল বস্তু—জড় হউক, কী অ-জড় হউক, মায়াবিভ্রম মাত্র। তুমি সতর্ক হও। মায়াবিভ্রম—উহা মরীচিকা। উহার দিকে ধাবিত হইও না। শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত হইবে। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, ইহার অর্থ কী? ইহা বলারই বা উদ্দেশ্য কী? রূপান্তরিত সত্তাটি বলিল, তোমার জন্য দুঃখ হয়। তুমি পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে সকল কিছু দর্শন কর। তুমি সিতারা বেগম, স্বাধীনবালা মজুমদার, কিম্বা রত্নময়ী ত্রিবেদীকে ওই বৃক্ষবৎ দেখিয়াছ। আরও ভাবিবার আছে। দেখ, দেখ। বৃক্ষে একটি পক্ষী আসিয়া বসিল। এবার বৃক্ষটি আর নিতান্ত বৃক্ষ রহিল কি? উহা পক্ষীময় হইল। এবার দেখ, একজন মানুষ আসিয়া বৃক্ষতলে

দাঁড়াইল। বৃক্ষটি আরও পরিবর্তিত হইল। উহার নির্জনতার আকৃতি লোপ পাইল। দেখ, দেখ, মানুষটির কাঁধে একটি বন্দুক! বৃক্ষটি নিজস্বতা হারাইল। পক্ষী, মানুষ, বন্দুক, বৃক্ষ মিলিয়া একটি জটিল বিভ্রম। সক্রোধে বলিলাম, বিভ্রম গুঁড়াইয়া ফেলিতেছি। দেখ, কী করি! বলিয়া অগ্রসর হইলাম। এই বিশাল চরসমাকীর্ণ নদীটি পূর্ববাহিনী। পশ্চিম হইতে অস্ত-সূর্যের পীতাভ লাল আলোয় মানুষটিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একজন গোরা সাহেব! সে বৃক্ষের মূলে বসিয়া কাণ্ডে হেলান দিয়া উত্তরে কিছু দেখিতেছে। আমি ও পাহলোয়ান দক্ষিণে নিম্নভূমিতে থাকায় সে আমাদের দেখিতে পায় নাই বোধ হইল। নিকটবর্তী হইলে সে আমার পায়ের শব্দে চমকিয়া মুখ ঘুরাইল। তাহার পর ধমক দিয়া বলিল, হেই ব্যাবু! ইদার মাত্ আও! গো অ্যাওয়ে! সে ইঙ্গিতে স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। সম্ভবত গোরা সাহেবটি হাঁস মারিতে আসিয়াছে। তবু আমি তাহার দিকে যাইতেছি দেখিয়া সে বন্দুক তাক করিয়া বলিল, ইউ ড্যাম নেটিভ কুত্তা! ভাগো! সহাস্যে দ্রুত বলিলাম, স্যার। আই মে হেল্প ইউ টু ফাইণ্ড্ আউট এ প্লেস হোয়্যার ইউ উইল সি থাউজ্যাণ্ড্স্ অ্যাণ্ড থাউজ্যাণ্ড্স্ অফ্ ওয়াইল্ড ডাক। গোরা শিকারী বন্দুক নামাইল। চকিতদৃষ্টে চতুর্দিকে দেখিয়া লইলাম। উঁচু চরটির উত্তর-পূর্বাংশ ঢালু হইয়া পরিব্যাপ্ত কালো জলে মিশিয়াছে। দূরে কয়েকটি নৌকা। পশ্চিমেও জল—কিন্তু উহা দিনশেষের ম্রিয়মাণ আলোকে ঈষৎ রঞ্জিত। দক্ষিণে দূরে উঁচু পাড় জনহীন। দক্ষিণ-পূর্বে আরও দূরে কৃষ্ণপুর দিগন্তরেখার সহিত মিশ্রিত। গোরাসাহেব উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ডোণ্ট মাইণ্ড ব্যাবু! আই অ্যাম ড্যাম টায়ার্ড। লেট্স্ গো দেয়ার। ও মাই গড! সে বন্দুক তুলিবার পূর্বেই ভূতলশায়ী হইল। তাহার বুকে মাত্র একহাত দূর হইতে পিস্তল-এর গুলি গিয়া ঢুকিয়াছিল। তাহার তলপেটে একটি পা দাবাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িলাম। দ্বিতীয় গুলি তাহার কপাল ফুটা করিল। বন্দুকটির জন্য লোভ সম্বরণ করিলাম। পুনর্বার চারদিক চকিতদৃষ্টে দেখিয়া লইয়া ধীরে গম্ভীর শরীরে পাহলোয়ানের নিকট ফিরিলাম। দেখিলাম, উহার দার্শনিক সত্তা লোপ পাইয়া পুনরায় চতুষ্পদ বাহনে পরিণত হইয়াছে। পাড়ে উঠিয়া একটু ভাবনা হইল। পাহলোয়ানের খুর এবং আমার জুতার ছাপ ফেলিয়া আসিলাম! তবে হরিবাবু এবং স্বাধীনবালার কাছে সগৌরবে এবং সবিস্তারে বর্ণনার যোগ্য একটি কীর্তি বটে। পাড় হইতে কিছুদূর শস্যশূন্য জমি এবং ঝোপঝাড়ের পর কাঁচা রাস্তায় পৌঁছাইয়া ভাবিলাম, রত্নময়ীকে ঘটনাটি বলিব কি? তৎক্ষণাৎ মনে হইল, কিন্তু কেন এই কদর্য কর্মটি করিলাম? মুন্সীজীর সেই উক্তির উপযুক্ত প্রত্যুত্তরদান হইল কি? স্ট্যানলির পিস্তলে আর চৌদ্দটি কার্তুজ অবশিষ্ট রহিল। যদি গুলি না ছুটিত, গোরা শয়তানটির বন্দুক কাড়িয়া লইতাম সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এ কাজ করিলাম? পাহলোয়ান! বল্ তো ভাই, কেন আবার এই দুর্মতি ঘটিল? পাহলোয়ান চুপ করিয়া রহিল। তখন বলিলাম, ওই শালা আমাকে নেটিভ কুত্তা বলিয়া তাক করিয়া-ছিল। উত্তরের ফটক দিয়া 'রাজবাড়িতে' ঢুকিলাম। ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে যাইলে রত্নময়ীকে দেখিতে পাইলাম। আবছা আঁধারে ফোয়ারার বৃত্তাকার বেদীতে একা বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সেই সহিস দৌড়াইয়া আসিল। পাহলোয়ানকে কিছুক্ষণ টহল খাওয়াইবার নির্দেশ দিয়া রত্নময়ীর কাছে গেলাম। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আমার প্রিয়তমের দেখা হয় নাই? কিছু তফাতে বসিয়া বলিলাম, একজন গোরা সাহেবকে দেখিয়াছি। নিশ্চয় সে তোমার প্রিয়তম নহে? রত্নময়ী বলিল, বুঝিয়াছি। তুমি মতিগঞ্জের কুঠিয়াল রিজলিকে দেখিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কে? রত্নময়ী বলিল, সে রেশম কারবারী। তাঁতী এবং জোলা-দিগকে বেমরশুমে দাদন দেয়। রেশমী থান রেলপথে

কলিকাতা চালান করে। বাবার সহিত তাহার খুব বন্ধুতা আছে। আস্তে বলিলাম, লোকটি কি প্রকৃতির? রত্নময়ী শুধু বলিল, বাবার বন্ধু! বুঝিলাম সে কী বলিল। একটু পরে বলিলাম, বৈকালে শুনিয়াছি, তোমার শরীর খারাপ। বাহির হইলে কেন? রত্নময়ী আস্তে বলিল, তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি। সে কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। বলিলাম, আমি এখনই রওয়ানা হইব। দাওয়াত করিয়াছিলে। দাওয়াত খাইয়াছি। এইবার বিদায় চাহি। রত্নময়ী শ্বাস-মিশ্রিত স্বরে বলিল, দাওয়াত শব্দের অর্থ শুধু খাদ্যবিষয়ক নহে। তোমাকে আমার জিনটির সঙ্গে ডুয়েলে লড়িতে ডাকিয়াছিলাম। তুমি বিস্মৃত হইয়াছ দেখিতেছি। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, কোথায় সে? তাহাকে ডাক। দেখি, লড়িতে পারি নাকি। রত্নময়ী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমার সহিত আইস। দেখাইতেছি। এইসময় প্রাসাদের পার্শ্বারের এদিকে, ফোয়ারার পিছনে আবছা একটি মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। বলিলাম, কে? মুন্সীজী সাড়া দিয়া বলিলেন, কতদূর ঘুরিলেন? মনে হইল, লোকটি আড়ালে দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছিল। বলিলাম, বিহারের মাটি দেখিয়া আসিলাম। মুন্সীজী বলিলেন, চরে যান নাই? বলিলাম, না। ঘোড়া লইয়া যাইবার রাস্তা দেখিলাম না। পার্শ্বারের কড়িকাঠ হইতে একটি ঝাড়বাতি জ্বলিতেছে। সেখানে মুন্সীজী আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন, মা জহরত! রত্নময়ী বলিল, জী? মুন্সীজীর মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, অন্য কিছু বলিবেন। কিন্তু বলিলেন, বেশী চলাফেরা করিও না। বেশী কথাবার্তা বলাও ঠিক নহে। মুন্সীজী কথাটি বলিয়াই চলিয়া গেলেন। হলঘরেও ঝাড়বাতি জ্বলিতেছিল। রত্নময়ী গালিচা-ঢাকা কাঠের সোপানে বালিকার ন্যায় উঠিতেছিল—চঞ্চল ও দ্রুতগতি। উত্তর-পূর্ব কোণে হরিবাবুর সেই কক্ষের বারান্দায় এক পরিচারিকা দাঁড়াইয়া ছিল। রত্নময়ী বলিল, দুইখানি চেয়ার পাতিয়া দাও। আর বাবুমহাশয়ের জন্য চা লইয়া আইস। কিছু খাদ্যও আনিবে। আপত্তি করিবার সুযোগ পাইলাম না। রত্নময়ী চেয়ারে বসিয়া বলিল, বস। জ্যোৎস্নারাত্রে এখানে বসিয়া আমি এবং দাদা পদ্মা দেখিতাম। একটু পরে চাঁদ উঠিবে। সে হাসিল। পুনরায় বলিল, ওইখানে আমার প্রিয়তম জিনটি শাদা ঘোড়ায় আমাকে চড়াইয়া খেলা করে। কী? চুপ করিয়া রহিলে যে? তুমি কি আমাকে মিথ্যাবাদিনী ভাবিতেছ? রত্নময়ীর কথায় তীব্রতা ছিল। বলিলাম, না। তুমি যখন বলিতেছ, তখন উহা সত্য বলিয়া মানিব। রত্নময়ী উচ্চস্বরে বলিল, আমি কিছু বলিলেই উহা সত্য হয় না। তুমি বলিলেও হয় না। যাহা সত্য, তাহা সত্য। ইংলিশ প্রবচনটি নিশ্চয় অবগত আছ যে 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।' তোমাকে দেখাইতেছি। বলিয়া সে বারান্দা দিয়া ছায়ার ভিতর মুছিয়া গেল। আমাকে অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। মানসিক অস্থিরতা প্রবলতর হইতেছে। চরে পাহলোয়ান ও আমার পদচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। পদচিহ্নগুলি ষড়যন্ত্রপূর্ণ চাপাস্বরে কথাবার্তা বলিতেছে। পরিচারিকা ইংলিশ খাঞ্চায় (ট্রে) খাদ্য এবং চায়ের সরঞ্জাম বেতের টেবিলে রাখিয়া চলিয়া গেল। এই বাড়ির মানুষগুলি পুতুল। কোনও অদৃশ্য হাত ইহাদের চালনা করিতেছে যেন। সেই চালনায় বদ্ধ ফটক খুলিয়া যায়। সহিস দৌড়াইয়া আসে। বান্দা-বাঁদীরা হুকুম তামিল করিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করে না। মনে হইল, বাড়িটি একটি কারখানা। কিম্বা এই প্রথম জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশের জন্য এইসব ধারণা হইতেছে। সম্ভবত সকল রাজা-নবাব-জমিদার-বিত্তশালীদের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা এমনভাবে ঘড়ির কাঁটার নিয়মে চালিত হয়। কক্ষের ভিতর শেজবাতি ছিল। তাহার আলোকে বারান্দা ঈষৎ আলোকিত। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে রত্নময়ী আসিয়া কক্ষ হইতে বাতিটি আনিয়া টেবিলে রাখিল। তাহার হাতে একখণ্ড কাগজ ছিল। বসিয়া বলিল, এই দেখ।

ইহাতে সত্য চিত্রিত করিয়াছি। আলোয় কাগজটি ধরিলাম। উহাতে নিম্নরূপ ছক রহিয়াছে।

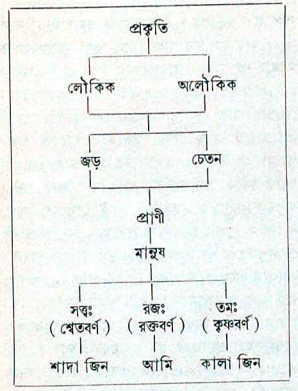

রত্নময়ী গম্ভীরমুখে বলিল, কিছু বুঝিলে? চিন্তা কর। খাইতে খাইতে চিন্তা কর। গভীর মনোযোগের ভান করিয়া বলিলাম, আহার চিন্তার প্রতিকূল। বরং পানীয়—বিশেষত উষ্ণ পানীয় মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করার অনুকূল। রত্নময়ী দ্রুত চা প্রস্তুত করিল। চায়ে চুমুক দিয়া বলিলাম, 'আমি'-টা কে? রত্নময়ী শ্বাস-মিশ্রিত স্বরে বলিল, আমি উহা দেখিলে আমি। এক্ষণে তুমি দেখিতেছ। সুতরাং তুমি এক্ষণে 'আমি' হইয়াছ। মুখে গাম্ভীর্য রাখিয়া বলিলাম, 'আমি' রক্তবর্ণ কেন? রত্নময়ী চক্রান্তসঙ্কুল অথচ যন্ত্রণাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিল, 'আমি' নিয়ত আক্রান্ত। শরবিদ্ধ। রক্ত ঝরিতেছে। তাহার দিকে চাহিলাম। সে আমার দিকে চাহিয়া আছে। চক্ষুর্দ্বয়ে নিঃশব্দ অশ্রুজনিত সিক্ততা। বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তুমি কাঁদিতেছ কেন রত্নময়ী? (বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নবেলের প্রসিদ্ধ উক্তিটির প্রতিধ্বনি করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু তৎকালে উহা স্মরণ ছিল না।) রত্নময়ী বলিল, কেহ আমাকে উদ্ধার করার নাই বলিয়া কাঁদিতেছি। ভাবিয়াছিলাম—সে চুপ করিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, কী ভাবিয়াছিলে? রত্নময়ী এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তখন বলিলাম, তুমি বিত্তবান ব্যক্তির কন্যা। কেহ-না-কেহ একদিন তোমাকে বিবাহ করিবে। বিত্ত-ঐশ্বর্য এমন বস্তু, যাহা জাতিপাতজনিত সংস্কার পদদলিত করিয়া থাকে।···ডোজ বেশ কড়া হইয়াছিল। আমি ঠিক ইহাই চাহিয়াছিলাম। রত্নময়ী সহ্য করিতে পারিল না। হুংকার ছাড়িয়া বেতের টেবিলটি উল্টাইয়া দিল। সুদৃশ্য বাতি এবং চীনামাটির সুন্দর পাত্রগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইল। অন্ধকারে উহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে ঝড় বহিতেছিল। তাহার পর সে মূর্ছিতা হইল। চেয়ার উল্টাইয়া পড়িবার মুহূর্তে উহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। বিস্ময়ের কথা, এই বাড়ির অদৃশ্য জাদুকর হাতের খেলা এমনই নিপুণ যে তৎক্ষণাৎ লণ্ঠন হাতে পরিচারক-পরিচারিকারা আসিয়া পড়িল। উহারা কি সতত এই জিনগ্রস্ত রাজকন্যাটির গতি-বিধির প্রতি নজর রাখিয়া আড়ালে ওত পাতিয়া থাকে? উহাদের হাতে কম্পিত শীর্ণ যুবতীদেহটি অর্পণ করিয়া দ্রুত চলিয়া আসিলাম। হলঘরে নামিলে মুন্সীজীর সহিত দেখা হইল। বলিলাম, আমি এখনই রওনা দিতেছি। আসুন, পাহলোয়ানের আস্তাবল দেখাইয়া দিন। মুন্সীজী বিলম্ব করিলেন না। বুঝিলাম, তিনি এই অবাঞ্ছিত আপদবিদায়ের জন্য ব্যগ্র ছিলেন।···"

'Stand out of my way, you are blocking the sun.'

—Diogenes to Alexander, the Great.

একদিন 'হাজারিলালে'র কুটিরে যাবার সময় বিজয়-

পল্লীর পাশে বাঁধের কিনারায় একটি প্রকাণ্ড ছাতিম-গাছের তলায় ভিড় দেখলাম। ভিড়ের কারণ একজন সাধু কিংবা ফকির। মাথায় জটা আছে। কিন্তু পরনে কালো আলখেল্লা। গলায় মোটা-সোটা লাল পাথরের মালা। হাতে একটি প্রকাণ্ড লোহার চিমটে। চিমটের ডগায় তামার আংটা। সে চিমটেটি বুকে ঠুকছে। ঝুন-ঝুন শব্দ হচ্ছে। বাঁকা সর্দার এবং আরও কিছু লোক সামনে বসে আছে। বাঁকা গাঁজা ডলছিল। একটু পরে বুঝলাম, সাধু নয়, মুসলমান ফকির। এদের লোকে মস্তানবাবা বলে। সে চোখ বুজে বিড়-বিড় করে দুর্বোধ্য কিছু আওড়াচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলাম। 'হাজারিলাল' কুটিরে নেই। পাহলোয়ানের চালাঘর খালি। এদিক-ওদিক খুঁজে দেখি, একটু দূরে জলার ধারে পাহলোয়ান ফাঁড়িয়াস চিবুচ্ছে। পেছনের পা-দুটি যথারীতি বাঁধা। সে লাফ দিয়ে চলাফেরা করে এবং পছন্দসই ঘাস বেছে খায়। কিছুক্ষণ বাঁশের মাচানে একা চুপচাপ বসে কাটালাম। সারাক্ষণ অস্বস্তি। পদ্মার চরে চিহ্ন রেখে এসে-ছিলাম। পরদিন বিকেলে কালবোশেখির ঝড়বৃষ্টিতে সেগুলি ধুয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগে যদি ধূর্ত কোনো দারোগার চোখে পড়ে থাকে? একটি কালো ঘোড়া এবং তার সওয়ার কৃষ্ণপুরের অসংখ্য ঘোড়া এবং সওয়ারদের মধ্যে যদি মিশে গিয়ে না থাকে? মাচান থেকে নেমেছি, টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল। অগত্যা কুটিরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি থামলে জুতো খুলে ধুতি গুটিয়ে ফিরে চললাম। বিজয়পল্লীর সামনে গিয়ে দেখি সেই মস্তানবাবা একা দাঁড়িয়ে ভিজছে। আমাকে দেখামাত্র সে কালো আলখেল্লা দুদিকে সরিয়ে নিজের নগ্ন শরীর দেখাল। থমকে দাঁড়ালাম। লোকটির শরীর ঘন লোমে ঢাকা। কিন্তু চামড়ার রঙ ফ্যাকাসে, শাদা। মুখের রঙের সঙ্গে কোনো মিল নেই। খাড়া নাক। লাল চোখ। পুরু কাঁচাপাকা ভুরু। মুখে শিশুর হাসি। সে থি থি করে হাসছিল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কী দেখলি? জবাব না দিয়ে চলে আসছি, বাঁধের উলটোদিকের একটি ঘরের দাওয়া থেকে একটি লোক একগাল হেসে বলল, বড্ড খারাপ স্বভাব মশাই! কাউকে মানে না। সব্বাইকে ওইরকম! বাঁকার জন্যে ওর রক্ষে। নৈলে কবে মেরে তাড়িয়ে দিত। সে কথা বলতে-বলতে আমার সঙ্গ নিল। মাথা থেকে পিঠ ঢেকে পেছনে হাঁটু অব্দি লম্বা তালপাতার একরকম আচ্ছাদন তার। কোটরের মতো দেখতে এই আচ্ছাদনের স্থানীয় নাম 'টাপোর'। বর্ষায় চাষীরা কেউ মাথাল, কেউ তাল-পাতার এই টাপোর পরে মাঠের কাজ করে। লোকটি বলতে-বলতে চলল, পয়সার ওপর কিন্তু লোভ নেই। খাওয়াদাওয়াতেও তেমনি। কেউ দিল তো খেল, নয়তো না। তবে সিদ্ধপুরুষ বলে মনে হয়, জানেন? ছেলেপুলেদের খুব ভালোবাসে। সে হাসতে লাগল। ভালোও বাসে, আবার ওই ছুটুমিও আছে। বুঝলেন? যদি বলে, ও মস্তানবাবা, হিসি করোদিকিনি, দেখি! অমনি হিসি করে দেখাবে। অবশ্যি সাধুফকির-সিদ্ধপুরুষরা ওইরকমই হয়।···দেবনারায়ণদার স্বর্গ-রাজ্যের অবস্থা দিনে-দিনে এভাবে বদলে যাচ্ছে তাহলে। সেদিনই ওঁকে মস্তানবাবার কথাটা বললাম। একটু চুপ করে থেকে বললেন, লোকটিকে দেখেছি। একদিন সন্ধ্যার প্রার্থনাসভা থেকে চোখ পড়ল, একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রহ্মকীর্তনের সময় বুকে চিমটে ঠুকে তাল দিতে-দিতে নাচতে লাগল। কীর্তন শেষ হল। তখন ও গান গেয়ে উঠল। গলাটা গাঁজা খেয়ে নষ্ট করেছে। কিন্তু সুরেলা। সত্যি বলতে কী, সমস্ত সভা স্তব্ধ, নিস্পন্দ। তুমি কোথায় ছিলে জানি না। ছিলে কি? বললাম, নিশ্চয় ছিলাম না। তাহলে শুনতে পেতাম। দেবনারায়ণদা বললেন, একখানা মারফতি গান গাইল। মনে হল, জীবাত্মা-পরমাত্মার কথাই বলছে। গানের বাণীটি শোনো। পরে লিখে নিয়েছি। বলে তিনি একটি ডায়রিই খুলে পড়ে শোনালেন :

সবে বলে আল্লা-আল্লা আমি জানি দুই।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লা মিছা জানি মুই॥
একদেশেতে দুজন রাজা
কেউ কারুরো নয়কো প্রজা
আরশে প্রেমের খেলা বুঝলি না গো তুই॥*

দেবনারায়ণদা বললেন, ফকিরদের মধ্যে অদ্বৈত-বাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সবরকম আছে দেখেছি। এ একটি গভীর গবেষণা আর চিন্তার বিষয়। বহু বছর আগে আরেকজন মারফতি ফকিরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে এমন পাগলাটে প্রকৃতির নয়। গম্ভীর লোক। তার একখানি গান লেখা আছে। পড়ি শোনো :

যার আকার নাই তার খুঁজলে কী পাই বল আমারে।
নিরাকার নিরঞ্জন সে ভাই শুনি সর্বশাস্তরে॥
কী দেখে নাম প্রচার হয়
যার নাই কিছু তাহার পিছু কী হবে দোড়ে-দোড়ে॥*

দেবনারায়ণদার কাছে যাওয়া ভুল হয়েছিল। হাতে পেলে সহজে নিষ্কৃতি দেন না। এবার তিনি গুনগুন করে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন। শাস্ত্রীজি এসে উদ্ধার করলেন। ডাকঘরে গিয়েছিলেন। আশ্রমের চিঠি-পত্রিকার বোঝা বয়ে এনেছেন। বাইরে ভিজে ছাতি রেখে বললেন, বছরের লক্ষণ ভালো বোধ হচ্ছে না। দেবনারায়ণদা চিঠি-পত্রিকার বাণ্ডিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে বেরিয়ে গেলাম। লাইব্রেরি-ঘরে স্বাধীন জানালার পাশে বসে খুব মন দিয়ে কী বই পড়ছিল। মুখ তুলে একটু হাসল। বললাম, হাসছ কেন? স্বাধীন বলল, কানে আসছিল দেবুজ্যাঠা তোমাকে গান শেখাচ্ছেন! বললাম, না—মস্তানবাবা! স্বাধীন ভুরু কুঁচকে বলল, মস্তানবাবা? তারপর হেসে উঠল। ও, বুঝেছি! লোকটা ভারি অদ্ভুত, জান? সেদিন ব্রহ্মমন্দিরের গেটের সামনে দেখি, মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, কী দেখছ অমন করে? বলে কী—বেটি! বাবুকে শিগগির বল্ গিয়ে, এত বড়ো দরজা করেছে, এক্ষুনি বন্ধ করে দিক। নৈলে এখান দিয়ে মন্দির-টন্দির সব পালিয়ে যাবে। চমকে উঠে বললাম, কী আশ্চর্য! স্বাধীন বলল, আশ্চর্য মানে? বললাম, তোমাকে দেখাচ্ছি। আলমারি থেকে বাঁধানো প্রকাণ্ড একটি বই বের করলাম। ব্যস্তভাবে খুঁজতে থাকলাম। স্বাধীন কয়েকবার প্রশ্ন করে তাকিয়ে রইল। বহুক্ষণ পরে পাতাটি খুঁজে পেলাম। বললাম, সমাচারদর্পণ পত্রিকার এই পাতাটি পড়ে দেখো। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর শনিবারের সংখ্যায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'দৈঅজিনিস'-সম্পর্কে কী লেখা আছে দেখো। তুমিও অবাক হয়ে যাবে। স্বাধীন বাঁধানো পত্রিকাবইটি নিয়ে পড়তে থাকল। বললাম, দিও-জেনিস। ইংরেজিতে 'সিনিসিজম' প্রসঙ্গে তাঁর কথা পড়েছি। তিনিই নাকি আলেকজান্দারকে বলে-ছিলেন, 'সরে দাঁড়াও! রোদ আড়াল কোরো না।' স্বাধীন বিরক্ত হয়ে বলল, পণ্ডিতি ছাড়ো। পড়তে দাও। একটু পরে সে উত্তেজিতভাবে বলল, শোনো, শোনো!

'ঐ দৈঅজিনিস এক দিন এক ক্ষুদ্র শহরের উচ্চ প্রাচীর ও অতি উচ্চ তাহার দ্বার দেখিয়া শহরের কর্তারদিগকে কহিল যে তোমরা দ্বার বন্ধ কর নতুবা শহর পলাইয়া যাইবে।'···

এর কিছুদিন পরে স্বাধীনকে জিগ্যেস করলাম, কী খুকু? গোপনে জ্ঞানী মস্তানবাবার দীক্ষা নিলে নাকি? স্বাধীন খাপ্পা হয়ে বলল, লোকটা অসভ্য। পাগল। ছিঃ! হেসে ফেললাম। বুঝলাম 'বেটিকে' কী দেখিয়েছে সে।···

* এই মারফতি গান দুটি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার হিজল অঞ্চলের বিখ্যাত বাউলদ্বয় সালাম ও চমৎকারের কাছে সংগৃহীত। অর্থাৎ লেখকের বানানো নয়।

কাহারও শিরশ্ছেদ করা হত্যা নহে; একটি উপাদানকে অপর একটি উপাদানে পরিবর্তিত করা মাত্র।
—পঞ্চুখ কচ্চায়ন (দীর্ঘনিকায়)

আশ্রমের তন্তুবায় সমিতির ম্যানেজার বসন্তবাবুকে পছন্দ করি না, জানেন। তবু গায়েপড়া স্বভাব। এ-ধরনের লোকেরা সচরাচর ছিদ্রান্বেষী হন। সবখানে খুঁতে খুঁজে পান এবং অপরকে সেটি দেখিয়ে দিতে ছটফট করে বেড়ান। গায়েপড়া স্বভাবের কারণ হয়তো এটাই। জীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা খুঁত-যুক্ত, আমিও মানি। প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্তও হই। কিন্তু আমি বসন্তবাবু নই। কিছুদিন আগে তিনি একটি আশ্চর্য খুঁতের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটি সুতোকাটুনি করুণা ওরফে ইকরাতনের মধ্যাঙ্গ। সেখানে স্ফীতি ছিল। বসন্তবাবু বহু আগেই ওই স্ত্রীলোকটিকে 'ব্যাড ক্যারেকটার' ছাপ সেঁটে দিয়েছিলেন। এবার বলেন, ম্যাথামেটিকস শফিবাবু! ২+২=৪ হওয়া অনিবার্য। বর্ষার এক সন্ধ্যায় বসন্তবাবু আমাকে জানান, খুঁতটি মেরামত করা হয়েছে। গর্ভবতী সুতোকাটুনি দেবনারায়ণদার হুকুমে স্বর্গলোক থেকে নির্বাসিত এবং বিজয়পল্লীতে আশ্রয় নিয়েছে। দেবনারায়ণদার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামব কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু তাঁর নীতিবাদ, জেদ আর খেয়ালের কথা জানি। আমিও নিজের স্বভাব সম্পর্কে সচেতন। নানা কারণে এখন আমার এই সুদৃঢ় আশ্রয় প্রয়োজন। তাই চুপ করে থাকলাম। বসন্তবাবু মাঝে-মাঝে গায়ে পড়ে জানিয়ে যেতেন বাঁকা-সর্দার একটি হবু-রক্ষিতা লাভ করেছে। স্ত্রীলোকটিকে সে একটি কুটির গড়ে দিয়েছে। তখনও বিষয়টির গভীরতা আর রহস্য আঁচ করি নি। শ্রাবণ মাসে হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। আকাশ ভয়ংকর নীল হয়ে উঠল। ওই সময় পাঁচ ক্রোশ দূরে রায়দীঘি গ্রামের পুলিশের থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করেন হরিবাবু। দারোগা চন্দ্রনাথ হাটি এবং জমাদার ফারাকত খাঁ এই দুজন ছিল লক্ষ্যবস্তু। স্ট্যানলি হত্যার পর সারা মহকুমায় বহু নির্দোষ লোককে বিকলাঙ্গ করা হয়েছিল। তার সঙ্গে এই দুই বীর-পুঙ্গবও জড়িত ছিল। আমরা রাত্রে রওনা হব। বিকেলে ভ্রমণের ছলে কেশবপল্লীতে হরিবাবুর কাছে যাচ্ছিলাম। বিজয়পল্লীর সামনে ছাতিমগাছটির তলায় প্রায়ই মস্তানবাবাকে ঘিরে ভিড় থাকত। এদিন একটি দৃশ্য দেখে থমকে গেলাম। মস্তানবাবা হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে। তার সামনে দুহাতে ন্যাকড়ায় জড়ানো একটি শিশু নিয়ে একটি স্ত্রীলোক বসে আছে, সে করুণা নয়। কারণ করুণা তার পাশে। মস্তানবাবা চোখ বুজে বিড়বিড় করছিল। হঠাৎ ঝুঁকে শিশুটির বুকে জোরে ফুঁ দিয়ে বলল, যা! এবার স্ত্রীলোক দুটি উঠে দাঁড়াল। করুণার কোলে শিশুটিকে অপর স্ত্রীলোকটি তুলে দেওয়ামাত্র চিনতে পারলাম। অজিকামামী! ইচ্ছে হল, চিৎকার করে বলি, ভুল! মিথ্যা! অসম্ভব! কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। দ্রুত স্থানত্যাগ করলাম। স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব সত্যই বিচিত্র! 'হাজারিলাল' আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? অসুখ করে নি তো? বললাম, না। খবর জানতে এলাম। হরিবাবু চাপা-স্বরে বললেন, আমাদের মধ্যে চর ঢুকেছে সন্দেহ হয়। খবর এসেছে, গতকাল রাত্রে রায়দীঘি থানায় একজন গোরা সার্কেল অফিসার পঞ্চাশ-ষাটজন সিপাহি নিয়ে শিবির করেছে। কাজেই পরিকল্পনা স্থগিত। সংঘের সদস্যদের আপাতত কয়েকদিন স্থানান্তরে আত্মগোপন করার নির্দেশ দিয়েছি। আমি এইমাত্র স্বাধীনকে দিয়ে তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছি। রাস্তায় দেখা হয় নি? বললাম, না তো! হরিবাবু বললেন, তাহলে মাঠের রাস্তায় গেছে। তুমি এখানে থেকো না। আমি কয়েকদিন বিলের জঙ্গলে কাটাব। আর শোনো, তোমার ঘোড়াটির ব্যবস্থা করা দরকার। তুমি আশ্রমে আছ। দেববাবু তোমার পৃষ্ঠরক্ষা করবেন। কিন্তু ঘোড়াটি তোমার-আমার সংযোগসূত্র। বরং ওকে নিয়ে গিয়ে শিগগির বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। একটু ভেবে বললাম, দেবনারায়ণদার কেন জানি না, ঘোড়া সম্পর্কে কিছু কুসংস্কার আছে বলে ধারণা হয়। হরিবাবু একটু হেসে বললেন,

ঋগ্বেদের অশ্বসূক্তের কথা উল্লেখ করবে। বললাম, সুধন্যকে যদি মাহিনা দিই, সে পাহলোয়ানের দেখা-শুনা করবে না? হরিবাবু চিন্তিতমুখে বললেন, ছোকরা বড়ো অন্যমনস্ক। তবে দেখি, কী করা যায়। বলে উনি হাঁক দিলেন, সুধনিয়া! হো সুধনিয়া! সুধন্য তার কুটির থেকে সাড়া দিল। তারপর দৌড়ে এল। 'হাজারিলাল' বললেন, আবে সুধনিয়া! বাত শুনো। হামি কয় রোজকে লিয়ে আপনা মুল্লুক যাচ্ছে। তু শফিবাবুর ঘোড়ার জিম্মাদারি লে। মাহিনামে তনখা মিলেগা। হামরে দেতে তিন রুপৈয়া। আমার দিকে ইশারা করলে বললাম, পাঁচ টাকা পাবে। 'হাজারিলাল' লাফিয়ে উঠলেন, আরে ব্যস! পাঁচ রুপৈয়া! শালে, তু বড়া আদমি বন্ জায়গা। পাঁ-চ রুপৈয়া! ঢ়াই মন চাউলকা দাম! জয় বজরঙ্গবলী! সুধন্যের চোখেমুখে উজ্জ্বলতা ঝলমল করছিল। জীবনে কখনও সে পাঁচ টাকা একসঙ্গে দেখেছে কি না সন্দেহ। তাকে অগ্রিম হিসেবে দুইটি রুপোর টাকা দিলে সে স্বপ্নাচ্ছন্ন-ভাবে দুহাতে গ্রহণ করল। 'হাজারিলাল' চোখ নাচিয়ে বললেন, তব্ তো শফিবাবু, হৈয়ে গেল। এ সুধনিয়া! যা! উও দেখ্ পাহলোয়ানজি ঘাস খাচ্ছে। দোস্তি-উস্তি করতে হোবে তো, না কী? সুধন্য দৌড়ে বাঁধের নীচে নেমে গেল। এই আদিম পৃথিবীতে ঘোড়াটি ক্রমশ কিছুটা বন্যস্বভাবগ্রস্ত হয়ে উঠছে দিনেদিনে। কিন্তু কিছু করার নেই। মাঝে-মাঝে এসে তাকে সঙ্গ দিই। বাঁধের পথে বহুদূর যাই। লক্ষ করি, কদম ভুল করছে। কখনও অবাধ্যতার লক্ষণ দেখি। মনে হয়, প্রকৃতি ওকে করতল-গত করে ফেলছে। সে একদা আমার সঙ্গে চমৎকার বাক্যালাপ করত। তাকে দার্শনিক বোধ হত। এখন মনে হয়, সে যেন দিওজিনিসে রূপান্তরিত হচ্ছে। স্বাধীনতাময়, সিনিক, উন্মার্গী একটি কালো প্রবাহ। সভ্যতাকে থুরে ভাঙচুর করতে-করতে সে ছুটতে চায়। আমার মতো? হ্যাঁ, ঠিক আমার মতো। উদ্দেশ্যহীনতায় আক্রান্ত দুটি প্রাণী। সেদিন ফেরার পথে বিজয়পল্লীতে দেখলাম, মস্তানবাবা বুকে চিমটে ঠুকে ছ্যাতরানো গলায় গান করছে। ভিড় করে লোকেরা শুনছে। বাঁদিকে একটি চালাঘরের উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে অজিকা মামী শিশুটির দেহে তেল-হলুদ মাখাচ্ছে। স্বর্গভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটি উঠোনের উনুনে পাতা ঠেলে জ্বাল দিতে-দিতে মুখ ঘুরিয়ে শিশুটিকে দেখছে এবং তার মুখে কী এক হাসি। তখনই সিদ্ধান্ত করলাম, শিশুটি বধযোগ্য। হত্যা কী? একটি উপাদানকে ভিন্ন উপাদানে পরিবর্তিত করা মাত্র। প্রকৃতিতে ইহা সতত ঘটিতেছে। সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মের অভিব্যক্তি। 'স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তম।' লাইব্রেরিতে ঢুকে বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দীঘনিকায়' খুলে বসলাম। স্বাধীন লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল। ফিরে এসে আস্তে বলল, হরিদা খবর পাঠিয়েছেন —তাকে থামিয়ে বললাম, জানি। হরিবাবুর কাছ থেকে এখনই আসছি। স্বাধীন বলল, কী বই পড়ছ? বললাম, শোনো!

'মহারাজ! যে করে এবং করায়, যে ছেদন করে এবং ছেদন করায়, যে অঙ্গহীন করে এবং অঙ্গহীন করায়, যে শোক ও নির্য্যাতনের কারণ হয়, যে কম্পিত হয় এবং কম্পিত করায়, যে প্রাণনাশ করে, যে সন্ধি ছিন্ন করে, যে অদত্ত গ্রহণ করে, যে লুণ্ঠন করে, যে চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়, গুপ্ত স্থান হইতে যে হঠাৎ পথচারীকে আক্রমণ করে, যে পরদারগমন করে, মিথ্যাভাষণ করে, তাহার এইসকল কর্ম্মছাড়া পাপ হয় না। যদি কেহ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা পৃথিবীর প্রাণীগণকে এক মাংস-খণ্ডে, এক মাংস-পুঞ্জে পরিণত করে, তজ্জন্য কোন পাপ হয় না, পাপের আগম হয় না। যদি ওই ব্যক্তি আঘাত করিতে২ ছেদন করিতে২ হত্যা করিতে২ ছেদন করাইতে২ অঙ্গহীন করাইতে২ গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোন পাপ হইবে না, পাপের আগম হইবে না।'...

স্বাধীন শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলল, এসব কার উক্তি? বললাম, অক্রিয়াবাদী দার্শনিক পূরণ কস্‌সপের।

তিনি বুদ্ধ ও মহাবীরের সমকালের লোক। স্বাধীন বলল, কী ভয়ানক কথা! বললাম, খুকু! তুমি একদিন স্ট্যানলিকে হত্যার জন্য আমাকে পিস্তল দিয়েছিলে। অবশ্য সে তোমার পিতৃঘাতী ছিল। কিন্তু হরিবাবু এবং আমি তাকে হত্যা করেছিলাম। স্ট্যানলির স্ত্রীপুত্রকন্যার দিক থেকে চিন্তা করো। তাদের মর্মযাতনার কথা ভাবো। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হয়েছে, 'অস্মিতা' অর্থাৎ আমি-ভাব যাবতীয় ক্লেশের অন্যতম প্রধান কারণ। বৌদ্ধ মিলিন্দপঞ্‌হ গ্রন্থে সে-জন্যই হয়তো বলা হয়েছে, 'পুগ্‌গলো নূপলব্‌ভতি।' পুদ্‌গল অর্থাৎ আত্মা নেই। স্বাধীন রুক্ষস্বরে বলল, চুপ করো! পণ্ডিতি অসহ্য লাগে। বুঝলাম, স্বাধীন এই মুহূর্তে আমাকে চিনতে পারল। তার চোখে ভীতি এবং মুখে পাণ্ডুরতা ছিল। সে সশব্দে শ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বইটি বন্ধ করে বসে রইলাম। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা শুরু হয়েছে। দেবনারায়ণদার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। কানে এল, 'আত্মানং বিদ্ধি।' মনে পড়ল পিতার শাস্ত্রীয় ভাষণে মুসলমানদের পয়গম্বরের উক্তির বজ্র-প্রতিধ্বনি, 'যে নিজেকে চিনেছে, সে আল্লাহকে চিনেছে।' আর গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসও বলেছিলেন, 'নিজেকে জানো!' কিন্তু কে আমি? কিছু আকস্মিক ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ একটি চেতনামাত্র। আমার পুদ্‌গল নেই। পদ্মার চরে পাহলোয়ান বলেছিল, 'আমি নিমিত্ত মাত্র।' মধ্যরাত্রে বেরিয়ে পড়লাম। বিজয়পল্লীতে একটি একদিকখোলা চালাঘরে বধ্য ক্ষুদ্র মাংসপুঞ্জ অপর একটি বৃহৎ মাংসপুঞ্জের সংলগ্ন হয়ে জৈবিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মে যথাক্রমে নিদ্রিত এবং ভূতলস্থিত। এবার আর-একটি জৈবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রিয়াশীল হতে চলেছে। কিন্তু চালাঘরটির কাছে যেতেই আরও একটি জৈবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রিয়াশীল হল। একটি অস্পষ্ট হুংকার, পায়ের শব্দ, অন্ধকারের কালো একটি জীব, ঝুনঝুন কোমল ধ্বনিপুঞ্জ, আবার হুংকার। ঘুরে দেখি, মস্তানবাবা! ঝোপঝাড় ভেঙে নেমে গেলাম। ধানখেতে জলকাদা এবং সকল আদিম ব্যাপকতার আঠালো পিচ্ছিল স্তরগুলি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে-নিতে পিছনে আবার হুংকার! তৎক্ষণাৎ জানিলাম, ক্ষুদ্র ওই মাংসপুঞ্জ আমার বধ্য নহে।...

'Then the sluices of the sky opened and everything human was transformed into mud...'

—Epic of Gilgamesh.

এক বৃষ্টির দিনে বারান্দায় শাস্ত্রীজির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দেববাবু! এ কী শুরু হল? যেন আকাশ ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। অন্য কেউ বললেন, ছ্যাঁদা কী বলছেন শাস্ত্রীজি? বলুন, আকাশের দরজা খুলে দিয়েছেন ঈশ্বর। ঘরের দরজা থেকে উঁকি মেরে দেখি, প্রভাসরঞ্জনবাবু। দুজনে ছাতি রেখে বৃষ্টি দেখছেন। প্রভাসরঞ্জন একজন আশ্রমিক। শুনেছি প্রচুর জমি দেবনারায়ণদাকে দেওয়া ঋণবাবদ শুধু সুদের হিসেব দেখিয়ে হাতাতে পেরেছেন। ওঁকে দেখলেই মস্তানবাবা অথবা দিওজেনিসের উক্তি মনে পড়ে যায়, ব্রহ্মমন্দিরের দরজা দিয়ে একদা ঠিকই মন্দির পালিয়ে যাবে। অথচ দেবনারায়ণদার পেয়ারের লোক। আরও শুনেছি, প্রভাসরঞ্জনের বড়ো ছেলে নরেশরঞ্জন-এর সঙ্গে স্বাধীনবালার বিয়ের একটা প্রস্তাব উঠেছে। স্বাধীনের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার বলার কথা থাকতে পারে না। কিন্তু বৃষ্টির দিনে প্রভাসরঞ্জনকে দেখে মনে হল, স্বাধীনকে আমার কিছু বলা উচিত। নরেশকে আমি বাঁকাসর্দারের সঙ্গে গাঁজার ছিলিম টানতে দেখেছিলাম।

সারা ভাদ্র মাস শুকনো গেছে। আশ্বিনের মাঝামাঝি এই বৃষ্টি শুরু। শুধু বৃষ্টি নয়, ঝড়ও। ঘরে চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ মনে হল, পাহলোয়ান কী অবস্থায় আছে? ছাতি নিয়ে এই দুর্যোগে আধ-ক্রোশ দূরত্ব পেরুনো কতখানি কষ্টসাধ্য হবে, হিসেব করতে থাকলাম। সেই সময় দেবনারায়ণদার ঘরে তর্কাতর্কি বেধেছে কানে এল। শাস্ত্রীজির মতে, আকাশ মহাশূন্য, নিরবয়ব, পদার্থহীন সত্তা। অতএব আকাশ ছ্যাঁদা হওয়া বা দরজা খুলে দেওয়া নিছক আলঙ্কারিক প্রয়োগ। প্রভাসরঞ্জন বলেছেন, আমরা আধুনিক যুগে এরূপ ব্যাখ্যা করছি মোক্ষমুলর মহোদয়ও বৈদিক ঋক্‌গুলিনের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তৎকালে লোকদিগের ওইরূপ বিশ্বাস ছিল। দেবনারায়ণদা বললেন, মহাভারতে মহাপ্লাবনের বৃত্তান্ত মনে পড়ে কি? 'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্‌...' কেশব মীনশরীর ধারণ করে বেদ রক্ষা করেন। প্রভাসরঞ্জন বললেন, এরূপ মহাপ্লাবনের গল্প গ্রিস, সুমের সর্বত্র গ্রন্থাদিতে আছে। শাস্ত্রীজি বললেন, বাইবেল এবং কোরান গ্রন্থেও আছে। এগুলিন রূপক। গীতার উক্তি স্মরণ করুন, 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ...'

বাইরে দুর্যোগ। আর এই বিদ্বান লোকগুলি তত্ত্ব আলোচনা করছেন! ক্রমে-ক্রমে ছাতি মাথায় আরও আশ্রমিকগণ আসছেন আচার্যের ঘরে। তত্ত্ব-আলোচনা আরও জমে উঠছে। কে হেঁড়ে গলায় বলে উঠলেন, শুনেছি, সুনয়নী দেবী উৎকৃষ্ট খিচুড়ি রান্না করতে পারেন। খবর দেওয়া হোক ওঁকে। অপর একজন বললেন, খবর নিয়েই আসছি রন্ধনশালা থেকে। হইচই পড়ে গেল। এইসময় শৈশবে শোনা নিরক্ষর চাষাভুষো লোকেদের একটা ছড়া মনে পড়ল:

তিনদিনকার গাজলে
মহিষ মরে হিজলে
টিকটিকিরা বাতায়
উকুন মরে মাথায়
মানুষ মরে খালে
শুধু মায়ের কোলে...

দেবনারায়ণদার গলা শোনা গেল, খনার বচনে কী আছে যেন? মঙ্গলে পাঁচ / শনিতে সাত / বুধে তিন / আর সব দিন-দিন। কী বারে লেগেছে হে ভবেশ? ভবেশ বললেন, বুধবার। দেবনারায়ণদা বললেন, ধুস! আজ তো তিনদিন হল। থামবার লক্ষণ কোথায়? প্রভাসরঞ্জন অট্টহাসি হেসে বললেন, বিভিন্ন শাস্ত্রে আছে, পরমেশ্বর পাপের শাস্তি দিতে নেচারকে লেলিয়ে দেন। ব্রহ্মপুরে স্বামীজী সংঘ এবার দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে না? কেউ বললেন, শিবনাথপল্লীর সেই এঁড়ে চক্কোতি শুনলাম বারোয়ারি পূজা দেবে। দেববাবু, স্পর্ধা মার্জনা করবেন। স্বহস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন। দেবনারায়ণদা বললেন, আমি নিরুপায় মধুবাবু! আশ্রমবাসীদের মধ্যে বিস্তর অ-ব্রাহ্ম আছেন। তাঁদের পরিবারবর্গ আছে। হুজ্জত হোক, পুলিশের দারোগার বুটজুতো আশ্রমের পবিত্র মাটি কলঙ্কিত করুক, এ আমার অভিপ্রেত নয়। প্রভাসরঞ্জন ঘোষণা করলেন, ওয়েট অ্যানড সী। পরমেশ্বর পাপীদিগের শাস্তি স্বহস্তে দেবেন।

পাহলোয়ানের জন্য আমি অস্থির। ছাতি মাথায় নেমে আশ্রমসীমানা পেরিয়ে যাওয়া মাত্র দমকা বাতাসে ছাতি উলটে গেল। বৃষ্টিও গেল বেড়ে। একটি গাছের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু প্রচণ্ড শব্দে কোথায় বাজ পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে কুঁজো হয়ে দৌড়ুনোর চেষ্টা করে আশ্রমে ফিরে এলাম। ওলটানো ছাতি ঠিকঠাক করে ঘরে ঢুকে ভিজে জামাকাপড় বদলে নিলাম। অস্থির মনে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে দেখি, স্বাধীন চুপচাপ একা বসে আছে। আমাকে দেখে কেমন একটু হাসল। বলল, তোমার দুর্দশা আগাগোড়া দেখলাম। কোথায় যাচ্ছিলে? বললাম, পাহলোয়ানের অবস্থা দেখতে। স্বাধীন বলল, সে তো বাঁধের ওপর হরিদার তৈরি আস্তাবলে আছে। সুধন্য আছে। তার জন্য ভাবনা কিসের? যার জন্য ভাবনা হওয়া উচিত, তার কথা তোমার মনে পড়ল না? সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল, হরিবাবু

নাবাল অঞ্চলে জঙ্গলের ভেতর এখনও কোথায় গাঢাকা দিয়ে আছেন। বললাম, তাই তো! স্বাধীন মৃদুস্বরে বলল, ক্লাবে খবর দেওয়া দরকার। কিছু ছেলে ফিরে এসেছে দেখেছি। তাদের হরিদার খবর নেওয়া উচিত। একটু ভেবে বললাম, হরিবাবু নির্বোধ নন। স্বাধীন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কে জানে! যদি বাঁধ ভেঙে যায়?

আমি কী মানুষ! স্বাধীনের হরিবাবুর জন্য দুর্ভাবনাকে প্রেম ভেবে ঈর্ষায় জ্বলে উঠলাম। সে বলেছিল, তার হৃদয়ে পুরুষপ্রেম নেই। তাহলে এ কী? পরমুহূর্তে মনে পড়ল, ও! আমার পুদ্‌গল নেই। তাই আমারও হৃদয় এবং প্রেম নেই। তাহলে ঈর্ষা নিরর্থক।

স্বাধীন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, তোমার ছাতিটা এনে দাও। বললাম, কুটিরে যাবে? সে শক্ত মুখে বলল, না। ক্লাবে। দেখি, যদি ওরা কিছু করে।

আমার আত্মা নেই। তাকে ছাতিটা এনে দিলাম। আত্মা না থাকায় 'শিভালরি'ও আমার কাছে নঙর্থক। শুধু বললাম, দেখো, ছাতি উলটে না যায়। স্বাধীন ছাতির আড়ালে আত্মগোপন করে হাঁটতে থাকল। এই সময় দেবনারায়ণদার ঘরের সামনে কে এসে চিৎকার করে বলল, শঙ্খিনীর ধারে নতুন বাঁধ ভেঙে গেছে। আবাদ ভেসে যাচ্ছে।···

'And now we have come to the place, where,
I toldst thee, thou shouldst see, the wretched
men and women, who have lost
the good of their intellect...'

Inferno—Dante.

ও'মালি সায়েবের জেলা গেজেটিয়ারে এই ভয়ংকর প্লাবনের বিবরণ আছে। পদ্মা-ভৈরব-জলঙ্গী-ভাগীরথী-ব্রাহ্মণী-দ্বারকা-ময়ূরাক্ষী, জেলার মূল নদীগুলি তাদের অববাহিকার সমস্ত প্রাণ নিশ্চিহ্ন করেছিল। পুরুষানুক্রমে জেলার লোকে 'বড়বানের বছর' বলে বিভীষিকাটির স্মৃতি বহন করেছে। আর শা' ফরিদ মস্তানবাবা বলেছিলেন, দরজা দিয়ে মন্দির পালিয়ে যাবে। পালিয়ে গিয়েছিল বটে। ব্রহ্মপুরে সেই প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতীদের আগমন এবং একটি মিশনও স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিক্রিয়া সামলাতে পারে নি। দেবনারায়ণ স্বপ্নদর্শী। বস্তু-জগতের এই হঠকারী উপদ্রবের প্রতি সচেতন ছিলেন না। ফলে কোনো সেবাদল ছিল না তাঁর। সারা আবাদ মৃতদেহের দুর্গন্ধে ভরে ওঠে। যারা বাঁচতে পেরেছিল, তারা কেউ ছিঁচকে চোর, কেউ দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়ে ওঠে। উঁচু এলাকাগুলিতে লুঠপাঠ শুরু করে। বাঁকা সর্দার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রহ্মপুরের ফাঁড়িটি পুরোপুরি থানায় পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেবনারায়ণের হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে এসব পরের কথা। স্বামীজিসংঘের যুবকরা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গে ত্রাণে নেমেছিল। আবাদের বুকে তখন সমুদ্র। একটি নৌকায় উদ্ধারকারী একটি দল জঙ্গলের গাছগুলি থেকে অনেক মানুষকে উদ্ধার করে। সেই নৌকায় স্বাধীনবালা ছিল। সন্ধ্যার মুখে ফেরার সময়। একটি বটগাছ থেকে চিৎকার ভেসে আসে। গাছে শফি ছিল। নৌকায় তাকে ধরাধরি করে নামানো হয়। সে শুধু 'পাহলোয়ান' কথাটি উচ্চারণ করে অজ্ঞান হয়ে যায়। স্বাধীন বুঝতে পারে সে তার ঘোড়ার খোঁজে বেরিয়ে ভেসে গিয়েছিল। সেবাশুশ্রূষা আর চিকিৎসার পর সে সুস্থ হয়ে উঠলে একদিন স্বাধীন তাকে হরিনারায়ণের কথা জিগ্যেস করে। শফি একটু হেসে বলে, তিনি একটি কঙ্কাল। স্বাধীন বলে, দেখেছিলে? শফি বলে, বটগাছের ঝুরিতে আটকে ছিলেন। টেনে গাছে তুলতে গিয়ে বুঝলাম তিনি জড়পদার্থমাত্র। খুকু, ওই বটগাছের তলায় একরাত্রে আমি, হরিবাবু, কালীমোহন, সত্যচরণ—

স্বাধীন দ্রুত সরে যায় তার কাছ থেকে। সে বছর মাঘোৎসব হয় নি। দেবনারায়ণবাবু কলকাতা চলে যান। তারপর থেকে মাঝে-মাঝে আসতেন। খাজনা আদায়ের চেষ্টা করতেন। একা হৃদয়নাথ শাস্ত্রী আশ্রম চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতেন। শফি তার মাসিক বেতন নিয়মিত পেত, এটা আশ্চর্য বটে! একদিন সুনয়নী ব্যস্তভাবে এসে শফিকে ডেকে চুপি-চুপি বলেন, খুকুর কী হয়েছে, তুমি জানো? শফি বলে, না তো! কী হয়েছে মাসিমা? সুনয়নী কান্না-জড়িত স্বরে বলেন, তুমি এসে দেখে যাও। সুনয়নীর কুটিরে গিয়ে শফি দেখে, স্বাধীন শাদা থান পরে দাঁড়িয়ে আছে। শফী বলে, এ কী খুকু! স্বাধীন নির্লজ্জ মুখে নির্দ্বিধায় বলে, আমি বিধবা হয়েছি। সুনয়নী তার গালে চড় মারেন। তবু বৃক্ষবৎ ঋজু ও স্থির সেই যুবতী অকপট বলে, আমার স্বামী বানের জলে ভেসে গেছেন। আমি বিধবা হব না কেন? শফি বলে, খুকু! তুমি বলেছিলে তোমার হৃদয়ে— স্বাধীনবালা তাকে বাধা দিয়ে বলে, প্রেম এবং বিবাহ সম্পর্কহীন। সেই রাত্রে সুনয়নী কন্যাকে ত্যাগ করে চলে যান। কথিত আছে, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদিগের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। এরপর বৈশাখ মাসের এক দুপুরে হৃদয়নাথ শাস্ত্রী ডাকঘর থেকে ফিরে ভীতমুখে বলেন, কাণ্ড দেখো শফি! দেববাবু দুধ দিয়ে সাপিনী পুষেছিলেন, দেখ। 'জেলা সমাচার' পত্রিকায় বড়ো-বড়ো হরফে খবর: 'পুনরায় কালেক্টর বাহাদুরের উপর আক্রমণ / পিস্তলসহ যুবতী ধৃত।' শফি তাকিয়ে আছে দেখে শাস্ত্রীজি চাপা স্বরে বলেন, পড়ে দেখো পুরোটা! স্বাধীনবালার কীর্তি দেখো। শফি, প্রত্যাঘাত আসিতেছে। আশ্রমের পবিত্রভূমি কলুষিত হইবে। আমি বৃদ্ধ। কিন্তু তুমি যুবক। শীঘ্র পলাইয়া যাও। শফি সন্দেহবশে দ্রুত ঘরে ঢোকে এবং তার পিস্তলটি খোঁজে। নাই। নির্বোধ খুকু জানে না, পিস্তলটিতে দুইবার ঘোড়া না টানিলে গুলি ছোটে না। শাস্ত্রীজী উত্তেজিতভাবে বলেন, কী করিতেছ? পালাও। নরক আসিতেছে।···

(ক্রমশ

লিপিপ্রমাদ ও শুদ্ধিবিভ্রম

জ্যোতি ভট্টাচার্য

ছাপা বইয়ে অনেক সময়ে মুদ্রাকরপ্রমাদ ঘটে, এবং সতর্ক লেখক বা সম্পাদক কখনো-কখনো শুদ্ধিপত্র যোগ করে সেই মুদ্রাকরপ্রমাদ সংশোধন করেন। হাতে-লেখা পুঁথিতে কখনো কখনো লিপিকরপ্রমাদ দেখা যায়। বিবেচক পণ্ডিতরা সেই ভ্রম সংশোধন করার প্রচেষ্টা করেন, প্রমাদদুষ্ট পাঠের পরিবর্তে শুদ্ধ-পাঠ প্রস্তাব করেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রস্তাব সঠিক হয়, তা নিয়ে আর তর্ক ওঠে না। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে লিপিপ্রমাদ এত গুরুতর যে মূল শুদ্ধপাঠে কী ছিল তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না, শুদ্ধ-পাঠ একান্তই অনুমান-নির্ভর, সেখানে কখনো-কখনো নানা বিতর্ক উপস্থিত হয়। কখনো-কখনো পণ্ডিতরা কেউ-কেউ একটি ভ্রম সংশোধন করতে গিয়ে নতুন আরেকটি বা কয়েকটি ভ্রম যোজনা করে বসেন। আবার, কখনো-কখনো, লিপিকর যেখানে নিরপরাধ, কোনো লিপিপ্রমাদ ঘটে নি, সেখানেও কোনো-কোনো পণ্ডিত লিপিপ্রমাদ অনুমান করে কল্পিত 'শুদ্ধপাঠ' প্রস্তাব করে বসেন, এবং বিভ্রম ঘটান। এইরকম একটি 'শুদ্ধিবিভ্রম' আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য। সেই আলোচনার মুখবন্ধ হিসেবে একটি গল্প পরিবেশন করতে চাই।

এক ॥ ধম্মপদ

মূলসর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিনয়পিটকে এবং অশোকাবদান গ্রন্থে এই চমৎকার গল্পটি আছে। সংস্কৃত এবং পালি ভাষার গ্রন্থে গল্পটি পাওয়া যায় না, চীনা এবং তিব্বতী অনুবাদ থেকে এটি সংগৃহীত হয়েছে।[১] গল্পটি নিম্নরূপ—

বুদ্ধশিষ্য আনন্দ তাঁর শেষ বয়সে একদিন শুনতে পেলেন এক নবীন ভিক্ষু ধম্মপদের একটি শ্লোক আবৃত্তি করছেন এইভাবে—

> যো চ বস্‌স সতম্ জীবে অপস্‌সম্ উদক-বকম্।
> একাহম্ জীবিতম্ সেয়্যো পস্‌সতো উদক-বকম্॥

এই অচিন্ত্যপূর্ব শ্লোকের অর্থ করতে গেলে দাঁড়ায়—

> জলের বক না দেখে একশত বৎসর বেঁচে থাকার চেয়ে জলের বক দেখে একদিন মাত্র বেঁচে থাকা শ্রেয়।

এই বিচিত্র শ্লোকের আবৃত্তি শুনে বিচলিত উদ্বিগ্ন আনন্দ ভিক্ষুটিকে বললেন,—হে বৎস, তুমি যা বলছ বুদ্ধ তা বলেন নি; বুদ্ধ যা বলেছিলেন তা হল—

> যো চ বস্‌স সতম্ জীবে অপস্‌সম্ উদয়ব্যয়ম্।
> একাহম্ জীবিতম্ সেয়্যো পস্‌সতো উদয়ব্যয়ম্॥

অর্থাৎ,—

> উদ্ভব (উদয়) ও বিনাশের (ব্যয়) তত্ত্বজ্ঞানহীন শতবর্ষ আয়ুর চেয়ে ওই তত্ত্বজ্ঞানসহ একটিমাত্র দিনের আয়ুও শ্রেয়।

ভিক্ষু শীলভদ্রের বঙ্গানুবাদে—'আদি ও অন্তের দর্শনহীন শতবর্ষব্যাপী জীবন অপেক্ষা আদ্যন্তদর্শী একাহব্যাপী জীবন শ্রেষ্ঠ।'[২]

অতঃপর ওই নবীন ভিক্ষুটি যে উপাধ্যায়ের কাছে শ্লোকটি শিক্ষা করেছিলেন তাঁর সমীপে গিয়ে বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য তথা প্রিয়শিষ্য আনন্দের শুদ্ধিকরণ-প্রচেষ্টার কথা নিবেদন করলেন। উপাধ্যায় বললেন, —আনন্দ অতিবার্ধক্যগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁর বুদ্ধিলোপ ঘটেছে; আমি তোমাকে যেরকম বলেছি তুমি সেই-রকমই আবৃত্তি করবে; 'উদয়ব্যয়ম্' নয়, তুমি 'উদকবকম্'ই বলবে।

পরের দিন প্রভাতে আনন্দ আবার সেই 'উদকবকম্' আবৃত্তি শুনতে পেলেন, এবং জ্ঞানী আনন্দ বুঝতে পারলেন যে শুদ্ধপাঠ শিক্ষাদানে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ এবং অলীক আশায় ভ্রান্ত, তাঁর কথা কেউ শুনবে না। আর, তাঁর চেয়ে প্রবীণ এবং মান্য যাঁদের কাছে বিচারের জন্য তিনি এ প্রসঙ্গ নিবেদন করতে পারতেন, তাঁরা কেউই আর নেই, সকলেই নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন। বুদ্ধবাণীকে রক্ষা করা তাঁর আর সাধ্য নয় বুঝে আনন্দ স্থির করলেন যে তাঁর নিজের নির্বাণলাভে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, এবার তাঁর চলে যাওয়া উচিত।

মূলসর্বাস্তিবাদীরা এই গল্পটি রচনা করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধমতাবলম্বী কোনো বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার জন্য। বুদ্ধবাণী সম্বন্ধে ওই সম্প্রদায়ের জ্ঞান 'উদকবকম্' ধরনের, এই ছিল এঁদের বক্তব্য। বিদ্রূপটি মর্মভেদী। অপর সম্প্রদায়ের পাঠভ্রান্তি সম্বন্ধে এই বিদ্রূপাত্মক গল্প নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত।

কিন্তু অতিরঞ্জিত বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও গল্পটির মধ্যে এইটুকু সত্য আছে যে বুদ্ধবাণী কোথাও-কোথাও বিকৃত হয়েছিল, এবং 'ধম্মপদ' গ্রন্থের কোনো-কোনো পাণ্ডুলিপিতে 'উদয়ব্যয়ম্' শব্দটির স্থলে 'উদকবকম্' লেখা হয়েছিল। সিন্‌কিয়াঙ প্রদেশের খোটান অঞ্চলে ১৮৯০-এর দশকে খরোষ্ঠী-লিপিতে গান্ধার-প্রাকৃত ভাষায় লিখিত ধম্মপদের পাণ্ডুলিপির যে অংশগুলি পাওয়া গেছে তার একটিতে এই শ্লোকটির প্রথম পঙ্‌ক্তির রূপ হল—

> য জি বস সদো জিবি অপশ্‌হ্ উদকবয়।

'উদয়ব্যয়ম্' এখানে 'উদকবয়' হয়েছিল। সম্ভবত পরবর্তী কোনো পণ্ডিত লিপিকর 'উদকবয়' শব্দটিকে অর্থহীন এবং লিপিপ্রমাদ বিবেচনা করে সাব্যস্ত করেছিলেন যে এই স্থলে শুদ্ধ পাঠ হবে 'উদকবক'। একটি প্রমাদ আরেকটি প্রমাদের জন্ম দিল, নিজেও বহাল রইল। এরকম শুদ্ধিকরণের ফলে একটি শব্দ অর্থবহ হয়ে উঠলেও গোটা শ্লোকটির অর্থ কী দাঁড়াল পণ্ডিত লিপিকর সে বিষয়ে আর বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নি। ধম্মপদের কোনো-কোনো অনুবাদের মূলে যে পালি বা প্রাকৃত বা সংস্কৃত পাণ্ডু-লিপিটি ছিল বলে অনুমান করা যায়, তাতে 'উদকবকম্' ছিল বলেই মনে হয়, কারণ অনুবাদে 'জলের বক' দেখা যায়।

মূলসর্বাস্তিবাদীদের এই গল্পের তিব্বতী সংস্করণে বিদ্রূপভাজন সম্প্রদায়ের লিপিপ্রমাদ-প্রসূত পাঠ-ভ্রান্তি এবং অটল নির্বোধ আবৃত্তিকে আরো এক ধাপ চড়ানো হয়েছিল,—'অপস্‌সম্' হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'অবস্‌সম্', এবং আনন্দ নবীন ভিক্ষুটিকে আবৃত্তি করতে শুনেছিলেন,—

যো চ বস্‌স শতম্ জীবে অবস্‌সম্ উদকে বক।
অর্থাৎ কিনা,

যে শতবর্ষ জীবিত থাকে সে অবশ্যই জলে বকের মতো। তিব্বতী অনুবাদে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটির চেহারাও অত্যদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'একাহম্' ('এক'+'অহম্'=এক দিন) শব্দটির 'অহম্' অংশের অনুবাদে 'দিবস' না ক'রে করা হয়েছিল 'আমি', এবং 'একাহম্' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছিল 'একা আমি'='একাকী'। তারপর গোটা শ্লোকটার অনুবাদ করা হয়েছিল,—

> শতবর্ষ জীবিত থাকা অবশ্যই জলে বকের মতো। কিন্তু নিঃসঙ্গ একাকী জীবনই সুখ, জলে বক দেখার মতো সুখ।

কী যে এর মানে, জলে বক দেখতে পাওয়ায় কী যে পরম সুখ, জলে বকের মতো হলে কী হয়, আর শ্লোকের প্রথম চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের সম্বন্ধই বা কী, তা কারু বোধগম্য ছিল না, তথাপি, ধর্মতত্ত্ব গুহানিহিত নিগূঢ় এবং প্রশ্নাতীত বিধায় এই শ্লোক হয়তো কেউ-কেউ সত্যই আবৃত্তি করত।

বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের এই বিকট ভ্রান্তির উদ্ভব এবং বিস্তার কী করে হয়েছিল সে বিষয়ে মূলসর্বাস্তিবাদীদের রচিত গল্পটিতে কিছু পাওয়া যায় না। এ-যুগের গবেষক-পণ্ডিতরাই অনুমান করছেন যে প্রথমে একটি পাণ্ডুলিপিতে লিপিকর অনবধানতাবশে 'উদয়-ব্যয়ম্' স্থলে 'উদকবয়ম্' লিখেছিলেন—দুটি হরফের হেরফের। এটি প্রথম প্রমাদ,—ভ্রান্তির উদ্ভব। পরবর্তী স্তরে যিনি লিপিপ্রমাদ সংশোধন করতে গেলেন, তিনি ভ্রম যে কোথায় তা নির্ণয় করতেই ভুল করলেন, এবং 'উদয়' স্থলে 'উদক' রক্ষা করে 'বয়ম্' স্থলে 'বকম' পাঠ আদেশ করলেন। ভ্রান্তির বিস্তার ঘটল, শুদ্ধিবিভ্রমের উদয় হল। কল্পিত প্রমাদের শুদ্ধির প্রস্তাব বিপর্যয় ঘটাল।

প্রাচীন লিপিকররা ভুল করতেন। কিন্তু তাঁরা সর্বদাই ভুল করতেন না, এবং আধুনিক কালে আমরা কখনো-কখনো ভুল করি। পাণ্ডুলিপিতে, হাতে-লেখা পুঁথিতে, (ছাপানো বইয়েও) প্রদত্ত পাঠের সংশোধন প্রস্তাব করার আগে সতর্ক হওয়া উচিত। যে পাঠ প্রথম দৃষ্টিতে মনোমত হয় না, অথবা দুর্বোধ্য মনে হয়, সেটিকে তৎক্ষণাৎ লিপিপ্রমাদ বলে ঘোষণা করে দিয়ে আনুমানিক 'শুদ্ধপাঠ' প্রস্তাব করতে থাকলে কখনো-কখনো গুরুতর বিভ্রম সৃষ্টি হয়। শুদ্ধিবিভ্রম বোধ হয় লিপিপ্রমাদের চেয়ে গুরুতর। প্রাচীন লিপি পাঠের সময় যে সতর্কতা প্রয়োজন সেকথা সর্বজনস্বীকৃত। তথাপি, মুনিদেরও মতিভ্রম হয়।

দুই ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থটি বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল। গ্রন্থটি (অথবা, কিছু নির্বাচিত অংশ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এ গ্রন্থের হাতে-লেখা পুঁথি প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মুদ্রিতগ্রন্থাকারে এটি প্রকাশ করেন। মদনমোহন কুমারের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৮০ বঙ্গাব্দে এ গ্রন্থের নবম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।

এই গ্রন্থের পুঁথিতে কয়েকটি লিপিপ্রমাদ নিয়ে পুঁথি-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা এবং কাব্যবিচারকরা আলোচনা-বিবেচনা করেছেন। অন্তত একটি পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকে ভ্রান্ত বিচার করেছেন। ওই পঙ্‌ক্তিটিকে তাঁরা লিপিকরপ্রমাদদুষ্ট সাব্যস্ত করে একাধিক সংশোধিত পাঠ প্রস্তাব করেছেন। ওই পঙ্‌ক্তিটি প্রমাদশূন্য।

পঙ্‌ক্তিটি "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থের দানখণ্ডে 'আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো' গীতটির তৃতীয় পঙ্‌ক্তি। পুঁথির মুদ্রিত সংস্করণে গীতটির প্রথম ছয় পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ :

> আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
> কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডাইবোঁ মো॥
> কানড়া খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন।

> যা দেখিআঁ কাহ্নাঞি করন্তি যতন॥
> কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
> আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥…[৩]

তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি সম্বন্ধে মদনমোহন কুমারের পাদটীকা

> "পুঁথিতে 'কানড়ি খোঁপা'। 'কাড়ড়ি', 'ড়'র উপর তোলাপাঠে 'ন'। ৪র্থ সং-এ 'শ্রীফল যোড়' পাঠ।"

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথমে 'কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি', আবার তৃতীয় পঙ্‌ক্তিরও প্রথমে হুবহু একই জায়গায় 'কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি' দেখে পণ্ডিতরা স্থির করেছিলেন তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'কানড়ী খোঁপা' শব্দদুটি লিপিকরপ্রমাদ। 'বড়ায়ি' শব্দটি পরপর তিনটি পঙ্‌ক্তিতে একই জায়গায় আছে, তা দেখে এঁরা কোনো অসুবিধে বোধ করেন নি, কারণ ওই 'বড়ায়ি' শব্দটি সম্বোধনে পঙ্‌ক্তিমধ্যে ব্যবহৃত হওয়ার আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু 'কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন' বাক্যটি এঁদের কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল, 'কানড়ী খোঁপা' শব্দ দুটিকেই এঁরা এখানে অপ্রযুক্ত বিবেচনা করে ওই শব্দদুটিকে লিপিকরপ্রমাদপ্রসূত বলে সিদ্ধান্ত করেন। তারপর এই পাঁচটি হরফের জায়গায় 'শুদ্ধপাঠ' প্রস্তাব করা হয় পাঁচ হরফের অন্য দুটি শব্দ—"শ্রীফল যোড়"। এ বিষয়ে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত "বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকায় যা লিখেছেন সেটুকু উল্লেখ করলেই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে :—

> বসন্তরঞ্জন আদর্শ পাঠ স্থির করিয়াছেন 'শ্রীফল যোড় বড়ায়ি মোর দুই তন'। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠবিচার' প্রবন্ধে জানাইয়াছেন, "দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রথম পংক্তির" [তৃতীয় পংক্তিতে দ্বিতীয় পংক্তির] "'কানড়ী খোঁপা' লিপিকরপ্রমাদে পুনর্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় 'শ্রীফল সম' এইরূপ পাঁচ অক্ষরযুক্ত কোন পাঠ ছিল।" আমাদের [অমিত্রসূদন-এর] প্রস্তাবিত পাঠ 'শ্রীফল সদৃশ বড়ায়ি মোর দুই তন'। বসন্তরঞ্জনের প্রস্তাবিত 'শ্রীফল যোড়' পাঠ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সমর্থন করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন, "পয়োধরের উপমা হিসাবে শ্রীফলের উপরেই কবির পক্ষপাত বেশী। বসন্তবাবু সেটা লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ 'শ্রীফল' বসাইয়াছেন। ভালই হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু 'যোড়' বসাইলেন কেন, 'যোড়'-এর স্থানে আর কিছু বসাইলেন না কেন?…ইহার জায়গায় যদি করি 'শ্রীফল যুগল বড়ায়ি মোর দুই তন' তাহা হইলে ছন্দ নির্দোষ হয় এবং আমরা কবির অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারি।"[৪]

আমার বিনীত নিবেদন—এরকম করলে আমরা 'কবির নিকটবর্তী' হতে পারি না, অনেক দূরে সরে যাই। লিপিকর এখানে ঠিকই লিখেছিলেন, তারপর এতগুলি খ্যাতনামা পণ্ডিত অকারণে একটা অনর্থ বাধিয়েছেন। এঁদের বিবেচনায় দ্বিতীয় আর তৃতীয় পঙ্‌ক্তি হবে—

> কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডাইবোঁ মো॥
> শ্রীফল সদৃশ বড়ায়ি মোর দুই তন।

'শ্রীফল' সম্বন্ধে এঁরা সকলেই একমত, এঁদের মধ্যে সামান্য মতভেদ হচ্ছে তার পরের শব্দটি নিয়ে, 'যোড়', না 'সম', না 'যুগল', না 'সদৃশ' তাই নিয়ে।

আমার নিবেদন, পঙক্তি দুটি লিপিকর যেমন লিখেছিলেন তেমনি থাকবে—

> কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডাইবোঁ মো॥
> কানড়া খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন।

আমরা যে ছয়টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছি তার সব কয়টি মিলিয়ে একটি কথা। রাধিকা বলছেন,—"নাপিত ডেকে আনো, আমার 'কানড়ী খোঁপা' মুড়িয়ে ফেলব; 'কানড়ী খোঁপা' মানে 'মোর দুই তন'; কানড়ী খোঁপার সদৃশ আমার দুই স্তন আমার যন্ত্রণার কারণ হয়েছে, এই দেখেই 'কাহ্নাঞি করন্তি যতন'; হরিণীর আপন মাংসই হরিণীর শত্রু, সেই মাংসের জন্যই মানুষ বা অন্য হিংস্র পশু তার প্রাণনাশ করে, সমস্ত জগৎ তার শত্রুতা করে; নারীর আপন শরীরও তেমনি নারীর শত্রু; আমার স্তনযুগলই

আমার শত্রু ; আমি এই স্তন ছেদ করে ফেলব।"

রাধিকা নিজের কেশমুণ্ডনের কথা বলছেন না, স্তনকর্তনের কথা বলছেন। প্রথম শ্লোকের ['আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো / কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডাইবোঁ মো'] বাচ্যার্থ কবরীমুণ্ডনের ইচ্ছাপ্রকাশ। কিন্তু বাচ্যার্থ এখানে অভিপ্রেত অর্থ নয়, এখানে 'কানড়ী খোঁপা'-র ব্যঙ্গার্থ 'মোর দুই তন'। সেই ব্যঙ্গার্থ প্রথম শ্লোকে প্রতীয়মান নয়, ব্যঙ্গার্থ প্রতীয়মান করা হয়েছে দ্বিতীয় শ্লোকে ['কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন / যা দেখিআঁ কাহ্নাঞি করন্তি যতন']। 'কানড়ী খোঁপা' স্তনের উপমা।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থটির পাঠবিচার পাঠবিভ্রাট ও অন্যান্য দু-একটি বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য বিশেষজ্ঞের আলোচনা পাওয়া যায় তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-শীর্ষক পুস্তিকাটিতে। তারাপদবাবু আমাদের আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটিকে লিপিকরপ্রমাদদুষ্ট বলে রায় দিতে সম্মত হন নি, তাঁর বিচারে পঙ্‌ক্তিটি প্রমাদশূন্য। পুঁথিতে দেখা যায় এই পঙ্‌ক্তিটির লিপিকর প্রথমে একটি ভুল করেছিলেন, 'কানড়ি' স্থলে তিনি 'কাড়ড়ি' লিখেছিলেন। তারপরে হয় লিপিকর নিজেই নতুবা কোনো সংশোধক তোলাপাঠে 'ড়' স্থলে 'ন' পাঠের নির্দেশ দিয়ে 'কানড়ি' শব্দটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারাপদবাবুর প্রধান যুক্তি : লিপিকর বা সংশোধক এই পঙ্‌ক্তিটি দ্বিতীয়বার দেখেও শুধু একটি হ্রস্বক বদ্‌লালেন, 'কানড়ি খোঁপা পাঠই বহাল রাখলেন, অতএব আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারি যে 'কা-ন-ড়ি খোঁপা' পাঠে "সংশোধকের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না", এবং "এ-পাঠ তিনি সঙ্গত এবং যথার্থ মনে করেছিলেন।" তারাপদবাবু ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলেছেন—

> লিপিকর যে-পাঠ নির্ভুল মনে করে লিখেছেন, সংশোধক যে-পাঠ অনুমোদন করেছেন সেই মূলপাঠ বিশেষ প্রবল কোনো যুক্তি না থাকলে পরিবর্তন করা অসঙ্গত। এখানে প্রবল বা দুর্বল কোনো যুক্তিই নেই।[৫]

এই পর্যন্ত তারাপদবাবুর কথাগুলি আমার বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু এর পরেই তিনি আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের ঘোর সংশয়ে ফেলে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

> পাঠ-পরিবর্তনের সপক্ষে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁরা ধরেই নিয়েছেন—'কানড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন' এখানে 'কানড়ি খোঁপা' 'তন'-এর বিশেষণ। 'তন' কি রকম দেখতে? 'কানড়ি খোঁপা'র মতো। 'কানড়ি খোঁপা'র মতো তন সত্যই অসঙ্গত। সুতরাং লিপিকর অবশ্যই ভুল করে দু-বার 'কানড়ি খোঁপা' লিখেছেন—এই অনুমান অপরিহার্য।' কিন্তু 'কানড়ি খোঁপা'কে 'তন'-এর বিশেষণ বা বর্ণনা বলে ধরব কেন? 'কানড়ি খোঁপা' [এবং / ও / আর] 'দুষ্ট তন' এই দুটি বস্তু দেখে কৃষ্ণ 'করন্তি যতন' এ-অর্থ কি অসঙ্গত?[৬]

পাঠপরিবর্তনের সপক্ষে যাঁরা বলেছেন তাঁরা কেউই এত স্পষ্ট করে বলেন নি যে "'কানড়ি খোঁপা' 'তন'-এর বিশেষণ" হিসেবে "অসঙ্গত" বিবেচনা করেই তাঁরা পাঠপরিবর্তন প্রস্তাব করেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা যে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে কিছু বিবেচনা করেছিলেন তা মনে হয় না। পাঠপরিবর্তনের কথা প্রথম তোলেন শহীদুল্লাহ্ সাহেব। তাঁর প্রবন্ধে এই পঙ্‌ক্তিটি সম্বন্ধে দুটি মাত্র বাক্য আছে, সে-দুটি অমিত্রসূদন উদ্ধৃত করেছেন। বসন্তরঞ্জন ৪র্থ সংস্করণে পাঠপরিবর্তন কেন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করেন নি —শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্যই তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে এ বিষয়ে যেটুকু আছে তারাপদবাবু উদ্ধৃত করেছেন,—স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে দ্বিতীয় ছত্রে যে 'কানড়ী খোঁপা লেখা হইয়াছিল তাহারই স্মৃতি-প্রভাবে অস্থানে উহা দ্বিতীয়বার লিখিত হইয়াছে।' বিজনবিহারী এর বেশি কিছু বলা দরকার মনে করেন নি, সরাসরি পরিবর্তিত পাঠ কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে চলে গেছেন।

তবে 'কানড়ী খোঁপা'-র স্থলে এঁরা যেসব অন্য পাঠ প্রস্তাব করেছেন তা থেকে এঁরা এই স্থলে একটি উপমা প্রয়োজন মনে করে স্তন-এর উপমা হিসেবে 'কানড়ী খোঁপা' অগ্রাহ্য করে "শ্রীফল যোড় / যুগল / সদৃশ" প্রস্তাব করেছেন, এ যুক্তিপরম্পরা অন্যায় নয়। কিন্তু আমার অনুমান, এঁরা কেউই অতটা ভেবে দেখেন নি। "কানড়ী খোঁপার মতো 'তন' অসঙ্গত" —এ উক্তি একমাত্র তারাপদবাবুই করেছেন, একমাত্র তিনিই এ বিষয়ে মনোযোগসহকারে বিবেচনা করেছেন।

সেইজন্যই গভীর অস্বস্তি বোধ করি যখন দেখি তারাপদবাবু সুপরিচিত 'উপমা' শব্দটি পরিহার করে 'বিশেষণ বা বর্ণনা' বলছেন। 'উপমা' শব্দটি তিনি যে কেন অব্যবহার্য মনে করলেন তা দুর্বোধ্য। উপমা নিশ্চয়ই একধরনের বর্ণনা, এবং খানিকটা বিশেষণ-এর কাজও করে। কিন্তু উপমা অন্য যে-কোনো 'বিশেষণ' বা 'বর্ণনা'র মতো নয়, উপমার একটি নিজস্ব ক্রিয়াও থাকে। উপমা শুধু উপমেয় বস্তুরই বর্ণনা করে না, শুধু উপমেয় বস্তুকেই 'বিশেষণে বিশেষিত' করে না, উপমান-এরও 'বর্ণনা' করে, অ-সদৃশ দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত দেয়, দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাধর্ম্যের সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলে। উপমা অনেক সময় উপমান বস্তুর এ-যাবৎ অবহেলিত কোনো একটি গুণের দিকে আমাদের সচকিত অবহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহুব্যবহারসিদ্ধ উপমার এই উভয়মুখী ক্রিয়া স্তিমিত হয়ে পড়ে। প্রসিদ্ধ উপমান পাঠককে আর সেভাবে সজাগ করে তুলতে পারে না। উপমা-কে শুধুমাত্র একটি উপমেয় বস্তুর বিশেষণ বা বর্ণনা হিসেবে বিচার করা সম্যক্ বিচার নয়।

এটুকু হলতে হল, কারণ তারাপদবাবু 'উপমা' শব্দটিকে খুব সতর্কভাবেই পরিহার করেছেন। "কানড়ি খোঁপার মতো", "কানড়ি খোঁপার মতো",—দুবার লিখেও উপমা শব্দটিকে তিনি তাঁর আলোচনায় প্রবেশ করতে দেন নি। বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের যে আলোচনা তারাপদবাবু উল্লেখ করেছেন তাতে কিন্তু 'উপমা' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছিল।

অবশ্য, তারাপদবাবু 'উপমা' বা 'বিশেষণ' বা 'বর্ণনা' কোনোরূপেই 'কানড়ী খোঁপা'-কে এখানে গ্রাহ্য করতে চান না,—তাঁর মতে ওটি একটি পৃথক্ বিশেষ্যপদ, "কানড়ী খোঁপা" এবং / আর দুই স্তন এখানে পরপর উল্লেখিত মাত্র, আর কোনো ভাবেই সম্পর্কিত নয়। কারণ, তাঁর মতে "'কানড়ী খোঁপা'র মতো 'তন' সত্যই অসঙ্গত।"

এখানেই আমার প্রধান আপত্তি। স্তনের উপমা হিসেবে 'কানড়ী খোঁপা' কেন অসঙ্গত? এসব উক্তি অবশ্য তর্কের বিষয় নয়, কারণ ব্যাপারটা ন্যায়শাস্ত্র বা ব্যাকরণ বা অভিধানের ব্যাপার নয়, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও অনুভূতির ব্যাপার।

এক বিশেষ ছাঁদের কবরীর সঙ্গে যুবতীস্তনের আকারগত সাদৃশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গীতিকার কবি হয়তো চোখে দেখেছিলেন। 'কানড়ী খোঁপা' বা কর্ণাটী ছাঁদের কবরী কেমন হত তা অনুমান বা গবেষণার বিষয়,[৭] কিন্তু কোণার্কের মিথুনমূর্তিতে বা অহিচ্ছত্রার পার্বতীমূর্তিতে যে ছাঁদের কবরী দেখা যায় তাতে এই উপমা অসঙ্গত মনে হয় না, বরঞ্চ সমর্থিত হয়।

আরেক দিক থেকেও এই উপমার সপক্ষে সমর্থন মেলে। স্তনের উপমা হিসেবে 'শম্ভু' [শিবলিঙ্গ] ব্যবহারপ্রসিদ্ধ।[৮] অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই উপমা ব্যবহৃত হয়েছে —'দুই কুচ তোর রাধা শম্ভুর আকার'।[৯] অমিত্রসূদন উল্লেখ করেন নি যে কবরীর উপমা হিসেবেও 'শম্ভু' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে—'শম্ভুসম বান্ধি খোঁপা পাটোল পহ্রিআঁ', 'মাথে শম্ভুসম খোঁপা শিসতে সিন্দুর', এবং 'শম্ভুসম তোর খোম্পা / তাত দিল বেড়িআ চম্পা' দ্রষ্টব্য।[১০] স্তন এবং কবরী উভয়ই 'শম্ভুর আকার' যিনি লিখেছেন, তিনি আকার-সাদৃশ্যের কারণে স্তনের উপমা হিসেবে অন্তত একবার

কবরী উল্লেখ করলে তা 'অসঙ্গত' হয় না, বেশ ভালো হয়।

এই একটি জায়গায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গীতিকার কবি যুবতীস্তনের উপমা হিসেবে 'শ্রীফল' 'দাড়িম্ব' প্রভৃতি বহুব্যবহারজীর্ণ বিরক্তিকর শব্দ ব্যবহার না করে একটি নতুন উপমা রচনা করেছেন—'কানড়ী থোঁপা'। চারজন বিদ্বান-বিবেচক পণ্ডিত সেই নতুন উপমাটি বর্জন করে সে-জায়গায় বসাতে চাইছেন ওই অবসন্ন গতানুগতিক উপমাটিকে—'শ্রীফল'। আর, পঞ্চমজন, যিনি মনোযোগসহকারে বিবেচনা করে লিপিকরকে সমর্থন করলেন, তিনি আবার এখানে কোনোরকম উপমার অস্তিত্বই অস্বীকার করছেন, উপমাটিকে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। এর প্রতিবাদ না করে পারা যায় না।

তিন। অলঙ্কার

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নিম্নস্তরের রচনা, অভব্য স্থূল আদিরস-জর্জরিত। শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার 'লীলা' ব'লে উপ-সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় ব্যাখ্যা আরোপ করে এ রচনাকে পরিশীলিত করা যায় না। এ গ্রন্থের অনেক অংশই সভ্যসমাজে পাঠের অনুপযোগী। কিন্তু অন্য অনেক অংশে আবার এই গীতিকার কবি মানুষের চেহারা, চালচলন, কথার ভঙ্গি ইত্যাদির চিত্রণে এবং উপমায় ব্যঞ্জনায় বক্রোক্তিতে নব-অনুভূতির উজ্জীবনে সতেজ। অনেক জায়গায় তিনি প্রচল-অনুসারী, প্রথাশ্রয়ী। আবার অনেক জায়গায় তাঁর স্বকীয় মানসলোক স্বাবলম্বী। একটি নতুন উপমার উদ্ভাবনার জন্য আমাদের বিবেচ্য অংশটি মূল্যবান। কিন্তু আরো কিছু আছে, আলোচ্য পঙ্‌ক্তিগুলি অলঙ্কার বিষয়ে অনেকরকম কৌতূহল জাগায়। উপমার প্রকারভেদ হয়, এবং নিহিত উপমা একাধিক অন্য অলঙ্কারের বীজ হতে পারে।

আমরা যদি বলি 'কানড়ী থোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন' বাক্যটিতে উপমা ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলে আরেকটু এগিয়ে বলতে হয়, এটি 'লুপ্তোপমা'-র উদাহরণ; কারণ, 'মতো, মতন, যেন, হেন, সম, তুল্য, সদৃশ' ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দের একটিও এখানে নেই, এবং উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যে সাধর্ম্য বা সাধারণ ধর্ম (এক্ষেত্রে বর্তুলতা, উন্নতভাব, নিবিড়ত্ব, পীনত্ব, কোমলতা, চারুতা ইত্যাদি) তারও কোনো উল্লেখ নেই, উপমার জন্য প্রয়োজনীয় চারটি অঙ্গের দুটি এখানে লুপ্ত।

আমরা 'লুপ্তোপমা' বলেই থামব, নাকি আরো সূক্ষ্ম বিচার করতে গিয়ে 'প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা' অথবা 'রূপকাতিশয়োক্তি' কিনা সেই তর্ক সৃষ্টি করব? উপমেয় এবং উপমানের অভেদত্ব ব্যঞ্জনার কারণে এখানে 'রূপক' অলঙ্কারের আবির্ভাব ঘটেছে বলা যায় কি?

লক্ষ করতে হবে যে প্রথম শ্লোকে বাচ্যার্থ বাধিত হয় নি, 'নাপিতের পো' ডেকে এনে 'কানড়ী থোঁপা' মুণ্ডনের ইচ্ছায় কোনো অসঙ্গতি নেই। প্রথম শ্লোকে কোনো ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীয়মান নয়। দ্বিতীয় শ্লোকেই 'কানড়ী থোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন' বাক্যে প্রথম শ্লোকের 'কানড়ী থোঁপা'-র ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যক্ত হয়েছে। ব্যঙ্গ্যার্থ এভাবে ব্যক্ত হওয়ার পরেই প্রথম শ্লোকের 'কানড়ী থোঁপা' তার বাচ্যার্থ পরিহার করে উপমেয়-উপমান-এর অভেদ ব্যঞ্জনা করে 'রূপক' অলঙ্কারে পরিণত হচ্ছে।

কিন্তু এভাবে 'রূপক' অলঙ্কারে পৌঁছেও এ প্রসঙ্গের নিবৃত্তি হয় না। আলঙ্কারিকদের মতে রূপক অলঙ্কারে বিষয়ের ('কানড়ী থোঁপা') অপহ্নব (নিষেধ) না করে তার উপর বিষয়ীর ('স্তন'-এর) অভেদ আরোপিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে রাধিকা 'কানড়ী থোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন' বাক্যের দ্বারা 'কানড়ী থোঁপা'-র বাচ্যার্থ নিষেধ করছেন বলে মনে হয়। 'নাপিতের পো' ডেকে আনতে বলা সত্ত্বেও প্রথম শ্লোকের 'কানড়ী থোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডাইবোঁ মো' বাক্যে 'কানড়ী থোঁপা'-র অর্থ কানড়ী থোঁপা নয়, ওর অর্থ 'মোর দুঈ তন'। অতএব, এটিকে 'অপহ্নুতি' অলঙ্কারের উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু নঞর্থক কোনো শব্দের দ্বারা নিষেধ করা হয় নি—"কানড়ী থোঁপা নয়, কানড়ী থোঁপা বলতে আমি 'মোর দুঈ তন'-ই বুঝিয়েছি", এভাবে বলা হয় নি,—অতএব এটিকে 'গূঢ় অপহ্নুতি'র উদাহরণ বলতে হয়।

এখানে একটি তর্কের অবকাশ আছে। আমি বলেছি, প্রথম শ্লোকটিতে বাচ্যার্থ ["নাপিত ডেকে আনো, আমার কানড়ী থোঁপা আমি মুণ্ডন করিয়ে ফেলব"] বাধিত হয় নি, দ্বিতীয় শ্লোকের পরেই তার ব্যঙ্গ্যার্থ ["কানড়ী থোঁপা"="মোর দুঈ তন"] প্রতীয়মান হচ্ছে। এখানে তর্কটি হল, প্রথম শ্লোকে বাচ্যার্থ যদি বাধাগ্রস্ত না হয়ে থাকে, তাহলে ব্যঙ্গ্যার্থ সন্ধান করতে যাওয়ার কারণ কী? এরকম ব্যঙ্গ্যার্থের অনুমান অপ্রয়োজনে কষ্টকল্পনামাত্র। এর উত্তরে আমার নিবেদন,—প্রথম শ্লোকটির বাচ্যার্থ শ্লোকমধ্যে বাধিত না হলেও গীতটির অঙ্গ হিসেবে দেখলে, অন্য শ্লোকটির সঙ্গে সম্পর্কিত বাক্য হিসেবে বিচার করলে সেই বাচ্যার্থ বাধিত হয়। প্রথম শ্লোকটির বাচ্যার্থ আশ্রয় করে আমরা যদি অগ্রসর হই তাহলে দ্বিতীয় শ্লোকের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক পাই না, অথচ "কানড়ী থোঁপা"র পুনরুল্লেখে শ্লোক-দুটি পরস্পরসংযুক্ত। শহীদুল্লাহ্ সাহেব, বসন্তরঞ্জন, বিজনবিহারী এবং অমিত্রসূদন দ্বিতীয় শ্লোকে 'কানড়ী থোঁপা' বর্জন ক'রে যেসব 'সংশোধিত পাঠ' প্রস্তাব করেছেন বা গ্রহণ করেছেন, তাতে দ্বিতীয় শ্লোকটির সঙ্গে প্রথম শ্লোকটির বা পরবর্তী শ্লোকগুলিরও কোনো সম্পর্ক থাকে না, ওই শ্লোকটি একটি অসংলগ্ন বাক্যে পর্যবসিত হয়ে যায়। এর ফলে, প্রথম শ্লোকটিও কিছুটা অস্পষ্ট এবং অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, কারণ প্রথম শ্লোকে রাধিকার 'কানড়ী থোঁপা' মুণ্ডন করে ফেলার ইচ্ছা কেন হল তা আর ব্যক্ত হয় না। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে রাধিকা একের পর এক তাঁর বিভিন্ন অঙ্গসজ্জা বর্জন করার, ভেঙে ফেলার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন,—তিনি বলছেন, 'সুরঙ্গ পাটোল' আর পরিধান করবেন না, সীমন্তের সিন্দুর 'মুছিআঁ পেলাইবোঁ', বাহুর বলয় চূর্ণ করে ফেলব, 'সাতেসরী হার' 'ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ', কারণ এইসব শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট করে আমার যন্ত্রণা ঘটাচ্ছে। শেষের শ্লোকে রাধিকা বলছেন, আমার এমন ইচ্ছা হচ্ছে যে নদীর জলাবর্তে প্রবেশ করে দেহবিসর্জন করি, 'দহে পৈসী মরি'। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ বিচারকরা যা বলেছেন তাতে "শ্রীফল'-সদৃশ 'মোর দুই তন' শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট করছে বলার পর তার প্রতিবিধানের কোনো কথা গীতটিতে থাকছে না, এবং 'কানড়ী থোঁপা' শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট করে বলেই তা 'মুণ্ডাইবোঁ' একথাটিও ব্যক্ত হচ্ছে না,—ফলে প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটি শ্লোকই অসংলগ্ন উক্তি হয়ে পড়ছে।

তারাপদবাবু দ্বিতীয় শ্লোকে 'কানড়ী থোঁপা' রক্ষা করেও ব্যাকরণগত যে ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেছেন সেটির সম্বন্ধেও এই আপত্তি। তাঁর ব্যাখ্যা-অনুসারে 'কানড়ী থোঁপা' মুণ্ডনের কথা বলা হল প্রথম শ্লোকে, দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হল 'কানড়ী থোঁপা' এবং 'মোর দুই তন' শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু 'মোর দুঈ তন'-এর বর্জন বা মুণ্ডন বা ছেদন করতে হবে এমন কোনো কথা বলা হল না, ফলে এখানে 'মোর দুঈ তন'-এর উল্লেখ একেবারেই অসংলগ্ন হয়ে পড়ল।

এই অসংলগ্নতার অসুবিধা দূর করতেই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রয়োজন, ব্যঞ্জনার প্রয়োজন, এবং সে ব্যঞ্জনা এক প্রকার 'লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা'। একটি বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির অন্বয় যদি অভিধা দ্বারা নির্ণয় করা না যায়, তাহলে শব্দগুলির আভিধানিক অর্থের পরিবর্তে লাক্ষণিক অর্থের সন্ধান করতে হয়, 'লক্ষণা'র প্রয়োজন হয়,—প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে এটি প্রসিদ্ধ তত্ত্ব। কিন্তু শুধু একটি বাক্যের অন্বয় সিদ্ধ করার জন্যই নয়। পরপর উক্ত একাধিক বাক্যেরও 'অন্বয়' বা সম্পর্ক

বোধের জন্যও একরকম 'লক্ষণা'র কথা ভাবতে হয়। বিশেষত, কবিতার ক্ষেত্রে বাক্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক অনেক সময়েই অব্যক্ত থাকে; কবিতাটি একটি অখণ্ড উক্তি হলে যেসব বাক্য তার অঙ্গস্বরূপ, সেগুলি পরস্পরসম্পর্কিত ('অন্বিত') হওয়া উচিত, অসংলগ্ন বাক্যপরম্পরার দ্বারা কোনও কবিতা রচিত হতে পারে না। (যে কবিতা কৌতুক, এবং অসংলগ্নতাই যে কবিতার পরিহাসের বিষয়, তার কথা অবশ্য আলাদা।) বাক্যগুলির বাচ্যার্থ বা পৃথক পৃথক ব্যঙ্গ্যার্থও যদি সেই সম্পর্ক নির্দেশিত করতে না পারে, তাহলে একরকম 'লক্ষণা' বা 'লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা'র সাহায্যে সেই সম্পর্ক প্রত্যায়মান হতে পারে।

লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনার আরেকটি উদাহরণ আমাদের আলোচ্য গীতটির উদ্ধৃত ছয় পঙ্‌ক্তির শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে :

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥

এটি গীতটির ধ্রুবপদ, প্রত্যেক চার পঙ্‌ক্তির পর এটিকে অন্তত একবার ক'রে গাইতে হবে। এখানে খুঁটিয়ে দেখলে বলতে হয় দুটি বাক্য আছে, এবং সে দুটি বাক্য পৃথক। প্রথম চরণের বাক্যটির সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের বাক্যটির মধ্যে সংযোগ সাধন করতে পারে একটি অব্যক্ত নিহিত উপমা; 'নারীর অবস্থা হরিণীর অবস্থার মতো।' এই ব্যঙ্গ্যার্থ লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনার দান।[১১]

এই ধ্রুবপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর আগের চার পঙ্‌ক্তির অর্থব্যঞ্জনার দ্বারা, বিশেষত 'মোর দুহুঁ তন'-এর সঙ্গে হরিণীর 'আপনার মাঁস'-এর সাধর্ম্য ব্যঞ্জনার দ্বারা।

তারাপদবাবুর ব্যাখ্যা যাঁরা সমর্থন করবেন তাঁরা অবশ্য এখানে আরেকটি তর্ক তুলতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন, তারাপদবাবুর ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় শ্লোকে 'মোর দুহুঁ তন'-এর উল্লেখ অসংলগ্ন হয়ে পড়ে—অতএব ওই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়, এই যে আপত্তি আমি করেছি, সে আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি যেভাবে দেখছি সেভাবে দেখলে ৭ম-৮ম পঙ্‌ক্তিতে "আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে। / এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে॥" বাক্যটিও অসংলগ্ন বলতে হয়, কারণ অলকা-তিলকা এবং কাজল বর্জন করার বা মুছে ফেলার কথা পৃথকভাবে বলা হয় নি। তাঁরা বলতে পারেন আমি যে-ধরনের সঙ্গতি বা পরস্পরগ্রথিত বাক্যসংঘটনা অনুমান করছি "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে" তা কদাচিৎ পাওয়া যায়। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"র কবি পুঙ্খানুপুঙ্খে সতর্ক ছিলেন না। তারাপদবাবু আরেক জায়গায় লিখেছেন এ কাব্যে 'বিষয়ে সঙ্গতি নেই, বানানে সঙ্গতি নেই, শ্লোকের সঙ্গে পদের সঙ্গতি নেই, ভাষার সঙ্গতি নেই'।[১২] এতরকম অসঙ্গতির মধ্যে অকস্মাৎ এই গীতটির প্রথম ছয় পঙ্‌ক্তিতে সুসঙ্গতি না থাকাই সম্ভব।

এ তর্ক একেবারে অযৌক্তিক নয়। কিন্তু বহু স্থলে বা এই গীতেরই অন্যত্র অসঙ্গতি বা অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয় বলে এখানেও অসংলগ্নতাই গ্রাহ্য, সঙ্গতি বা বাক্যসংঘটনা অগ্রাহ্য—এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। অসংলগ্নতা তখনই মেনে নিতে আমরা বাধ্য হই যখন কোনোক্রমেই তাকে দূর করা যায় না, অথবা যখন অসংলগ্নতা এড়াতে গিয়ে কবিতার অর্থবোধে বা ব্যঞ্জনাবোধে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে হয়। আমার ধারণা, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' অন্যত্র নানা অসঙ্গতি থাকলেও এই ছয় পঙ্‌ক্তিতে সেই দোষ নেই, এবং 'কানড়ী খোঁপা'-কে 'মোর দুহুঁ তন'-এর উপমা হিসেবে গ্রহণ করলে কোনো ক্ষতি নেই, বরঞ্চ কিছুটা লাভ আছে।

এসব কথা নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে। প্রাচীন আলংকারিকরা বেশ তার্কিক ছিলেন। একটি বাক্য বা দু ছত্রের একটি শ্লোকের অলংকার নির্ণয়ব্যাপারে দীর্ঘ এবং জটিল তর্ক উঠত। এখনকার কালে আমরা এরকম তর্ক পছন্দ করি না, একটু পরেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। একটি বাক্যে অলংকার আছে, সেই অলংকার-

টির সঠিক নাম কী,—'রূপক', না 'রূপকাতিশয়োক্তি', না 'প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা', নাকি 'লুপ্তোপমা'—তা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা-ঘামানো আমাদের ভালো লাগে না। কাব্য নিয়ে আলোচনায় পণ্ডিতী তর্ক অরসিকের বিরক্তিকর আচরণ বলেই আমরা গণ্য করি। তার ওপর, অনেক ক্ষেত্রে এরকম তর্কের শেষ পর্যন্ত কোনো নিষ্পত্তি বা মীমাংসা হয় না।

তর্ক আমার উদ্দেশ্য নয়, কোনো বিশেষ অলংকার বা তার নামের প্রতি আমার কোনো আসক্তিও নেই। অলংকার নির্ণয়ে তর্ক কিন্তু আসলে শ্লোক বা বাক্যের সঠিক অর্থনির্ণয়ের তর্ক। কবিতার ভাষা প্রায়শ বক্রোক্তির ভাষা। সেই বক্রোক্তি সবসময় সকলের কাছে প্রতিভাত হয় না। যদি তা বেশি দুরধিগম্য হয়ে পড়ে, পণ্ডিতের টীকা-ভাষ্য ছাড়া দুর্বোধ্য হয়ে থাকে, তাহলে প্রসাদগুণের অভাববশত তাকে দোষদুষ্ট বলতেই হয়। কিন্তু প্রসাদগুণসম্পন্ন সহজবোধ্য বক্রোক্তিও কখনো-কখনো সকলের কাছে স্পষ্ট হয় না। খুব কাছের জিনিস অনেক সময় আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে সেরকম একটা ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করি। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর এই গীতটি মোটেই দুর্বোধ্য নয়। এখানে যেটুকু বক্রোক্তি বা 'ভঙ্গী-ভণিতি' আছে[১৩], সেরকম বক্রোক্তি যে শুধু পণ্ডিত বা বিদগ্ধ কলাকুশলী কবিরাই ব্যবহার করে থাকেন তা নয়, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে বাক্‌পটু ব্যক্তিরাও প্রায়শ ব্যবহার করেন, নিরক্ষর গ্রামবাসীর সজীব কথোপকথনেও এরকম বক্রোক্তির সাক্ষাৎ মেলে। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"র রাধিকা বিদগ্ধ নাগরিকা নন, কবি তাঁকে উদ্ভিন্ন-যৌবনা গ্রামবালিকা রূপেই দেখেছেন, তাঁর মুখে এ বক্রোক্তি ঔচিত্য লঙ্ঘন করে নি, চরিত্রের উপযোগী হয়েছে।

তাহলে আমাদের মান্য পণ্ডিতদের বিভ্রম ঘটল কেন? আমি যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁরা সকলেই মান্য পণ্ডিত। বিশেষত বসন্তরঞ্জনের পাণ্ডিত্য, সততা, নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, অন্তত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর পাঠকবর্গের মধ্যে সর্বজনবিদিত। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ও খ্যাতনামা। অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ দুটি তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা, নম্রতা এবং দক্ষতার অনেক পরিচয় দেয়। তারাপদবাবুর পুস্তিকাটি শুধু বিশেষজ্ঞের জ্ঞানই বহন করছে না, সুশৃঙ্খল চিন্তা এবং পরিমিতিবোধের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তও বটে। এঁদের কারু রসবোধের অভাব ছিল, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

তথাপি এমনটা ঘটল, কারণ,—আগেই বলেছি, খুব কাছের জিনিস অনেক সময় আমাদের নজরে আসে না।

চার॥ পদাবৃত্তি

এ পর্যন্ত আমরা যেসব অলংকার নিয়ে তর্কবিতর্ক করলাম, সেগুলি অর্থালংকার। কিন্তু অর্থালংকারই শুধু নয়, এই স্থলে পুঁথিটি লিপিকরপ্রমাদহীন বলে গ্রহণ করলে একটি শব্দালংকারেরও সাক্ষাৎ পাই। তার সাধারণ নাম 'অনুপ্রাস'। অনুপ্রাসের এক বিশেষ প্রকারের নাম 'লাটানুপ্রাস', তাতে এক বা একাধিক শব্দের পুনরুক্তি হয়। লাটানুপ্রাসের এক প্রকারকে 'পদাবৃত্তি' বলা যায়। 'যমক'-অলংকারেও পদাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু তাতে শব্দ বা পদের অর্থভেদ হয়। যমকের পদাবৃত্তিকে যমক নাম দিয়ে পৃথক রেখে আমরা এখানে এক বা একাধিক শব্দবিশিষ্ট পদের পুনর্ব্যবহারকে 'পদাবৃত্তি' বলছি।

পদাবৃত্তি সর্বজনপরিচিত অলংকার। গীতি-কবিতায় এর প্রকাশ প্রায়ই দেখা পাওয়া যায়। গানের সময় পদাবৃত্তি প্রায় অবশ্যপ্রয়োজনীয়, একটি গানের লিখিত চেহারায় পদাবৃত্তি না দেখা গেলেও এক বা একাধিক পঙ্‌ক্তি বারবার গাইতে হয়। পুরনো বাঙলা গানের লিখিত চেহারায় 'ধ্রু' চিহ্ন দিয়ে ধ্রুবপদ নির্দেশিত হত, সেটি বারংবার গাইবার কথা। কিন্তু

শুধু গীতিকাব্যে নয়, পুরনো কাহিনীকাব্যে, পাঁচালীতে, এবং অন্যত্রও পদাবৃত্তি দেখা যায়। দীর্ঘ কবিতা যদি শুধু পাঠকের চোখের জন্য লেখা না হয়ে অনেক মানুষের শোনার জন্য রচিত হয়ে থাকে, তাহলে পদাবৃত্তি কবিতার কথাটার বিভিন্ন অংশের সংযোগ-রক্ষায় সাহায্য করে। পুরনো পুঁথিতে পরপর দুটি পঙ্‌ক্তিতে একই স্থলে একটি বা একাধিক শব্দের পুনর্লিখন দেখলে তৎক্ষণাৎ সেটিকে লিপিকরপ্রমাদ বলে স্থির করে ফেলার আগে সেটা পদাবৃত্তি হতে পারে কিনা তা একবার বিবেচনা করা উচিত।

পৃথক অলংকার হিসেবে পদাবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের অলংকারশাস্ত্রে আলোচনা প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। দণ্ডিন্ "কাব্যাদর্শে" [২।১১৬-১১৮] পদাবৃত্তির উল্লেখ করেছেন একটি দৃষ্টান্তসহ; মম্মট "কাব্য-প্রকাশে" [৯।৮১-৮২] 'লাটানুপ্রাস' উল্লেখ করেছেন এবং পদাবৃত্তির দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন; বিশ্বনাথ "সাহিত্যদর্পণে" [১০।৭] দৃষ্টান্তসহ 'লাটানুপ্রাস' উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 'পদাবৃত্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন পরের কারিকার বৃত্তি-অংশে 'যমক' প্রসঙ্গে। অনুপ্রাসের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে 'লাটানুপ্রাস' একটি, এবং লাটানুপ্রাসে পদাবৃত্তি ঘটে,—এইভাবেই এঁরা দেখেছেন, পদাবৃত্তির অন্য কোনো ক্রিয়া এঁরা বিচার করেন নি। কোনো বিশদ আলোচনা আমার চোখে পড়ে নি।

অথচ পদাবৃত্তির ক্রিয়া নানারকম হয়। সংস্কৃত কবিতায় হয় কিনা সেটা অনুসন্ধানের বিষয়, কিন্তু বাঙলা কবিতায় যে নানারকম পদাবৃত্তি দেখা যায় তা সকলেই জানে, একটু খেয়াল করিয়ে দিলেই দেখা যায়। শুধুমাত্র অনুপ্রাস-রচনার বাহাদুরি দেখানোই পদাবৃত্তির কারণ না হতে পারে, কবির অন্য গূঢ় অভিপ্রায়ও থাকে, এবং অভিপ্রায় সর্বক্ষেত্রে একরকম হয় না।

কয়েকটি উদাহরণ দেখলেই কথাটা স্পষ্ট হবে :—

(১) একটি সুপরিচিত গানের উদাহরণ দিয়ে শুরু করা ভালো। রবীন্দ্রনাথের "তোমায় আমায় মিলন হবে বলে" গানটি গাইবার সময়ে প্রথম চরণটি অনেক বারই আবৃত্ত হবে। কিন্তু গাইবার সময় ছাড়াও, গানটির লিখিত রূপটি পাঠ করার সময়েও প্রথম চরণের ওই পদটি বারবার পড়তে হবে—প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ঠিক একই জায়গায়, চরণের প্রথমার্ধে এবং তৃতীয় ও অষ্টম চরণে ওই পদটি আবৃত্ত হয়েছে।

এই পদাবৃত্তি শুধু সুর আর মিল-এর জন্য রচিত হয় নি, লাটানুপ্রাসের চাতুর্য বা বাহাদুরি দেখানোর জন্যও রচিত হয় নি। 'আকাশ আলোয় ভরা', 'ধরা যুগ্ম শ্যামল', 'রাত্রি জাগে', 'উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে', এবং 'আমার পরান যুগে যুগে বধূর বেশে চলে'—এই পাঁচটি ঘটনার উদ্দেশ্য বা কারণ একটিই, 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে', সে মিলন অবশ্যম্ভাবী—এই ব্যঞ্জনা পদাবৃত্তি-দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। পদাবৃত্তির ক্রিয়া এখানে শব্দালংকারের সীমানা ছাড়িয়ে অর্থব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ।

(২) "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর বংশীখণ্ডের আক্ষেপানুরাগ গীত 'কে না বাঁশী বাএ' একটি বিখ্যাত গীত। এ গানের প্রথম দুই পঙক্তি :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি' পদটি শুধু এই দুই পঙ্‌ক্তিতেই নয়, পঞ্চম ও সপ্তম পঙ্‌ক্তিতেও দেখা যায় :

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।'
'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।'

এ পদাবৃত্তি শুধু অনুপ্রাস নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গান শোনার সময় অথবা একটু সুরেলা পাঠের সময় এখানে যে অনুপ্রাস আছে সেকথাটা তুচ্ছ হয়ে যায়, আমাদের কানে বাজে অ-দেখা বংশী-বাদকের দূরাগত বংশীধ্বনিশ্রবণে নায়িকা-হৃদয়ের পুলকমিশ্রিত আর্তি-বেদনার অনুরণন। বাঁশি বারবার

বাজছে, বারবার বেদনার মৃদু গুঞ্জন অনুরণিত হচ্ছে। পদাবৃত্তি ছাড়া এই অনুভূতি জাগানো যেত না বলেই মনে হয়।

(৩) কিন্তু সকল পদাবৃত্তিরই ক্রিয়া এরকম সূক্ষ্ম হয় না। দীন চণ্ডীদাসের একটি গীতের দ্বিতীয় শ্লোক :

'কালিয়া বরণে পরাণ পাগলি
মনে আন নাহি লয়ে।
কালিয়া বরণে করিল পাগলি
না জানি আর কি হয়ে।'

এখানে 'কালিয়া বরণে' এবং 'পাগলি' পদাবৃত্ত। কিন্তু এ পদাবৃত্তি নিতান্ত শিথিল বা অলস, এর কোনো বিশেষ ক্রিয়া নেই। এর দ্বারা হয়তো ছন্দ-রক্ষা করা গেছে, শূন্যস্থান কোনোক্রমে পূরণ করা হয়েছে, তার বেশি আর কিছু পাই না।[২৪]

(৪) শিথিল পদাবৃত্তির অনেক উদাহরণ কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে উদ্ধৃত করা যায়। অশ্বমেধ-পর্ব থেকে একটি দেখা যাক :

বৈশম্পায়ন কহে শুন জন্মেজয়
রত্নাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
রত্নাবতীপুরে রাজা শিখিধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্মিক রাজা সর্বগুণধাম॥

এখানে 'রত্নাবতীপুরে' শব্দটি বা 'রাজা' শব্দটি শিথিল-ভাবে পদাবৃত্ত।

কিন্তু কাশীরাম দাসের সপক্ষেও কিছু বলার আছে। দীর্ঘ কাহিনীকাব্যে, বিশেষত যে কাহিনী-কাব্য কয়েকদিন ধ'রে শ্রোতাদের মণ্ডলীতে পড়ে শোনানো হবে, সেরকম কাব্যে শ্রোতাদের মনো-যোগ ধরে রাখার জন্য এবং কাহিনীর সূত্র ধরে রাখার জন্য পুনরুক্তি প্রয়োজন হয়। উদ্ধৃতি অংশটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটিও একরকম পুনরুক্তি, মহাভারতকথা বৈশম্পায়ন যে জন্মেজয়কে শোনাচ্ছেন সে খবর তো আগে অনেক বারই বলা হয়েছে। তবুও এখানে এই পুনরুক্তি প্রয়োজন, কারণ শ্রোতারা ইতিমধ্যে ওই খবরটি ভুলে গিয়ে থাকতে পারেন। পদাবৃত্তি এরকম পুনরুক্তির কাজ কিছুটা সম্পন্ন করে।

কাশীরাম দাসের এই পদটি বিবেচনা করলে আমাদের খেয়াল হতে পারে যে এরকম পদাবৃত্তি শুধু কবিতায় নয়, গদ্যরচনাতে এবং সাধারণ কথা-বার্তায়ও আমরা ব্যবহার করি। "তারপরে পাণ্ডবদের ঘোড়া রত্নাবতীপুরে গিয়ে পৌঁছল। রত্নাবতীপুরে রাজার নাম শিখিধ্বজ।"—এরকম বাক্যবিন্যাস ব্যবহারসিদ্ধ।

যে গদ্য এখনকার কালে পাঠকের জন্য লেখা হয়, শোনানো যার উদ্দেশ্য নয়, সেরকম গদ্যে অবশ্য আমরা এরকম পদাবৃত্তি খুব কম ব্যবহার করি। সেখানে আমরা হয় ওই বাক্যদুটিকে জুড়ে একটি বাক্যে পরিণত করি, নতুবা সর্বনামপদ বা অব্যয় ('সেখানে', ইত্যাদি) ব্যবহার করি। এরকম উদাহরণ যদি আরো বিচার করা যায়, তাহলে ধরা পড়ে যে দ্বিপদী বা ত্রিপদী শ্লোক দিয়ে গঠিত কাহিনীকাব্যে বাক্যের আয়তন অত্যন্ত সীমিত। বহুশব্দবিশিষ্ট এবং জটিল-অন্বয়সাপেক্ষ বাক্যের অবকাশ এখানে থাকে না, প্রায় প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি একটি বাক্য বা স্পষ্ট বাক্যাংশ হতে হয়। সর্বনাম- বা অব্যয়-পদের ব্যবহারও খানিকটা নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয়, নাহলে ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। এইসব কারণেই বোধহয় এসব কাব্যে পদাবৃত্তি প্রায়ই দেখা যায়।

(৫) কাশীরাম দাসের মহাভারতে বনপর্বের একটি শ্লোক :

আপনি আপন বন্ধু, যদি রাখে ধর্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম॥

এখানে বাক্যদুটি আকার এবং আদি-পদ ['আপনি আপন'] এক রেখে দেওয়ায় "'ধর্ম' স্থলে 'কুকর্ম' হলে 'বন্ধু' স্থলে 'শত্রু' হবে" এই অর্থব্যঞ্জনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে এবং 'বন্ধু' ও 'ধর্ম' শব্দের বিপরীতে 'শত্রু' ও 'কুকর্ম' শব্দের স্থাপনা তীক্ষ্ণতর

হচ্ছে। একে ব্যঞ্জনা না বলতে পারি। কিন্তু বাগ্‌-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। পদাবৃত্তি শিথিল বলা চলবে না।

(৬) চণ্ডীদাসের একটি পদ :

বয়ানে বয়ান দিয়া কহে সে ধরিবে।
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে ॥[১৫]

এই পদাবৃত্তিও শিথিল বা অলস নয়। প্রথম চরণে উক্ত আকাঙ্ক্ষার কারণ ব্যক্ত হচ্ছে দ্বিতীয় চরণে, পুনরুক্তি আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা প্রকাশ করছে।

(৭) "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" তাম্বূলখণ্ডে একটি গীতে আছে :

আপণার মুখে মোকে দিআর আভয়।
আপণার মুখে বড়ায়ি কহঁ তো উত্তর···[১৬]

এখানে পদাবৃত্তি 'এম্‌ফাসিস'-এর বাহন। 'তখন নিজের মুখে আমাকে অভয় দিয়েছিলে, এখন নিজের মুখে উত্তর দাও তো'—এই উক্তিতে 'নিজের মুখে' ['আপণার মুখে'] শব্দদুটির পুনরুক্তিতে বিশেষ জোর পড়ে। এরকম পুনরুক্তি আমরা লৌকিক কথাবার্তায় প্রায়শ ব্যবহার করি। কবিতার ব্যাকরণ লৌকিক ভাষার ব্যাকরণ নয়, বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি দিয়েই কবিতাকে কবিতা বলে চেনা যায়। কিন্তু কবিতার ভাষা লৌকিক ভাষা থেকে বেশি দূরে যাওয়া উচিত নয়, আর লৌকিক ভাষা একেবারে বাগ্‌ভঙ্গি-বৈশিষ্ট্য-বিবর্জিতও হয় না।

(৮) আমাদের আলোচ্য গীতটিতে 'কানড়ী খোঁপা' পদাবৃত্ত। সে পদাবৃত্তির ক্রিয়া একটি উপমার ব্যঞ্জনা, এবং ছয়টি পঙ্‌ক্তির মধ্যে সংযোগসাধন। 'বড়ায়ি' শব্দটিও ওই গীতে অনেকবার পদাবৃত্ত। এ শব্দটি অন্য কয়েকটি গীতেও বারবার দেখা যায়। এ শব্দটি সম্বোধনসূচক, এবং গীতটি কার উদ্দেশ্যে কার কথা তা এই শব্দটি শ্রোতাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। গানগুলি যে শ্রাব্য নাট্যগীতি, একধরনের সংলাপ, সেই কথাটি শ্রোতাদের মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য এরকম পদাবৃত্তি প্রয়োজন হতে পারে। 'কাহ্নাঞি'' এবং 'রাধা' শব্দদুটিও এভাবে বহুবার পদাবৃত্ত হতে দেখা যায়।

পদাবৃত্তি সম্বন্ধে বাঙলায় আরো বিশদ আলোচনার অবকাশ এবং প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থনির্দেশ ও পাদটীকা

১. মূলসর্বাস্তিবাদীদের গল্পটি ও আনুষঙ্গিক তথ্যগুলির জন্য দ্রষ্টব্য—*The Gandhari Dhammapada*, Ed. John Brough, Oxford University Press, 1962, pp. 45-47.

২. 'ধম্মপদ', মহাবোধি সোসাইটি, ১১৩ সংখ্যক শ্লোক, পৃ. ৩০

৩. মদনমোহন কুমার সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন", ৯ম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ. ৩৫

৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত "বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন", পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৮-৯ ; ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌-র প্রবন্ধ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠবিচার", সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৪৮, পৃ. ২০৩ ; বসন্তরঞ্জনের গৃহীত পাঠ দেখা যায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর ৪র্থ সংস্করণে।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ দুটির জন্য দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, সংখ্যা ১ এবং ২, (শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭০) পৃ. ৫৪-৫ এবং ১২০-১৩১। আমাদের আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি সম্বন্ধে পৃ. ১২১-১২৬ দ্রষ্টব্য।

৫. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন", মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৮, পৃ. ৫৩

৬. তদেব

৭. 'কানড়া'/'কানড়া'/'কানাড়া' ছাঁদে কবরীবন্ধনের উল্লেখ বৈষ্ণবপদাবলীতে আরো পাওয়া যায় : 'কবরী কানাড়া ছান্দে / মুকুতার ঝুরি বান্ধে চম্পক কুসুম তায় দোলে'—যদুনাথ দাস ; 'টানিয়া কানড়া বান্ধ খোঁপা' —জ্ঞানদাস ; 'ধনি কানড় ছাঁদে বাঁধে কবরী। নবমালতীমাল তহি উপরী ॥'—গোবিন্দদাস ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, ১৯৮০, পৃ. ২১৮, ৪১৯, ৬৭৮ যথাক্রমে দ্রষ্টব্য।

৮. 'কুচজুগ সম্ভু সরণ মোহি দেহ'—বিদ্যাপতি
'কনক শম্ভু এক ভেখ বিলোচন
দোসর দেখায়বি মোয়' —কবিরঞ্জন
'উন্নত উরজ কিবা কনকমহেশ' —জ্ঞানদাস
'কুচযুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে' —গোবিন্দদাস
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিস্থলে' —ভারতচন্দ্র
'কুচশম্ভু' —ভারতচন্দ্র
বৈষ্ণবপদগুলির জন্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদাবলী' গ্রন্থে যথাক্রমে পৃ. ৯১, ৩১৩, ৪১৮, ৪১৮ এবং ৬৪৫ দ্রষ্টব্য ॥ ভারতচন্দ্রের জন্য দ্রষ্টব্য 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৩য় সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃ. ১০৫ এবং ২১১

৯. অমিত্রসূদন এটি উল্লেখ করেছেন তাঁর সম্পাদকীয় ভূমিকায় (পৃ. ১২), মূল গ্রন্থের যে অংশগুলি তিনি নির্বাচন করেছেন তাতে এ পঙ্‌ক্তিটি নেই। মদনমোহন কুমারের সম্পাদিত ৯ম সংস্করণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এ পঙ্‌ক্তিটি রয়েছে ৩৫ পৃষ্ঠায়।

ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী তাঁর "চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" [টি. কে. ব্যানার্জী অ্যাণ্ড সন্‌স্, ১৩৭৩ ?] গ্রন্থের আলোচনা-অংশে (পৃ. ২৯-৩৩) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' উপমা ও রূপক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, সেখানে আমাদের আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি উল্লেখ করেন নি, এবং এই পঙ্‌ক্তির পাঠনির্ণয় সম্বন্ধেও কোনো উক্তি করেন নি।

১০. এই পঙ্‌ক্তিগুলির জন্য ৯ম সংস্করণে পৃ. ৩৫, ১৩২, ১৫০ যথাক্রমে দ্রষ্টব্য। 'শিবলিঙ্গ' / 'কবরী' উপমা আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা জানি না, আমার চোখে পড়ে নি।

১১. 'লক্ষণা' ও 'লক্ষণামূলাব্যঞ্জনা' বিষয়ে কৌতূহলী পাঠক যদি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থগুলি না দেখতে চান, তাহলে (১) অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, "কাব্যালোক", এ মুখার্জী, ৫ম সংস্করণ, ১৩৮৬, পৃ. ২৪২-৫ এবং (২) অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী, "অলঙ্কারচন্দ্রিকা", ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, ১৩৮৮, পৃ. ২৪৯-১, ২৬৯-৮৫ দেখতে পারেন।

১২. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃ. ৮৫

১৩. অলংকারাচার্য কুন্তক যে অর্থে 'বক্রোক্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আমি সেই অর্থেই ব্যবহার করছি। 'ভঙ্গী-ভণিতি' এবং 'বিচিত্তি' শব্দদুটিও কুন্তকের। এখানে শ্লেষ-বক্রোক্তি নামে পরিচিত অলংকার-বিশেষের কথা হচ্ছে না, এবং যেরকম 'বাঁকা কথা শুনলে গা জ্বলে যায়' সেরকম 'বাঁকা কথা'-র কথাও হচ্ছে না। কুন্তক বলেছিলেন বক্রোক্তি হচ্ছে কাব্যের প্রাণস্বরূপ। সে বক্রোক্তি 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি' এবং 'বিচিত্তি'। আমি 'বৈদগ্ধ্য' শব্দটি এড়িয়ে গেছি কারণ বাঙলায় ও শব্দ এখনো শুধু 'পাণ্ডিত্য' বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 'বৈদগ্ধ্য' পাণ্ডিত্য ছাড়াও কৌশল, চাতুর্য ক্ষিপ্রবুদ্ধি, নৈপুণ্য প্রভৃতি বোঝায়। কুন্তক এই ব্যাপকতর অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এই অর্থে 'বৈদগ্ধ্য' শব্দের কাছাকাছি অনুবাদ হতে পারে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যালোচনায় পুনঃপুন উচ্চারিত Wit শব্দটি। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য—*The Vakrokti-Jivita*, by Rājānaka Kuntaka, ed. S. K. De, Firma K. L. Mukhopadhyaya, 3rd edn. 1961, বিশেষত p. xxvii এবং p. 22

১৪. দীন চণ্ডীদাসের পদটির জন্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' পৃ. ৭৩ দ্রষ্টব্য। মূল পদটি হয়তো ঠিক এইরকম ছিল না।

বিমানবিহারী মজুমদার-সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৭, পৃ. ১৫) প্রদত্ত শ্লোকটির রূপ :

কালিয়া কাজল নয়ানে পরিতে
মোর মনে নাহি লয়ে।
কালিয়া বরণে পরাণ পাগলি
না জানি আর কি হয়ে ॥

১৫. বিমানবিহারী মজুমদার, "চণ্ডীদাসের পদাবলী", পৃ. ২০৪

১৬. "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" ৯ম সংস্করণ, পৃ. ৭

পাঁচশো বছর

গুণময় মান্না

মধ্য-ফাল্গুনের বাতাসটি যেন একটু নেশা-জাগানো, নদীতীরের গাছপালাগুলিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে, পাতা ঝরে পড়ছে দু-একটি। খুব দূর থেকে আসা কোকিলের ডাক শোনা যায় মাঝে-মাঝে, তা যেন অনেক দূর কালেরও। সেই ডাক কানে আসছে, আর পিয়ালের তলায় দাঁড়িয়ে এক-একবার কেঁপে উঠছে মেয়েটি।

মেয়েটির দীর্ঘ তনুদেহ, রঙ আর লাবণ্য, যেন লাখবালা সোনা। সোনার-চুমকি-বসানো নীলাম্বরীর আঁচলটি মাথার থেকে একটু খসে পড়েছে পিছন দিকে, একরাশ ঘন কালো চুল এলো খোঁপায় বাঁধা। ছোট্ট একফালি চাঁদের মতো কপাল। তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিবুকটি পানের মতো টানা, লাল পুট-পুটে দুটি ঠোঁট, একটু ফুরিত; টিকলো নাকের দু-পাশে পাখির ডানার মতো দুটি চোখ, কিন্তু দৃষ্টি চকিত, একটু উদ্বিগ্ন। বুকের ওপর আঁচল দিয়ে কিছু ঢেকে, চাঁপাকলির মতো আঙুলে চেপে রেখেছে।

সহসা বুক কেঁপে উঠল—যার জন্য প্রতীক্ষা, তাকে দেখা গেল একটু দূরে ছায়াকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আহা, কী সুঠাম দেহ, ক্ষীণ কটি, মলমলের ধুতিতে আঁট করে ধটী বাঁধা, প্রশস্ত বক্ষ, উড়ানির ফাঁকে উপবীতের রেখা, উন্নত গ্রীবা, এত দূর থেকেও কমল-আঁখির আবিষ্টতা যেন অনুভব করা যায়, মাঝখানের সিঁথির দুপাশ দিয়ে ঢেউখেলানো চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে।

মেয়েটির দেহে রোমাঞ্চ দেখা দিল, বুকে চেপে-ধরা দুহাতের নীচে সুবলয় স্তন দুটি উথালপাথাল হল। কিন্তু মুহূর্তে সংযত করল নিজেকে, কামনার রাশ টানতেই মুখখানা ক্রোধে লাল হয়ে উঠল, শেষ বিকেলের আলোতে কঠিন হল ছোট্ট কপালটি। কী?—না, ওই পুরুষ, যে নাকি তারই দিকে এগিয়ে আসছে—কী ছিরি, যেন এক অভিসারিকা, ইতি-উতি দৃষ্টি, একবার পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, আবার এগোচ্ছে সাহসভরে। আরো কাছে আসতে দেখা গেল, সোনালি পাড়ের উড়ানি তুলে, যেন ঘোমটার মতো মুখখানা একটু ঢেকে, অপাঙ্গে তাকাল পাশের কদম্বতলের দিকে, সতৃষ্ণ-বিলোল দৃষ্টি।

নদীর কোল থেকে উঠে এল পুরুষটি, মেয়ের দুহাত দূর দিয়ে লজ্জা-জড়ানো পায়ে-পায়ে বাঁধের ওপর দিকে উঠতে লাগল। তবে দেখে মেয়েটির চোখে যেন আগুন ছুটল, পড়ল ঘনঘন নিশ্বাস। বোধ হয় সেই শব্দে পুরুষটি চকিতে তাকাল তার দিকে, কিন্তু নিজের আবেশেই ছিল, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'শোনো···'

নিমাইয়ের বোধ হয় বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল একটু এগিয়ে এসে বলে উঠল, 'তুমি, প্রিয়া? এখানে কেন···'

সেকথার উত্তর না দিয়ে সতেজে প্রিয়া বলল, 'তোমার লজ্জা করে না, ওসব মেয়েলি ঢং করতে ···তুমি না পুরুষ? চোখ টেরিয়ে কাকে খুঁজছিলে?'

ঠিক মেয়েদের মতোই চোখ নীচু করল নিমাই, 'কাকে আর খুঁজব, যিনি আমার প্রভু, নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ, আমি যাঁর দাসী'

'দাসী! নিজেকে ছোটো ভাবতে তোমার ঘেন্না করে না? কেন তুমি বা আর কেউ কারোর থেকে ছোটো হতে যাবে?'

নিমাইয়ের মুখ বেদনা-ভারাতুর, 'আমার প্রভু···'

'ভীতু, ভীতু···অত্যাচারী নবাব-বাদশার কাছে যেমন মেরুদণ্ডহীন প্রজা, তেমনি তুমি, তুমি পুরুষ···'

'না-না, পুরুষ তিনি অদ্বিতীয়, আর সবাই নারী। যারা একান্ত নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দেয়···'

'তাই তুমি মেয়ে হয়েছ! ওসব তোমার বুড়ো-হাবড়া আচার্যিদের বোলো, তারা তোমার চলানি দেখে তোমার পায়ে গড়াগড়ি যাবে···আর হয়েছেও তাই, তোমাকে তারা ভালোই নাচাচ্ছে···কিন্তু আমি কী করব বলতে পার? আমার বুকে কি কামনা নেই?'

'প্রিয়া, দুঃখ কোরো না, তোমার সমস্ত কামনা তুমি কৃষ্ণকে দাও, তাহলেই শান্তি পাবে···'

'আমাকে অসতী হতে বলছ? তোমার এত দূর অধোগতি হয়েছে যে পরপুরুষের কাছে নিজের স্ত্রীকে এগিয়ে দিতে তোমার কুণ্ঠা হচ্ছে না? শোনো, যদি আমি উপপতি গ্রহণ করি, সেটা নিজের ইচ্ছেয় করব, তোমার মেয়েলিতে ভুলে করব না···'

'অবুঝ হয়ো না, প্রিয়া, আমাকে নিষ্ঠুর কথা বোলো না। তিনিই সবার একমাত্র পতি, আর সবাই উপপতি···'

'মানে, তুমি আমার উপপতি? সেই তুমি··· আমি কি তোমাকে উদগ্র পিপাসায় কামনা করি নি, সেই যখন আমি বালিকা ছিলাম, তখন থেকেই? গঙ্গার ঘাটে তোমার মাকে যে রোজ নমস্কার করতাম, সে কি তাঁকে? তোমাকে দেখলেই লজ্জায় আমার পা জড়িয়ে যেত, দেহ অবশ হয়ে উঠত, তোমার কাছে আসতে পারতাম না···আমার এ দশা হবে জানলে···' বলতে-বলতে প্রিয়া ফুঁপিয়ে উঠল।

একটু পুরুষের মতো হল যেন, নিমাই পা ফেলে এগিয়ে এল একেবারে কাছে, এলোথেলো চুলের ওপর হাত রাখতে গিয়েও পিছিয়ে গেল, সংযত করল নিজেকে।

প্রিয়া চোখের জল মুছল, কিন্তু ব্যঙ্গ ঝিকিয়ে উঠল সেই চোখে, 'কী হল, ছুঁতে সাহস হল না? তাহলেই দেখো, তুমি যে নিজেকে রাধা মনে করে ঢং কর, এইমাত্র যা করতে যাচ্ছিলে, সেটা পুরুষেরই কাজ···আসলে তুমি পুরুষ, সেইটে ভুলে যাও কেন?'

'পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব অতি নিগূঢ়, তুমি বুঝবে না, প্রিয়া···'

প্রিয়ার চোখে আগুন ঝলকে উঠল, 'আমি প্রকৃতি-তত্ত্ব বুঝব না, না? সেদিন ভক্তরা তোমার অভিষেক করছিল, তার মধ্যে যুবতী ভক্তরাও ছিল···তারা যখন তোমার গাত্রমার্জনার ছলে তোমার অঙ্গে স্তন-

স্পর্শ করাচ্ছিল, কেমন লাগছিল তোমার?'

নিমাই কানে হাত-চাপা দিল, 'তারা কৃষ্ণার্পিতা, তাদের কামগন্ধ নাই…'

'ওরা নিষ্কামা? ছুক্…আর যদি তাই হয়, তুমি এমন নপুংসক যে কামহীনা নারীর স্তনস্পর্শে তোমার ঘেন্না লাগল না?…শোনো, আমি স্পষ্ট কথা বলব। আমাকে তুমি পছন্দ কর না, সেজন্যে একবার বিয়েটা ভেঙে দিতেও চেয়েছিলে। আমার সপত্নী লক্ষ্মীদেবীকেই তুমি ভালোবাসতে, তার মৃত্যুতে তোমার এই বিকৃতি…তুমি ভাবছ তোমার সাবলিমেশন হয়েছে, আসলে তোমার হয়েছে অবভারশন। আইডেন্টিফিকেশন বলতেও পার, যেমন হয়েছিল, অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে মাধব ভেলি রাই…'

নিমাই বড়ো কাতর কণ্ঠে বলল, 'তোমার ভাষা বুঝতে পারছি না, কী বলছ তুমি? তুমি তো এমন ছিলে না…'

'ছিলাম না, সেকথা ঠিক। কিন্তু এই পাঁচশো বছরে আমরা মেয়েরা অনেক শিখেছি…সত্য বলতে কুণ্ঠাহীন। যেভাবে উপেক্ষা করেছ আমাকে তা সইব না। সেদিন যা দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখে এসেছিলে…'

'তোমার কথা যে কিছুই বুঝতে পারছি না। কী দিয়ে ভুলিয়ে এসেছিলাম তোমাকে?…'

প্রিয়া এতক্ষণে তার বুকের ওপর আঁচলের ঢাকা সরিয়ে দিল—দেখা গেল তার স্তনযুগলের ওপর দুটি খড়ম চেপে ধরা। সে দুটি নিমাইয়ের পায়ের কাছে নামিয়ে দিল। মুখ তুলে স্ফুরিত অধরে বলল, 'তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম, ওতে আমার সান্ত্বনাও নেই, কাজও নেই…' গর্বিত পা ফেলে মেয়ে গাছতলা ছেড়ে গ্রামের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে ফিরে বলল, 'তোমার কাছে কিন্তু আমার কিছু জিনিস রয়ে গেল, ভেবে দেখো….'

উচ্চ ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল নিমাই, 'প্রিয়া, শোনো, শোনো,…আমার কাছে কী জিনিস আছে তোমার? উঃ, চলে গেল…'

আমার কাছে কী জিনিস আছে প্রিয়ার? আমি কি ঋণী রয়ে গেলাম?—যতই জিজ্ঞাসা, ততই সংশয়, ততই আত্মগ্লানি। অস্থির, অধৈর্য হয়ে উঠল নিমাই, গলার বনমালা ছিঁড়ে ফেলল। খড়ম দুটো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল নদীর জলে। আজানুলম্বিত বাহু, জোর খুব, পড়ল গিয়ে মাঝনদীতে। যে পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে গেল।

দিন যায়—ভক্তসমাগম কীর্তন নৃত্য আবেশ চলতে থাকে, কিন্তু প্রিয়া এ কী বিষ তার রক্তে মিশিয়ে দিয়ে গেছে, সে যে কিছুতেই যায় না? এ কী অপরিশোধ্য ঋণ?

সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা, মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত। সমস্ত দিন হোরিখেলা, উদ্দণ্ড কীর্তনাদির পর ভক্তগণ কেউ স্বগৃহে ফিরে গেছে, কেউ নিদ্রিত। কেবল নিমাইয়ের চোখে ঘুম নেই, তার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা। তার কিছু যেন বুঝবার, কিছু পাওয়ার বাকি থেকে গেছে।

পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল যুবক, তারপর দ্রুত পদক্ষেপে পেরিয়ে গেল পথটুকু। প্রিয়াকে ঘুম ভাঙিয়ে ওঠাতেই হবে, জানাতে হবে তার অজ্ঞাত কী সে রহস্য। কিন্তু এ কী! গৃহের মধ্যে নয়, আঙিনায় ভূমিশয্যাতেই শুয়ে আছে প্রিয়া, মলিন বেশ, সংস্কারহীন কেশ, মুখ আধখানি ঢাকা।

'হা কৃষ্ণ, স্বৎসমর্পিতা ভক্তের এ কী দশা!…'

নিমাইয়ের মনে পড়ল, প্রিয়া বড়লোকের মেয়ে, নম্র কিন্তু গর্বিতা, আজ তাকে কী অবস্থায় এনে ফেলেছে সে। উদ্গত বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস—হরি-হরি।

'কে…তুমি!' প্রিয়া উঠে বসল, কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই হরিণীর মতো নেমে এল উঠোনে, প্রেমভরে জড়িয়ে ধরল দয়িতের হাত দুখানি।

'তুমি এসেছ!' ব্যস, আর কোনো কথা নেই, অপলক চোখ চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত দয়িতের অনুপম মুখচ্ছবির ওপর। বাতাসে যেন নেশা, পাতায়-পাতায় মাতাল হয়ে উঠেছে, নিকটে দূরে রাতজাগা পাখির মদির কাকলি। অতি স্বচ্ছ আলোতে নিমাই দেখল, প্রিয়ার দুচোখে জলের ধারা নামল, তার অধর স্ফুরিত, কাঁপা-কাঁপা দেহে রোমাঞ্চ, তনুখানি যেন ননীর পুতলি। প্রিয়া তার বুকের ওপর মাথা রাখল।

'প্রিয়া!…' আর-এক আবেগে যুবকের কণ্ঠ রুদ্ধ। সে প্রিয়ার মুখখানি বুক থেকে নিয়ে তুলে ধরল। —'বুঝেছি প্রিয়া!'

'কী…'

'সেদিন যেকথা তুমি বলে এসেছিলে। আমার কাছে তোমার কী জিনিস আছে তাই বুঝলাম। ওরা বলে আমার দেহে স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চ-স্তম্ভ-অশ্রু, সব নাকি রাধার অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ…'

'প্রিয়তম, সেটা রাধার নয়, আমারই লক্ষণ, আমি যে মেয়ে, আমি তোমারই অনুরাগিণী…নারীর অনুরাগের প্রকাশই তাই…'

'প্রিয়া, তুমিই আমার গুরু…' নিজেকে মুক্ত করল নিমাই, 'যাই…'

আটকাল প্রিয়া, 'কোথায় যাবে?'

'শ্রীবাস-অঙ্গনে। আমার শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরুর নাম সবাই জানে, কিন্তু তারা প্রকৃত আমার গুরু নয়, তোমার নাম আমি ঘোষণা করব…'

মুখ মুড়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে হাসল প্রিয়া, 'একথা ঘোষণা করতে হয় না, মনেই রাখতে হয়। কিন্তু প্রিয়তম, তুমি এখনো বুঝতে পার নি, আমার কাছে তোমার কী ঋণ…'

'এখনো বুঝতে পারি নি! বলো তবে…'

'শুনেছি যখন তোমার আবেশ আসে, কখনো তুমি হও ননীর মতো কোমল, কখনো তোমার দেহ হয় বজ্রকঠিন…'

'ওরা তাই বলে…'

'আবার ওদের কথা! এই না আমাকে গুরু বলেছ? আমার কথা শোনো। ননীর মতো দেহ পুরুষের হয় না। তুমি ভুলে যেও না, তুমি দুরন্ত নিমাই। শোনো, আমি তখন কুমারী, আমাকে তুমি চিনতে না, আমি কূলে দাঁড়িয়ে দেখেছি, বর্ষার গঙ্গায় তুমি এপার-ওপার করেছ, সাঁতার কেটে, হেলায় পাঁচ-সাতবার…শুনেছি তোমার সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ…আমি তোমার প্রেমিকা মেয়ে, তোমার বধূ, আমার কাছে সেই তোমার ঋণ, তোমাকে পুরুষসিংহ হতে হবে। কেন তোমার নারী-অভিমান, কেন আমাকে অপমান করবে তুমি?'

'গুরুর…'

'না-না, গুরু না শিষ্য না। আর যদি গুরুই হই, গুরুর কাছে অন্য শিক্ষা নাও। বিপরীত…বিপরীতের দ্বন্দ্ব মান না তুমি?'

'প্রিয়া, তোমার কথা যেন বুঝতে পারি, কিন্তু ঠিক যেন পারিও না। তুমি আমাকে শেখাও…'

প্রিয়া চঞ্চল হয়ে উঠল, স্ফুরিত অধরে নিমাইয়ের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'বোঝাব, একটু অপেক্ষা করো, আমি ডাকলে এসো…ওগো, তুমি আমার গৃহে এসেছ, আমার দেহের মঙ্গলবিধান করতে হবে না? আমার এই চিকুর বিছিয়ে মাজু হবে, বাবার দেওয়া মুক্তাহার তোলাই আছে, তাই দিয়ে আঁকব দেহমন্দিরে আল্পনা, আমার কুচযুগ হবে মঙ্গলকলস, কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব…' বলতে-বলতে প্রিয়া কুটীরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

কতক্ষণ পরে। কুটীরের ভেতর অন্ধকার। যেন নীলাম্বরীতে দুটি দেহ ঢেকে ফেলেছে। প্রিয়ার নীলাম্বরীতে সোনার চুমকিগুলি ঝিকমিক করে। জানলার ফাঁকে চাঁদের আলো এসে কেবল দুটি মুখ আলোকিত করেছে। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ছড়ানো একরাশ চুলের মধ্যে প্রিয়ার ফুটে-ওঠা মুখখানি, তারই ওপর নেমে এসেছে আর-একটি মুখ। চোখে-চোখে বাঁধা।

'প্রিয়তম, আর-একদিন·····বাসরঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, হোঁচট লেগে আমার পায়ের আঙুল ফেটে রক্ত বেরোল, তুমি বুড়ো আঙুলের ডগায় ক্ষতস্থান চেপে ধরেছিলে, মনে আছে? আমি শীৎকার দিয়ে উঠেছিলাম···'

'আমি ভেবেছিলাম ব্যথা পেয়েছ···'

'কিছু বোঝ নি, প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর···'

একথায় নিমাইয়ের বাহুবন্ধন আরো কঠিন হল, প্রিয়ার দেহ যেন গলে গেল। মিলিত হল দুজনের উষ্ণ নিশ্বাস।—'প্রিয়তম, তুমি আমাকে আরো জোরে ধরো, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমি মিলিয়ে যাচ্ছি! প্রিয়তম, তোমার কথা আমাকে বলো, খুশি হয়েছ? আচ্ছা, এই কি নিষ্কাম নয়? এই যে আমি ভুলে যাচ্ছি। ন সো রমণ ন হাম রমণী, এই তো বিষে বিষক্ষয়, বিপরীতের দ্বন্দ্ব, যুগল-মিলন...'

'প্রিয়া, বুঝেছি, আমারও তাই: প্রিয়য়া ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ ন আন্তরম্···'

আধবোঝা পাতার ফাঁকে আবিষ্ট চোখ প্রিয়ার, স্বর বদলে বলল, 'তোমার চোখে আর সেই মেয়েলি বিলোলতা নেই, কী ভালো। তোমার চোখে জ্বালা, তোমাকে দেখছি যেন অন্তহীন কাল ধরে, তুমি মধুর, তুমি আমার জন্মজন্মান্তরের ধন, জনম অবধি হম রূপ নেহারনু···'

'প্রিয়া, তোমার প্রেমে আমি ধন্য, তোমার চোখে তোমার অধরে সুরভিত নিশ্বাসে যে এত বৈচিত্রী···'

'প্রিয়তম, এই রাত্রি, এই মিলন যেন শেষ না হয়···'

'না, এর শেষ নেই, অনুদিন বাঢ়ল অবধি ন গেল···একেই বুঝি বলে প্রেমবিলাসবিবর্ত···'

আবেশে চোখ মুদে এল প্রিয়ার, পরক্ষণেই মেলল, 'আবার বলো। তোমার ওই উড়ে ভক্ত রামানন্দই ঠিক কথা বলেছিল, যা শুনে তুমি তার মুখে হাতচাপা দিয়েছিলে···আর সবাই ভুল বুঝিয়েছে তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। আমার ভাগ্য ভালো যে তোমাকে ফিরে পেয়েছি···' বলে প্রিয়া দুই বাহু দিয়ে নিমাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরল নতুনতর আবেগে—'প্রিয়তম, ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।' নিমাইও ঠিক সেই কথাগুলিই বলল, 'এসো, আমরা একসঙ্গে বলি।'

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

১৯৭৭-৮৭: এই দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে সাংখ্যিক হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার বিপুল বিস্তার ঘটেছে। ১৯৭৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪২,৮৮১; এখন ৫২,৮৮১। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৭৭ সালে ছিল ৫৩,৯৩,০০০; এখন ৮০,৪০,০০০। এর মধ্যে তফসিলি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১,২০,০০ আর আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৪,০০০। নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন প্রায় ২৮,০০০।

মাত্রাগত বিকাশের ছবিটি আশা জাগায়। কিন্তু প্রদত্ত শিক্ষার গুণগত বা মানগত চিত্রটি কেমন?

মূল প্রশ্নগুলিতে যাওয়া যাক। চারটি মৌলিক বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথম, প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো সঠিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা; বর্তমানে যে শিক্ষাক্রম আর পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হচ্ছে তা শিশুশিক্ষার পক্ষে যথাযথ কিনা।

দ্বিতীয়, পাঠ্যপুস্তকগুলি যথোচিত মানের কিনা।

তৃতীয়, শিক্ষকেরা শিক্ষাদানে কতদূর নিষ্ঠাবান, আগ্রহী, এবং উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত।

চার, পাঠদানের কাজটি কেমন পরিবেশে চলছে; প্রয়োজনীয় সাজসরনজামের জোগান ঠিকমতো হচ্ছে কিনা।

প্রাথমিক শিক্ষার একটি কালোপযোগী পরিপ্রেক্ষিত রচনা করার জন্য রাজ্যসরকার ১৯৭৪ সালে "প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি" নিয়োগ করেন।

সেই কমিটিতে ছিলেন একাধিক প্রাথমিক-শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, এবং বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। ১৯৭৯ সালে এই কমিটি একটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচী উপস্থাপন করেন। এই রাজ্যে এর আগে এমন সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয় নি। রাজ্যসরকার ১৯৮১ সাল থেকে এই নতুন নীতি কার্যকর করেন।

প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষাই শেখানো হবে, দ্বিতীয় কোনো ভাষা নয়—কমিটির এই সিদ্ধান্তটি কয়েক বছর প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। এখনও তা থামে নি। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, কমিটির এই সিদ্ধান্তটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভাষাশিক্ষকদের অভিমতের অনুসারী। কোঠারি কমিশনের সিদ্ধান্তও কমিটির এই মতকে সর্বৈব সমর্থন করে। মনে হয়, বিরোধিতা অনেকাংশেই ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত, অন্ধ-ভাবাবেগতাড়িত। বস্তুত, ভাষা-শিক্ষা শব্দার্থশিক্ষা নয়, মূলত বাক্যগঠনের শিক্ষা। বাঙলা আর ইংরেজি ভাষার বাক্যগঠনরীতি ভিন্ন-ভিন্ন। একসঙ্গে দুই ভিন্ন গঠনরীতির ভাষা শেখানোর চেষ্টা করলে শিশু না শেখে মাতৃভাষা, না দ্বিতীয় ভাষা। গত ছয়-সাত বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় কমিটির ভাষাশিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে।

বইগুলি যন্ত্র নিয়ে লেখা

এ প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে প্রথমেই পাঠ্যপুস্তক যাঁরা রচনা করেছেন সেই লেখক এবং সংকলকদের ধন্যবাদ জানাতে হয় তাঁদের কুশলতার জন্য। বই-গুলি গতানুগতিক ঢঙে রচিত হয় নি, বরং শিশু-শিক্ষণের সর্বাধুনিক চিন্তাধারা সেখানে বহুলাংশে প্রতিফলিত। প্রতিটি বিষয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখে রচিত হয়েছে তার ভাষা। সুবিন্যস্ত তার আঙ্গিক। প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে বইগুলি রচিত। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সেগুলি শিশুদের উপলব্ধি এবং উপভোগের সামর্থ্য অনুযায়ী রচিত হয়েছে এবং তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে সহজপাঠ্য। অধিকাংশ শিক্ষকই স্বীকার করেন, বইগুলি পড়ানোর কাজটি সহজ এবং আনন্দ-দায়ক। সঠিকভাবে পড়ানো হলে তা শিশুদের মনের জগৎকে প্রসারিত করতে পারবে।

বানানের নৈরাজ্য

তবে পাঠ্যপুস্তকগুলি সার্বিকভাবে প্রশংসনীয় চেষ্টার স্বাক্ষর বহন করলেও ছোটো বড়ো বেশ-কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে। এ-যাবৎ প্রকাশিত কোনো-কোনো বইয়ে তাড়াহুড়ো করে লিখে ছেপে ফেলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সবচেয়ে দৃষ্টিকটু ত্রুটি হল বানানের অসমতা। এক-একটি বইয়ে একই শব্দের বা এক-জাতীয় শব্দের ভিন্ন-ভিন্ন বানান। কাল-কালো, ভাল-ভালো, অনুজ্ঞায় কর-করো, লেখ-লেখো, হাতি-কুমীর —এমন বানানে, বা একই সঙ্গে বহু বানানরীতি অনুসরণে পুস্তকগুলি কণ্টকিত। প্রাথমিক শিক্ষা-স্তরের পাঠ্যপুস্তকে এজাতীয় গাফিলতি বা ত্রুটি শুধু নিন্দনীয়ই নয়, শিশুশিক্ষার্থীর বানানশিক্ষার পক্ষে তা বিশেষ প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। এর ফলে বানান সম্বন্ধে এক ধরনের বিভ্রান্তি শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে জন্ম নেয়।

এ-সমস্ত (পরিহার্য) ত্রুটি সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা থাকে না যে, বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা যে পাঠ্য-পুস্তকগুলিকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে সেগুলি মোটামুটি উচ্চমানবিশিষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে শিশু-শিক্ষণের অনুকূল। ত্রুটি যেগুলি রয়ে গেছে তাকে মুক্ত করে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার দায়িত্ব সরকারের প্রাথমিকশিক্ষাবিভাগের।

কিছু শিক্ষক বিদ্যার্থীদের "বইপড়ুয়া জন্তু" বানাতে চান

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা না উল্লেখ করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সিলেবাস কমিটি প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো ছাপা বইয়ের বদলে সাধারণ মৌখিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে বলেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাই এ বিষয়ে কোনো পাঠ্য-পুস্তক রচনা করার ব্যবস্থা হয় নি। অনাবশ্যক পুঁথির চাপ থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে আনন্দময় প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাদানই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু একশ্রেণীর প্রধান শিক্ষক এবং সাধারণ শিক্ষকেরাও, এবং তথাকথিত কিছু "ভালো স্কুলে"র শিক্ষকেরা এই সিদ্ধান্তে সম্ভবত সন্তুষ্ট নন। সরকারি নিয়ম ভেঙে তাঁরা তাই অনেক সময়ই ইতিহাস, ভূগোল আর সামাজিক পরিবেশের কুৎসিত বই কিনে এনে বিদ্যার্থীদের কাছে বিক্রি করছেন, এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এসব বই ভুল তথ্য এবং ভুল বানানে ভরা। সবকিছু জেনেও এ ধরনের বই পাঠ্য করার পিছনে কী বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে? সম্ভবত শিক্ষকদের অর্থাগম।

এ ধরনের অপচেষ্টা বন্ধ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। সাধারণ একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কতদূর ফল হবে তা বলা শক্ত। তবে মূল উদ্দেশ্যকে অপরিবর্তিত রেখেই প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-মূলক বিষয়টির জন্য একটি সহায়ক পুস্তিকা শিক্ষাবিভাগ প্রকাশ করতে পারেন। বইটির দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে পাকা হাতের ছবিতে ভরা, বাকিটুকু সহজ ভাষায় বড়ো হরফে ছাপা পাঠ্যবস্তু। এভাবেই এইসব কদর্য বইয়ের প্রচলন বন্ধ করা সম্ভব।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত

এবার আসা যাক পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে। এই গুরুকর্মটি সম্পাদনের মূল দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ তাই স্বভাবতই বহুলাংশে নির্ভর করে তাঁদের শিক্ষাদানের গুণমানের উপর। সুস্থ পঠন-পাঠনের জন্য সিলেবাস কমিটি শিক্ষার্থী-শিক্ষকের কাম্য অনুপাত স্থির করে দিয়েছেন ৪০ : ১-এ। কিন্তু শিক্ষাদানে যাঁরা নিযুক্ত আছেন সেই শিক্ষককুলের মতে এই অনুপাত কোনো উন্নত পঠন-পাঠনপ্রক্রিয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়। নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলিও এতে সুষ্ঠুভাবে সার্থক করা সম্ভব নয়। উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই অনুপাত হওয়া উচিত ছিল ২৫ : ১।

এই অনুপাতকে তর্কের খাতিরে যথোপযুক্ত বলে ধরে নিলেও দেখা যায় যে বাস্তব ক্ষেত্রে ৪০ : ১ অনুপাতটি কার্যত অনুসৃত হচ্ছে না। কারণ, শিক্ষকাভাব। এই রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে সুস্থ এবং উন্নত পঠনপাঠনের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন (৪০ : ১ হিসাব অনুযায়ী) মোট ২ লক্ষ ১ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের। অথচ সেইসংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা বর্তমানে নেই। কত কম? বা মোট কতজন এই মুহূর্তে কর্মরত আছেন? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না সরকারি নথিপত্র থেকে।

শিক্ষকাভাব মেটাতে সরকারি হিসাব অনুযায়ী শিক্ষক-উদ্বৃত্ত বিদ্যালয়গুলি থেকে শিক্ষকাভাবে জর্জরিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বদলি ব্যবস্থার কথা প্রাথমিক শিক্ষাদপ্তর ঘোষণা করেছিলেন, বাস্তবে তা পালন করা হয় নি। তাই প্রচণ্ড শিক্ষকাভাবে এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ধুঁকছে। এই প্রবন্ধ লেখার আগে গ্রাম-শহরের প্রায় ৩০টি স্কুলে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি। তাতে দেখেছি, ৭০, ৮০, এমনকি ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীও এক-একটি শ্রেণীতে রয়েছে। হাওড়া শহরের একটি তথাকথিত "ভালো" ইস্কুলে ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সবশেষে যে ছাত্রটি ভরতি হয়, তার রোল সংখ্যা ছিল ১৫৩। দুটি সেকশনে বিভক্ত ওই শ্রেণীটিতে এক-একটি সেকশনে একই সঙ্গে একসাথে পড়েছে প্রায় ৭৬ জন ছাত্র। কী পড়েছে অনুমেয়। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরো ভয়াবহ। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগদা ব্লকের একটি ইস্কুলে মাত্র তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত রয়েছেন ২৭৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাদানে।

এরই পাশে-পাশে মাত্র ১৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াচ্ছেন ৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা—এ ছবিও আছে।

কারা পড়াচ্ছেন ?

রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার গুণমানের ক্রম-অধোগতির জন্য কর্মরত শিক্ষকদের দায়ও কম নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় (প্রায় ১২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর) কর্মরত শিক্ষককুলে মোটামুটি চার ধরনের শিক্ষক-শিক্ষিকার দেখা মিলেছে :

এক, যাঁরা পড়াতে জানেন এবং নিষ্ঠাভরে পড়ান (এঁদের সংখ্যা দিনে-দিনে ভীষণ কমে যাচ্ছে)।

দুই, যাঁরা প্রশিক্ষণ না পেলেও ভালোভাবে পড়াতে চেষ্টা করেন।

তিন, যাঁরা প্রশিক্ষিত হয়েও শিক্ষাদানে উৎসাহ বোধ করেন না।

চার, যাঁরা পড়াতে জানেন না, পড়াতে চানও না, অথচ মুরুব্বি জুটিয়ে ইস্কুলের চাকরিতে ঢুকেছেন।

বস্তুত, কর্মরত শিক্ষক যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রে উজ্জ্বল, শিক্ষার্থীর কাছে নিজেকে দৃষ্টান্ত-স্থাপনকারী আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম, এমন নিবেদিত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায়। দিনবদলের সঙ্গে-সঙ্গে এই শ্রেণীর শিক্ষকের সংখ্যা দ্রুতহ্রাসমান। অন্যদিকে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে অ-প্রশিক্ষিত শিক্ষকের প্রাধান্যই লক্ষণীয়। ইচ্ছে থাকলেই শিক্ষক হওয়া যায় না, শিক্ষকতা শিখতে হয়—এই চরম সত্যটি রাজ্যের প্রাথমিকশিক্ষাবিভাগ এবং কর্মরত শিক্ষক-কুলের একটি বড়ো অংশ বোধহয় ভুলতে বসেছেন। নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সাথে-সাথে তার সঠিক রূপায়নের জন্য কমিটি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে পরিবর্তিত পাঠ্যক্রমটির সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচিত করানো হবে। রাজ্যসরকারের প্রাথমিকশিক্ষা-বিভাগেরও কর্তব্য ছিল সেইমত নির্দেশ জারি করে প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য ওরিয়েনটেশন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা। কিন্তু তা করা হয় নি। কয়েক বছর আগে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাকে **মাত্র পনেরো** দিনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে পরিবর্তিত পাঠ্যসূচীর সাথে পরিচয় ঘটানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তাঁদেরই উপর। সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য মাঝে দু-একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আর প্রয়োজনের বিচারে সেসবই ছিল নেহাত নিয়মরক্ষা। নতুন নীতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য একটি শিক্ষণ-নির্দেশক বা শিক্ষণ-সহায়িকা বিদ্যালয়প্রধানদের কাছে পাঠানোর কথা ছিল। তাও অনেক সময় তাঁদের হাতে এসে পৌঁছয় নি। এক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান তো জানেনই না যে ওইরকম একখানি বই তাঁর পাওয়ার কথা ছিল।

ফল যা হওয়ার তাই-ই হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য, বিষয়ের খুঁটিনাটি, নবপ্রবর্তিত মূল্যায়নপদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয় নি। একজন প্রবীণা, শিক্ষাদানে উৎসাহী অথচ অ-প্রশিক্ষিতা শিক্ষিকা কথায়-কথায় বলে ফেললেন, উৎপাদনমূলক কাজ বলতে তিনি বাক্যরচনা বোঝেন এবং সৃজনাত্মক কাজ বলতে বোঝেন শূন্যস্থান পূরণ। উপস্থিত তাঁর সহকর্মী শিক্ষিকারাও তাতেই মাথা নাড়লেন সম্মতি জানিয়ে। এমন অনেক ঘটনা স্বচক্ষে দেখে স্বকর্ণে শুনে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হতে হয় যে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাই জানেন না কী তাঁরা পড়াচ্ছেন, কেন তাঁরা পড়াচ্ছেন, কিভাবে তা পড়ানো উচিত ছিল, এবং মূল্যায়নের সময় বিভিন্ন বিষয়ের মূল বিচার্য বিষয় কী। পুরোনো শিক্ষাব্যবস্থার গতানুগতিক শিক্ষাদানপ্রথায় অভ্যস্ত অনেক শিক্ষকই নতুন শিক্ষা-দানপদ্ধতির রকমফেরে মানিয়ে নিতে পারেন নি।

ভাবের ক্ষেত্রে তাই মিল ঘটে নি, বরং রয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে অনর্থক বিরোধ, শিক্ষাদানে উৎসাহ থাকলেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে তাঁদের কাছে তা হয়ে উঠেছে একটা দায়সারা কাজ।

শিক্ষকদের বৃত্তিগত এই বহুবিধ অযোগ্যতার বলি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা পাবার বিষয়টি। 'শিক্ষার মানোন্নয়ন তো দূরের কথা, শিক্ষার সাধারণ মানটিও অনেক ক্ষেত্রে বজায় থাকছে না। প্রাথমিক স্তরেই একটি বিরাট গলদ থেকে যাওয়ায় শিশুদের শিক্ষাজীবনের ভিত্তিটা হচ্ছে নড়বড়ে। পরবর্তী শিক্ষাস্তরে তারা প্রবেশ করছে অনুপযুক্ত হয়ে।

শিক্ষাদানে নিষ্ঠার অভাব

কিন্তু প্রশিক্ষিত শিক্ষকই শেষ কথা নয়। আরো বড়ো একটি সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটি হল অধিকাংশ শিক্ষক-দের আদর্শবোধের অভাব—অভাব শৃঙ্খলাবোধের, নিয়মানুবর্তিতার, আন্তরিকতার ও কর্তব্যপরায়ণতার। শিক্ষার বিশুদ্ধ স্বার্থের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান শিক্ষক আজ নগণ্য। নানাভাবে শিক্ষার ভিত্তিমূলে আঘাত করছেন এঁরাই। দেশ জুড়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আত্মপরায়ণতার আর সম্ভোগপরায়ণতার দূষিত বাতাস বইছে, তাতে শিক্ষার আনুষ্ঠানিক রেওয়াজ-কে সচল রেখে নিয়মরক্ষা করা গেলেও, শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ আজ বিধ্বস্ত। অবক্ষয়িত মূল্যবোধের পরি-বেশে অভ্যস্ত এই-সমস্ত শিক্ষকেরা তাঁদের "শিক্ষক-মনোবৃত্তি" হারিয়ে ফেলার কারণ হিসেবে "কী করব" গোছের অজুহাত খাড়া করেন। কেউ-বা আরো এক ধাপ এগিয়ে আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতার দোহাই পাড়েন। আসলে এঁরা জীবনধারণের উপায় হিসেবে শিক্ষকতা করতে এসেছেন, কিন্তু অর্থপূর্ণ জীবনযাপনের বৃহৎ মানবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, বা "সামাজিক সৎকর্ম"বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই পেশায় আসেন নি। শিক্ষাদানে চরম উদাসীন্য আর নিষ্ক্রিয়তাই তাই এঁদের প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাদানে শিক্ষকদের এই ক্রমাগত অশ্রদ্ধা প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত স্তরেই সৃষ্টি করেছে এক আশাহীনতার অবসাদ। হাওড়ার সেই পূর্বোল্লিখিত তথাকথিত ভালো ইস্কুলটিতে চলতি বছরের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি—এই দুই মাসে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ানো হয়েছে কিশলয়ের দুটি পাঠ, গণিতের দুটি মাত্র পৃষ্ঠা, ইতিহাসের একটি পাতাও নয়, ভূগোলের নয় একটিও অক্ষর, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অবস্থা তথৈবচ। উত্তর ২৪-পরগনার একটি অজ পাড়াগাঁ রামচন্দ্রপুরের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী কল্যাণী বৈদ্যের অবস্থা আরো করুণ। সে একটি চিঠিও পড়তে পারে না, নিজের নামটিও লিখতে শেখে নি এতদিনে। এগুলি কোনো ব্যতিক্রম নয়—এখন এটাই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষক ও শিক্ষাদানের বিবিধ সমস্যার তদারকির জন্য সরকারের তরফ থেকে নিযুক্ত আছেন বিভিন্ন স্তরে স্কুল-পরিদর্শকেরা। ঘুরে-ঘুরে স্কুল-পরিদর্শনের কাজ তারা অধিকাংশ সময়ই করেন না, বা করলেও তা দায়সারাভাবে করেন। বিদ্যালয়ের অত্যধিক সংখ্যাধিক্যের কারণ দেখিয়ে তাঁরা তাঁদের অপারগতার কথা বলেন।

কার্যত তাঁদের কর্মকাণ্ড তাই দপ্তর-কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি প্রাথমিকশিক্ষাবিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির তদারকির ভার পঞ্চায়েত সমিতির উপর ন্যস্ত হবে। আশা করা যাক, এ ভার সৎভাবে নির্বাহিত হবে—লোকদেখানো ব্যাপার হয়ে উঠবে না।

সাজসরঞ্জাম অপ্রতুল

এরই মধ্যে যে-সমস্ত শিক্ষক তাঁদের ধৈর্য, নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা উজাড় করে দিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন, নতুন পাঠ্যক্রমটির বাস্তবায়নে নিরলস

পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁরা প্রতিপদে বাধা পাচ্ছেন প্রয়োজনীয় উপকরণের অপ্রতুলতায়, প্রতিকূল বিদ্যালয়গত ও সামাজিক পরিবেশের জন্য। কেন্দ্রীয় সমীক্ষা কমিটির রিপোর্টে উল্লিখিত পরিসংখ্যান এ-ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরে। রিপোর্ট অনুযায়ী : এ রাজ্যের ১৮০৮৬টি ইস্কুল চলছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে, ৬৯০০টি ইস্কুলের শিক্ষাদান চলছে ছোটো-ছোটো ঝুপড়ির মধ্যে, এমনকি তাঁবুর তলায় রয়েছে ৫৩টি। আমাদের মতন গরিব দেশে ৫০০০ ইস্কুলই পাকাবাড়িতে বসবে, এমন আশা করা নিশ্চয়ই বাতুলতা। কিন্তু সুস্থ পঠন-পাঠনের জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা হিসেবে অন্তত প্রতিটি শ্রেণীর জন্য আলাদা শ্রেণীকক্ষের বন্দোবস্ত আবশ্যক। অন্যথায় একটি শ্রেণীর শিক্ষকের পাঠদান পাশের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। করছেও তাই। এমন অনেক ইস্কুলই চোখে পড়েছে যেখানে একই ছাদের তলায়, পার্টিশান-বিহীন একটি ঘরে বসেছে তিনটি-চারটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। এই দুর্ব্যবস্থার মধ্যে হয়তো শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে?

শিক্ষণ-সহায়ক সামগ্রীর সরবরাহের চিত্রটিও করুণ। ম্যাপ, গ্লোব, চার্ট, শিশু-শিক্ষণের উপযোগী নানারকমের মডেল, খেলনা, পশুপাখির ছবি—এসবই এখন "নেই"-এর তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। ব্ল্যাক-বোর্ড কখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখা মেলে, কখনও-বা একাধিক শ্রেণীর জন্য একটি-দুটি ব্লাকবোর্ডও দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিতেই প্রয়োজনমতো আসন নেই। কোথাও বা একেবারেই নেই। এসব সামগ্রীর ঠিকমত যোগান হয় না। এরই সাথে উপরি-সমস্যা হিসেবে রয়েছে সুরক্ষার অভাব। জানলা-দরজাহীন বা দরমার বেড়ায়-ঘেরা স্কুলবাড়িগুলি থেকে স্কুলের আসবাব-উপকরণ চুরি যায় প্রায়ই।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করি। বিষয়টি হল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা। এ ব্যাপারে নতুন পাঠ্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারও যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। ফি বছর তাঁরা বিভিন্নস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার পিছনে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান করে ব্যয় করছেন লক্ষাধিক টাকা। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এতে কি আদৌ কোনো ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব? সম্ভব কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটানো? অনেকের অভিমত, এ ধরনের চেষ্টা সরকারি অর্থের অপরিকল্পিত, নির্বোধ অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সারা বছরে যে রাজ্যের প্রায় নব্বই শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার্থী (এক রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়া) পঞ্চাশ মিটার সোজা দৌড়াবার জায়গা পায় না, যে রাজ্যের প্রায় ৯৫% বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো মাঠ নেই, স্থানীয় ক্লাব বা পড়ে-থাকা ফাঁকা জমিতে চালু রেখেছেন আইনমাফিক ক্রীড়াচর্চা, এমনকি প্রতি বিদ্যালয় পিছু একজন করে ক্রীড়া-শিক্ষক/শিক্ষিকাও যে রাজ্যের স্থলগুলিতে নেই, নেই কোনো খেলাধুলার উপকরণ, সেখানে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান বাবদ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় সরকারের অবিচক্ষণতা আর সাংগঠনিক অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক। আসলে সরকারের উচিত ছিল ওই টাকায় প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য একটি করে নিজস্ব মাঠের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। অর্থাভাবে তা সম্ভব না হলে, সেক্ষেত্রে অন্তত প্রতি দু-তিনটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি করে মাঠের ব্যবস্থা করতে পারতেন। এর সাথে-সাথে বিদ্যালয়গুলিতে খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু তেমন কোনো গঠনমূলক চিন্তা বা প্রয়াসের লক্ষণ না থাকায় খেলাধুলার ব্যাপারে রাজ্যসরকারের উৎসাহ কোনো সুসংবদ্ধ রূপ পায় নি। পারে নি কোনো উল্লেখযোগ্য

পরিবর্তনও আনতে।

পদ্ধু বণ্টনব্যবস্থা

সময় এসেছে সরকারি বইয়ের বণ্টনব্যবস্থা নিয়ে পুনর্ভাবনার। রাজ্যসরকার প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে পুস্তক তুলে দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার রূপায়ণ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সব মহলেই রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। মাঝে-মধ্যে বই নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও ওঠে। অভিযোগ তোলা হয় এক শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী, এবং প্রাথমিক শিক্ষক/প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সেকথা বলা বলা যায় না। খোলা বাজারে প্রকাশ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রকাশিত বিনামূল্যের সরকারি বই চড়াদামে বিক্রি হতে দেখা যায়। অতএব বই নিয়ে কালোবাজারি হচ্ছে। অন্যদিকে বই যদি-বা শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে গিয়ে পৌঁছায় তবে তা ঠিক সময়ে পৌঁছায় না। আবার ঠিক সময়ে পৌঁছালেও যথেষ্ট সংখ্যায় সব কটি বই মেলে না। বইয়ের জন্য প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকারা যে দাবিপত্র জমা দেন সে সম্পর্কে রয়ে গেছে সরকারের ত্রুটিপূর্ণ নীতি। দাবিপত্রটি নিয়মানুযায়ী রচিত হবার কথা জানুয়ারি মাসের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে, অথচ সরকারের নির্দেশেই মার্চ মাস পর্যন্ত নতুন ছাত্র ভর্তি করার নিয়ম চালু রয়েছে। এখন প্রশ্ন ওঠে, ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ—এই দুমাসে যারা ভরতি হচ্ছে তাদের বই কারা দেবে? ৬০ : ৪০ অনুপাতে যে পুরোনো বই আর নতুন বই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতেও শিশুশিক্ষার্থীদের মনে রয়ে গেছে নানা ক্ষোভ। সব বই একই সাথে বছরের প্রথমে পাওয়া যায় না। পাঁচ-ছয়, এমনকি আট-নয় মাসও চলে যায় সবকটি বই পেতে। ফলে এই মধ্যবর্তী সময়টাতে পড়াশুনো কার্যত বন্ধই থাকে।

সবাইকেই বিনামূল্যে কেন?

পাঠ্যপুস্তকগুলিকে বিনামূল্যে বণ্টন করার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। দেখা গেছে, বইগুলি একেবারে বিনামূল্যে দেওয়া হলে বইয়ের উপর যত্ন থাকে না, ফলে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় আসলে শিক্ষার্থীকেই। সরকারকেও। আবার সমস্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যেই বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয়েরই নামান্তর। আর্থিকভাবে যারা সচ্ছল তাদের জন্য বিনামূল্যে বই পাবার সুবিধা রাখা অনুচিত। সরকারি অর্থের অপচয়ও। যে সাড়ে আশি লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা নিচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের অভিভাবকই এমন দুঃস্থ নন যে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য বছরে একবার করে অন্তত প্রতি বই-পিছু একটাকা খরচ করতে পারেন না। এইভাবে মাত্র পাঁচ-ছয় টাকার বিনিময়ে তাঁরা সমস্ত বইগুলিই কিনতে পারেন। এতে পুস্তকখাতে অর্থক্লিষ্ট সরকারের বেশ কিছু অর্থ বাঁচে (হিসেবে প্রায় চার কোটি) যা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের অনেক অসম্পূর্ণ গঠনমূলক কাজই সম্পূর্ণ করা যায়। আর্থিক অবস্থা যাঁদের দুর্বল, স্থানীয় পঞ্চায়েতের বা মিউনিসিপালিটির অনুমোদনে তাঁদের জন্য কিছু কমিশনে বই দেওয়া যেতে পারে। যাঁরা নিতান্তই অপারগ, বিনামূল্যের সরকারি বই তাঁদেরই দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। এবং অবশ্যই তা স্থানীয় পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপালিটির অনুমোদন-সাপেক্ষে।

কে বই বেচবেন?

বিতরণ-পদ্ধতি নিয়েও অসংখ্য অভিযোগের পাহাড় যেভাবে জমা হচ্ছে তাতে মনে হয় সরকারি প্রশাসনের হাত থেকে পুস্তকবিতরণের দায়িত্ব নিয়ে নেবার সময়

এসেছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বণ্টন-নীতিকে অনুসরণ করতে পারেন। ওঁদের মতো নগদ পয়সার বিনিময়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিতরণের ভার ছেড়ে দিলে, হয়ত কিছু সুরাহা হবে। এতে নিকটস্থ (বেসরকারি) পুস্তকবিপণী থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে বই সংগ্রহ করে নিতে পারবে বছরের শুরুতেই। বই নিয়ে কালোবাজারি সম্পূর্ণ মাত্রায় বন্ধ করা সম্ভব না হলেও এই কুপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এতে গ্রহণ করা যাবে।

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে

সবশেষে 'মূল্যায়নব্যবস্থা' প্রসঙ্গে দুচার কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক কাঠামোর উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই মূল্যায়নব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বছরান্তে এক/দুবার ছাত্র-ছাত্রীদের অধীত বিদ্যার পরীক্ষা না নিয়ে সারা বছর ধরেই নির্দিষ্ট সময়ান্তরে একাধিক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সারা বছরের বিদ্যাশিক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা। পূর্ববর্তী ব্যবস্থার থেকে তাত্ত্বিক বিচারে এ ব্যবস্থা অনেক ভালো, সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে কিছু বলার কথা থেকে যায়।

প্রথমত, প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'ক' (৮০—১০০%), 'খ' (৬০—৭০%) ইত্যাদি স্তরবিভাগ করা হয়েছে। এই স্তরবিভাগের বাস্তব উদ্দেশ্য কী, তা বোঝা যায় না। এই স্তরভেদ তখনই ফলদায়ক যখন নিম্নস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা করে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে এবং তার মাধ্যমে তাদেরকে উন্নত স্তরে উন্নীত করবার লক্ষ্য থাকে। কিন্তু এমন কোনো উদ্দেশ্য/লক্ষ্য পরিলক্ষিত না হওয়ায় মূল্যায়নপদ্ধতি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তার যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

চল্লিশের দশকের প্রগতি-সাহিত্য

৪৬ নং : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে—চিন্মোহন সেহানবীশ। রিসার্চ ইণ্ডিয়া পাবলিকেশনস, কলকাতা। নভেম্বর ১৯৮৬। তিরিশ টাকা।

বইটির নামকরণে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা বাঙলা সাহিত্য তথা শিল্পজিজ্ঞাসার জগতে "প্রগতি আন্দোলন" নামে পরিচিত। ইতিমধ্যে সুধী প্রধান এবং ধনঞ্জয় দাসের দুখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও নানা বিক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রবন্ধ আর সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। উপরন্তু বেশ কিছু অনুসন্ধানী "প্রগতি সাহিত্যে"র নানা খণ্ড অংশ নিয়ে গবেষণাও করছেন। তাঁদের নানা জিজ্ঞাসা। এমন সময় চিন্মোহনবাবুর নতুন বইখানি যখন প্রকাশিত হল তখন অনেক জিজ্ঞাসা, প্রচ্ছন্নতা, ভ্রান্তধারণা আর অস্পষ্টতার অবসান প্রত্যাশিত ছিল। কারণ এ বিষয়ে তিনি প্রথম যুগের কর্মী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে প্রত্যাশা আশাহতরূপ পূর্ণ হল না।

বইটি ছোটো-বড়ো ৩৮টি প্রবন্ধে, সাক্ষাৎকারে আর চরিত্রচিত্রে গ্রথিত —১৯৪০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত। অধিকাংশ স্মৃতিচিত্রধর্মী এবং ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে লেখা বলে গোটা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত হয়ে উঠতে পারে নি। প্রায় ৫০ বছর পরে, এ যুগের পক্ষে '৪৬নং' নামটাও বড়ো অস্পষ্ট লাগে।

গ্রন্থের সূত্রপাত ৪৬নং বাড়িটি নিয়ে ১৯৪১ সালে এবং সেই প্রসঙ্গে লেখক নাম করেছেন বিস্তৃত একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের—Youth Cultural Institute—সংক্ষেপে Y. C. I। ওটি ছিল শহরের বড়োঘরে ছেলেমেয়েদের বৈঠক, বেশ কিছু ব্রাহ্মঘরের সন্তান, যাঁদের মধ্যে স্বয়ং লেখকও ছিলেন। বিস্ময়ের কথা, তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ ছাত্রজনটের সঙ্গে ওঁদের বনিবনাও ছিল না—যদিও সাম্যবাদী ভাবনায় দু পক্ষই দীক্ষিত। যাক সে কথা—৪৬ নংকে কেন্দ্র করে মূল যে বৃত্তান্ত অর্থাৎ প্রগতি-ভাবনার আন্দোলন,

গ্রন্থসমালোচনা

তার সঙ্গে Y. C. I-র কোনো প্রতিষ্ঠানগত যোগ ছিল না—একমাত্র ওই বাড়িতে প্রথমাগত ভাড়াটিয়া ছাড়া। প্রথম উপস্থাপনে মনে হতে পারে—বুঝি-বা ওঁরাই প্রগতি লেখক সংঘের 'ভ্যানগার্ড'—অগ্রবাহিনী। বস্তুত তা নয়। সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে গুরুত্ব দিতে হলে Y. C. I-রও আগে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বা আড্ডার উল্লেখ করতে হয়—যার বিবরণ এ বইতে নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে—যাদের মধ্যে প্রগতি-ভাবনার কাজের কাজ যা, শুরু হয়ে গিয়েছিল নানা আলোচনা, বিতর্ক ও রচনাদির সূত্রে। কালানুসারে সজ্জিত নয় বলেই এই ত্রুটি। লেখক Y. C. I-র পক্ষে এ-ও দাবি করেছেন—বৃন্দগানের বা community song-এর সূত্রপাত ওঁরাই করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৃন্দগানের গায়নপদ্ধতি তো ইতিপূর্বেই সূচিত। এবং যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা ধরা যায় তা হলে ১৯০৫-এর রাখীবন্ধনের গান অথবা ১৯২০-এর জাতীয় আন্দোলনে নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' অথবা 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' তো একদা বাঙলা-দেশকে দুলিয়ে দিয়ে গেছে। তাছাড়া ছিল 'প্রভাতফেরী'। তবে হয়তো ওঁরা চীন থেকে প্রেরণা পেয়ে থাকবেন।

উল্লেখিত ধর্মতলা স্ট্রীটের ওই বাড়িটির চারতলার ঘরটি ধরলে তার যে ১০ বছরের বোলবোলাও—চিন্মোহনবাবুর স্মৃতিচিত্রে তা চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে। স্মৃতিকথন বলে এক-আধটা বিস্মৃতিও ঘটে গেছে—যেমন, ভারতীয় মুসলমান এবং আধুনিক কাল সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ আসরফের দু-দিনব্যাপী বক্তৃতা—যা ছিল রাধারমণ মিত্রের বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ আর গভীর। বিতর্কের সভাগুলিও ছিল মূল্যবান—তার কিছুটা উল্লেখ-মাত্র করে ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন, ফ্রান্সের গারোদি-এরভে-আরাগঁ বিতর্ক। সে সময়ে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণায় নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব বিতর্ক ঢেউ তুলেছিল—তাতে বাঙলার প্রগতি-ভাবুকরাও আন্দোলিত হয়েছেন। সেসব বিতর্ক-আলোচনায় নতুন কালের নতুন সত্যের ভিত তাঁরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন তা শুধু সাহিত্যেই নয়—ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে, দর্শনে, ব্যাপক জীবন-জিজ্ঞাসায়। এ কালের জন্য

একটু বলা বোধ হয় প্রয়োজন। গারোদির অভিমত ছিল: 'আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে কিছু নেই: শিল্পীর পক্ষে কোনো লাইন না মেনে নিজের মতে চলাই ভালো।' এরভের বক্তব্য: 'কমিউনিস্ট নন্দনতত্ত্ব বলে কোনো কিন্তু নেই।' কবি আরাগঁর দাবি ছিল: নন্দনতত্ত্বকেও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে। এটা না মানার অর্থ হল শ্রেণীসংগ্রামে শিল্পের দায়িত্বকেই প্রায় অস্বীকার করা। গারোদি-এরভে পন্থার সমর্থক ছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দে গোষ্ঠী। অন্য দিকে সেদিন বাঙলার তরুণ প্রগতি-ভাবুক শিল্পীদের প্রশ্ন ছিল—সাম্যবাদী দর্শনে সুগভীর বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা যে প্রগতি-শিবিরের শামিল হয়েছেন সে কি রাজনৈতিক সংগ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকবে?—অথবা তার গভীর প্রত্যয় নূতন শিল্পসাহিত্যধারার প্রবর্তন করবে? এপক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন খ্যাতনামা অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর বক্তব্য ছিল: 'নতুন কালের নতুন নন্দনতত্ত্ব গড়ে ওঠে নি—গড়ে উঠবে।' সাহিত্যের ইতিহাসনিষ্ঠ ছাত্রমাত্রেই জানেন—সামন্তযুগের নন্দনতত্ত্বের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য থেকে বুরজোয়া যুগের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য আলাদা: সেই ধারাতেই, যে নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটছে তার নন্দনতত্ত্বের মান স্বতন্ত্রই হবে। তার কষ্টিপাথরে সে শুধু অতীতকে যাচাই করেই তার কাজ শেষ করতে পারে না—তার বর্তমানও সে যাচাই করবে ভাবী কালের জন্য। পক্ষে-প্রতিপক্ষে এই প্রথম দুটি পন্থার আবির্ভাব ঘটল। আর জোড়া লাগে নি। যাই হোক, এ প্রসঙ্গের আলোচনা চিন্মোহনবাবুর বইতে অতি অল্প মাত্র হলেও "সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ প্রসঙ্গে" তিনি গারোদি ও লুকাচকে নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনা করেছেন। একালের পক্ষে সেগুলির আরও বিস্তৃত আলোচনা আর বিতর্কের প্রয়োজন আছে।

সূত্রপাত থেকেই 'প্রগতি লেখক সংঘের' আন্দোলন ১৯৩৫ সালে রোমাঁ রোলাঁ-আঁরি বারবুস-গোর্কির আহ্বানে অনুষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রথম ফ্যাসিস্টবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। পরবর্তী বছরগুলিতে সে সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে। সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এমন দলবদ্ধ হয়ে নতুন একটা ভাবাদর্শের আলোচনা বিতর্ক এবং সৃষ্টি-প্রচেষ্টা আন্দোলন বাঙলাদেশে আর কখনো ঘটে নি। তার সাফল্যের কথা অজস্র। চিন্মোহনবাবুর বই তার অনেক কথায় পরিপূর্ণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডা নীহাররঞ্জন রায়ের সেই মোক্ষম প্রশ্নটির জবাব লেখক এড়িয়ে গেছেন। প্রশ্নটি হল: নবীন সৃষ্টির এত প্রত্যাশার সঞ্চার হঠাৎ থেমে গেল কেন?

একথা আর নতুন করে জানাবার দরকার নেই যে, প্রতিষ্ঠানগতভাবে প্রগতি লেখক সংঘের উৎসাহের এবং নতুন সংস্কৃতিভাবনার উৎস ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং মার্কসবাদ-প্রত্যয়ী সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু ভাবুকের দল। যে তিরিশের দশকে ভারতের মাটিতে তার প্রতিষ্ঠা (দ্রষ্টব্য "প্রগতি লেখক আন্দোলনের পৃষ্ঠপট," পৃ ৮৯), সেকালে ইয়োরোপে একদিকে সাম্রাজ্যবাদেরই চরম আর নিকৃষ্ট রূপান্তর 'ফাসিস্টবাদের' উত্থান ঘটেছে—তেমনি অন্যদিকে কিছু মহৎ মানবতাবাদী শান্তিকামী সংস্কৃতি-ভাবুকদের এবং সাম্যবাদী আর সাচ্চা গণতন্ত্রবাদীদের নিয়ে গঠিত 'প্রতিরোধশক্তির কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। প্রতিরোধের তরঙ্গ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-দলিত ভারতের জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে নতুন মেজাজের সুর যোগ করেছে—১৯৩৬-এর লখনউ কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতা স্মরণীয়। রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের কথা থাক। সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তে দেখা যায় হিটলারের প্রথম আঘাত, যেদিন বার্লিনের পথে তার নাৎসি বাহিনী বিশ্বের তাবৎ শ্রেষ্ঠ লেখকদের বইয়ের বহ্ন্যুৎসব করল, বোধ করি এক নীৎসেবাদে। সে ১৯৩৩ সালের কথা। সংস্কৃতিমনা মানুষমাত্রেরই সেদিন ফ্যাসিস্টবাদের স্বরূপ বুঝতে দেরি হয় নি। তার সংস্কৃতিবিধ্বংসী, শান্তিবিধ্বংসী আগ্রাসন-নীতি স্পষ্ট হতে লাগল দিনে-দিনে। মুসোলিনি আবিসিনিয়া গ্রাস করল, স্পেনে ঘটল ফ্রাংকোর উত্থান, জাপান আক্রমণ করল চীন। তিরিশের দশকের এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভারতের সংস্কৃতিভাবুকেরা 'প্রগতি লেখকসংঘে'র ডাকে সেদিন সংঘবদ্ধ হয়েছেন। তার মূল আয়োজক কমিউনিস্ট পার্টি আর সাম্যবাদী ভাবুকেরা হলেও, সেই সঙ্গে ছিলেন সাচ্চা গণতন্ত্রবিশ্বাসী ভাবুকেরাও। এখানে লেখক সংঘ ছিল বস্তুত পার্টির গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। ইয়োরোপে তার অনেক আগেই রোলাঁর নেতৃত্বে দেশে-দেশে গড়ে উঠেছে ওই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতিরোধ। প্রতিক্রিয়ার মুখব্যাদান যত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে সেদিন প্রগতিভাবনার কেন্দ্রগুলিতে প্রতিরোধের শক্তি তেমনি দানা বেঁধে উঠেছে। প্রকৃতিজগতে এই হল বাঁচার অলিখিত নিয়ম, সভ্যতা অগ্রসর হওয়ার নিয়ম। প্রসঙ্গত, এ শতাব্দীর শেষ বড়ো ভাবুক রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি মনে পড়ে: মানবসমাজের ভাব ও ভাবনাগুলো বাতাসে ওড়া বীজের মতো ভেসে বেড়ায় এবং জমি ও অনুকূল আবহাওয়া পেলে তা অংকুরিত হয়ে ওঠে, তা কোনো বিশেষ দেশ ও জাতির সম্পত্তি নয়—সে সর্ব জাতির। তিরিশ-চল্লিশের দশক বোধ করি সারা বিশ্বে সেই জমি আর অনুকূল পরিবেশ। সে-আনুকূল্য যে বাঙলাদেশের ভাব ও ভাবনার জগতেও ছিল গুপ্ত—তার বাস্তবরূপ একদিন স্পষ্টরূপে দেখা গেল। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ। ঢাকায় ফাসিস্ট-বিরোধী এক মিছিল পরিচালনকালে তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ফাসিস্ট গুণ্ডার হাতে নিহত হলেন। সে ঘটনায় ধিক্কার উঠল বাঙলার তাবৎ ভাবুক-ও লেখক-সমাজ থেকে। বস্তুত, বাঙলাদেশে সাধারণভাবে সাহিত্যসংস্কৃতির ভাবনা তখন রাজনীতি থেকে বেশ দূরেই অবস্থান করত। ওই ঘটনার পর রাজনীতি আর সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাবনা কাছাকাছি এগিয়ে এল, ঘনিষ্ঠ হল। সাম্যবাদী ভাবনায় ইতিমধ্যে যাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করেছেন তেমন ভাবুক শিল্পীরা কালের প্রয়োজনে শুধু প্রচার-সাহিত্য বা সংগীত নয়, নতুন কালের নতুন কালের নতুন মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাঙলাদেশে সাহিত্যসংস্কৃতিভাবনার একটা এমন ঐতিহ্য ছিল যা একটা প্রাদেশিক ভাষার পক্ষে বিশেষ গৌরবের। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সে ধারা বয়ে এসেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ—যাঁর ভাবনার মধ্যে শুধু বিশ শতকের প্রথম চারটি দশক নয়, উনিশ শতকের শেষ দুটি দশক এবং তারও আগে ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য—তাঁর প্রতিভার আধারে তা বিধৃত ছিল। বস্তুত, বর্তমান যুগের একজন সচেতন ভাবুক ও শিল্পী হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গে কোথাও তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে, কোথাও কিছু গ্রহণ করতে হয়েছে, কোথাও অনেক কিছু বর্জন করতে হয়েছে, কোথাও দেশের আবহাওয়ায় সামঞ্জস্য করতে হয়েছে। একাজে প্রশংসার চেয়ে নিন্দা পেয়েছেন ঢের বেশি। এর মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের যৌবনকালের সংকটে এগিয়েই এসেছেন, পেছোন নি বা থেমে যান নি। যেদিন তাঁর এ যাত্রা থামল—একজন নগণ্য প্রগতি-ভাবুক হিসেবে জানি, সেদিন এই চিন্তাই ছিল—কেমন করে তাঁর অগ্রগতির থেমে-যাওয়া ধারাকে নতুন কালের, নতুন বিশ্বাসের, সমাসন্ন নতুন জগতে টেনে নেওয়া সম্ভব হবে। বস্তুত তাঁকে বাদ দিয়ে সাহিত্যে গর্বের এমন কী বস্তু ছিল তিরিশের দশকে; আনন্দ নয়—আত্মসুখপরায়ণ দেহবাদ, দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজম, পেলব অতিরোমানটিকতা ছাড়া? রবীন্দ্র-বিরোধিতা ছিল কিন্তু তার আসল শিরদাঁড়ায় জোর ছিল না—ছিল গলায় মাত্র। অন্যদিকে পরাধীনতার তুষানল। এই পরিবেশে একটা হতাশার সৃষ্টি স্বাভাবিক। এই হতাশাকে ভাঙতে পেরেছিল 'প্রগতি লেখক সংঘ'। মাতিয়ে দিতে পেরেছিল তার সুরকার-সংগীতকারকে, তার নাট্যিয়া-নাট্যকারকে, তার কবি-শিল্পী-কথাকারকে। আরও একটা মহৎ ঘটনা ঘটেছিল—তা হল ১৯১৭ সনের সোভিয়েত বিপ্লব। তার প্রেরণা এবং নব নব সম্ভাবনার প্রত্যাশায় যেমন দুলেছিল প্রগতি-শিবির, তেমনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। শুধু অধ্যাপক সুরেন্দ্র গোস্বামী প্রমুখের দৌত্যই টেনে তাঁকে আমাদের প্রগতি-ভাবনার কাছাকাছি আনে নি। এ সম্পর্কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে লেখা 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে ২, ৪, ও ৭ নং কবিতায় তার চিহ্ন পড়ে রয়েছে। তাঁর স্বীকারোক্তি: 'মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি; একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি।' সে কোন্ পক্ষ? বলার অপেক্ষা রাখে না—যে-পক্ষে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন। যেকালে এ পক্ষ তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেকাল তাঁর একক উপলব্ধি, একক সাধনায় অর্জিত। বলতে দ্বিধা নেই—একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং মনীষার পক্ষেই তা সম্ভব। তিরিশ-চল্লিশের দশকে প্রগতি-ভাবনার শিল্পী কর্মীরা 'বহু'র প্রচেষ্টায় অর্জিত সে উত্তরাধিকারের বুনিয়াদের উপর নতুন শিল্প-সৃষ্টির কারখানায়, নতুন কালের মালমশলার অনুসন্ধানে যখন নিমগ্ন, উৎসাহ যখন তুঙ্গে—তখনই এক আঘাত: যে রাজনীতির বুনিয়াদ ছিল তলার বাঁধুনি—শিল্প-সাহিত্য-ভাবনা ছিল উপরের superstructure, ১৯৪৮ সনের পরিবর্তিত কমিউনিস্ট পার্টি লাইনের রাজনীতি সাহিত্য-শিল্প-ভাবনার ঘাড়ে চেপে বসতে চাইল। ডাকসাইটে কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন 'রবীন্দ্র গুপ্ত' ছদ্মনামে যে ফতোয়া দিলেন তাতে আমাদের ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যের অহংকার চুরমার

করে খাড়া করে দিলেন দীনবন্ধু মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাসীপিসী' ও 'পেট ব্যথা'—এবং ননী ভৌমিককে, যাঁর কোনো রচনার অবিশ্যি উল্লেখ ছিল না। বেচারির সেদিনের কাঁচুমাচু মুখটা আজও মনে পড়ে। আপাতত রাজনৈতিক ভ্রান্ত নেতৃত্বের আলোচনার জায়গা এ নয়। তবে সেদিনকার ভ্রান্ত রাজনীতিগত সাংস্কৃতিক পরোয়ানা বাঙলার প্রগতিমূলক সংস্কৃতি-ভাবনা আর উৎসাহের মূলে সবলে আঘাত করল। ফলে এক দশকের চেষ্টায় যা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল তা নস্যাৎ হয়ে গেল। দেখা দিল ভীরুতা, সংশয়, দেখা দিল অনাস্থা—অশ্রদ্ধা—অবিশ্বাস। যেকালে এটুকু গড়ে উঠেছিল—স্বীকার করতেই হয়, সেকালের পার্টি সেক্রেটারি ছিলেন পূরণচাঁদ যোশী। তাঁর রাজনৈতিক পন্থা পর্যুদস্ত করতে গিয়ে ভবানী সেন মহাশয় জানালেন—সংস্কৃতিগতভাবে সেকালে যা-কিছু হয়েছে, সব সংস্কারবাদী। অমিত সেন ওরফে অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর 'নোটস অন বেঙ্গল রেনেসাঁস' নিয়ে বাদ গেলেন না। ভবানী সেন মশায়ের ১৯শ শতাব্দীর সাহিত্যবীক্ষার জবাব লেখা এবং ছাপার অপরাধে স্বদেশ বসু ওরফে ছাত্রনেতা শান্তি বসুকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ প্রায় বউকে মেরে ঝি-কে শেখানো হল। সংস্কৃতিভাবনার নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন—উপরোক্ত বহিষ্কারের ঘটনায় বোধ করি সেই মুহূর্তে সতর্ক হলেন, নীরব রইলেন। কিন্তু স্পষ্ট করে বলা দরকার সচেতন অংশ নিষ্ক্রিয় রইলেন না। তার কথা পরে।

প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে ওই সময়টা ছিল বড়ো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, এই আমার ধারণা। ওই সময়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ১৯শ শতকের সেই সময়ের সঙ্গে যখন বাঙলা সাহিত্যে ইয়োরোপের বুরজোয়া ভাবধারার মিলন-মিশ্রণ এবং সামঞ্জস্য করার চেষ্টা চলছে—বঙ্কিম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাকে আখ্যা দিয়েছেন 'নব ভাব'-এর সম্মিলন। ৩০-৪০-এর দশকে সেই রকম একটা 'নব ভাবে'র সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটছিল—সে ভাব সাম্যবাদ, রাশিয়ায় 'সোভিয়েত' প্রতিষ্ঠার পর যা এক নতুন সভ্যতার দিশারি। সেকালে বঙ্কিমের মানে (standard) সাহিত্যে ইতিহাসে দর্শনে শিল্পসৃষ্টিতে—তাবৎ মানবিক জিজ্ঞাসা বিষয়ে কেউই ছিলেন না প্রগতি-শিবিরে, তবে ছিল যুগোপযোগী 'বহু'র প্রচেষ্টা। মধ্যবিত্তিক চটজলদি বিপ্লববাদের পথে ভবানী সেন মহাশয়ের অধীর, প্রাজ্ঞ, সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের ডাক 'মাত্র প্রস্তুতিকালের' নরম শিরদাঁড়া সইতে পারল না। সমাজতাত্ত্বিকেরা জানেন—বহু প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলির মাথা যত দ্রুত নড়ে পা তত দ্রুত নড়ে না। সেখানে পায়ে মাথায় মিলনের কাজ সময়সাপেক্ষ। আজও তাঁদের বুকের হাড় নড়ে যাচ্ছে যাঁরা সে লড়াই করছেন। সেদিন অতর্কিত অধীরতার আঘাতে সামান্য সুফলটুকু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শিল্পীর মনে এল সংশয়।

চিন্মোহনবাবু একালের কোনও পরিচয় দেন নি—সৃষ্টিসংকটের মর্মে প্রবেশের চেষ্টাও দেখি না। অবশ্য তাঁর কথা—'শিল্পচর্চা তিনি করেন নি। তিনি সংগঠক।' এবং সংগঠক হিসাবে একালের জংগি লাইনের যে দুটি রচনা এ বইতে স্থান পেয়েছে—"সাহিত্য ও গণসংগ্রাম" এবং "শিল্প-সাহিত্যের সমস্যা : চীনের পথ", তাতে সংগঠক হিসাবে তিনি ভবানী সেন মশায়েরই প্রবক্তা। মোদ্দা কথাটা তার এই : আপাতত লেখা থাক—"ইতিমধ্যে সবাইকে যেতে হবে ফ্রন্টে।" ১৯৪৯-এ বোমবাইতে অনুষ্ঠিত সারা-ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনে বাঙলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম আমি আর অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ। প্রথম দিনের অধিবেশনে, বর্তমান শাবানা আজমির পিতা প্রখ্যাত উরদু কবি কায়ফী আজমি আহ্বান জানালেন : 'আব্ কলম ফেঁক দো—তলোয়ার লে লো।' মুলুকরাজ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্তব্ধ, আহত। বাঙলাদেশের দুজন আমরা কোনরকম সামাল দিয়েছিলাম। এদিকে বাঙলাদেশে প্রগতি শিবিরের কিছু সংগঠক কবি তখন জেলে। বাইরের সংস্কৃতিভাবুকদের উদ্দেশ্যে জেল থেকে চিন্মোহনবাবু এবং 'তখনকার বিপ্লবী কবি' সুভাষ মুখোপাধ্যায় জংগি লাইনের সমর্থনে দুটি চিঠি পাঠান। কিন্তু প্রগতি শিবিরের ভাবুক শিল্পী ও চিন্তাশীলদের সচেতন অংশ ওই দুটো চিঠির আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ওই সচেতন অংশ নিয়মিত প্রায়ই মতবিনিময় করতেন কারুর না কারুর বাড়িতে, আলোচনা করতেন এবং আলোচনাশেষে লেখার দায়িত্ব নিতেন অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ, কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ক্রমে বহু সমদর্শী আলোচকের সমাগম হতে থাকে। দল ভারি হতে থাকে। প্রগতি শিবিরের আলোকশিখাটিকে সেই ঝড়ঝাপটায় তাঁরা জালিয়ে রেখেছিলেন। উলটে তাদের এ প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সময়ের ডায়রিতে তিনি মন্তব্য করছেন ব্যাপারটাকে 'নেতৃত্বের লোভ' বা ষড়যন্ত্র বলে। ব্যক্তিগতভাবে জানি—এসব লোভের অনেক উপরের মানুষ তাঁরা। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রগতিভাবনার ধারা নিরবচ্ছিন্ন ছিল। এ প্রচেষ্টার কোনও ইতিবৃত্ত নেই চিন্মোহনবাবুর বইতে। ভবানী সেন মশায়ের 'মতবদল' ও "রবীন্দ্রনাথ ও একটি শতাব্দী" প্রবন্ধটির দিকে তিনি সবলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বটে কিন্তু সে চার বছর পরের ঘটনা বোধ করি—অনাস্থার খাল দিয়ে ঘোলা জল তার মধ্যে গড়িয়ে গিয়েছে। এ হল গাছ কেটে গোড়ায় জল ঢালা। তা ছাড়া চিন্মোহনবাবুর উক্তি যদি সত্যি হয়—তাঁর প্রমুখাৎ শুনে ধনঞ্জয় তাঁর বইতে আমাদের জানাচ্ছেন, দিল্লীর সদর দপ্তরে পার্টির মহাফেজখানায় ভবানীবাবুর প্রথম ফতোয়ার দলিল অক্ষতই আছে—কোন সংযোজনও হয় নি, প্রত্যাহৃতও হয় নি। "মার্কসবাদী" নামক পত্রিকায় ওই ধারায় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ছদ্মনামে বের হয়। ওই পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে জানি, কয়েকটি (১০ / ১২) সাহিত্যসংস্কৃতি বিষয় বহির্ভূত প্রবন্ধ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী বলে পার্টি থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছিল কিন্তু ভবানীবাবু ও তাঁর সহযোগীদের সাহিত্যে জংগি মতবাদ প্রত্যাহৃত হয় নি। এদিকে চিন্মোহনবাবু অবশ্য ১৬৬৬ সালে "ফুল ও আগাছা" এবং ১৯৭৯ সালে লেখা "চীনের সংস্কৃতি বিপ্লব" দুটি প্রবন্ধে বোধ করি তাঁর মত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অতঃপর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় চরিত্রচিত্রের কথা। সেগুলি চিত্তাকর্ষক। শুধু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। আমার সাহিত্যের প্রথম পদচারণকাল থেকেই তাঁকে চিনতাম যখন তাঁর একটি কয়লার দোকান ছিল মনোহরপুকুর রোডে, যখন তিনি রচনা করে ফেলেছেন "চৈতালি ঘূর্ণি", আর "পাষাণ পুরী", যখন তিনি প্রগতি শিবির থেকে দূরে। ১৯৪৮ সালে পার্টি নীতি বদলের ফলে 'স্বাধীনতা' ও 'গণশক্তি' প্রেসে যখন তালা ঝুলল পুলিশের, তালা ঝুলল 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী'তে, 'পরিচয়ে' তখন স্বাক্ষর অভিযানে গণতান্ত্রিক বিধিসম্মত একটা প্রতিবাদের খসড়া নিয়ে লেখক-সাংবাদিকদের তরফ থেকে ছুটোছুটি করেছিলাম তারাশংকরের কাছে। বললেন—একবার পরামর্শ করি শৈলজা ও প্রেমেনের সঙ্গে। সে পরামর্শ বোধ করি কোনদিন ঘটে নি। বেশ কয়েকবার ছুটে একদিন জানলাম—তিনি লাভপুর চলে গেছেন।··· তারপর বোধকরি প্রগতি শিবিরের বহু দূরে, এমন কি প্রতিপক্ষে।

বর্তমান অবস্থায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' না থাক, প্রগতি-ভাবনার ভাবুকরা আজও আছেন। হয়তো আজ প্রথম কালের নব জোয়ারের উচ্ছ্বাস নেই। কিন্তু চিন্তা, বিতর্ক, অনুসন্ধান আর মার্কসীয় ধ্যানধারণার কষ্টিপাথরে অতীত ও বর্তমান সাহিত্যকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা আজও অব্যাহত। এ কাল আরও ঘুলিয়ে-ওঠা। প্রদীপ যত নিভে আসে তত তার তেল উৎকট গন্ধ ছড়াতে থাকে। একটা অবক্ষয়িত যুগের সেই উৎকট গন্ধ আজ তথাকথিত মামুলি সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। সেখানে হঠাৎ এক লেখককে নিয়ে চিন্মোহনবাবুর বিতর্কিত greatest বা great-এর ফরমুলা প্রগতিবোধ সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। কথাটা 'প্রগতি' যে—প্রকৃষ্ট যার গতি। চরিত্র যার বিধায়ক। সৃষ্টিতে—নতুন সৃষ্ট ব্যক্তিত্বে, কথাসাহিত্য ও নাটক প্রসঙ্গে। হাজার তিনেক বছরের নন্দনতত্ত্বের মোদ্দা ইতিহাস এই কথা বলে—যুগ ও আদর্শ বদলে যায়। এই নবীন সৃষ্টির স্বপ্ন একদিন দেখেছিলেন প্রগতি শিবিরের শিল্পীরা। তার এত কথা, এত দ্বন্দ্ব-অন্তর্দ্বন্দ্ব, এত নিন্দা ও অস্বীকার, এত অপঘাত ও মৃত্যুও, তার সব কথা না হোক—যা কিছু চিন্মোহনবাবু তাঁর বইতে দিয়েছেন তার জন্য অবশ্যই তিনি ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার মনে হয়। প্রগতিভাবনার গতি আজও থামে নি—সে যে নামেই হোক (যেমন, গণতান্ত্রিক লেখক সংঘ), অথবা যাঁরাই হোন। আমাদের কালের অভিজ্ঞতা থেকে এবং ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইংরাজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক সমালোচক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও হিরণকুমার সান্যালের সাহচর্য, অভিজ্ঞতা—ব্যক্তিগত নানা জিজ্ঞাসা ও বিতর্ক থেকে এটা বুঝেছি, সাহিত্যে প্রগতিভাবনার আন্দোলন আর সৃষ্টি—দুটি ধারা। সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই হয় আন্দোলন। কিন্তু সে সৃষ্টিতে যদি খাদ থাকে, ভেজাল থাকে, তাতে বুঝতে যদি ভুল হয় তা হলে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। আন্দোলন শুধু লোক জড়ো করা নয়—বহু

মাননীয় ব্যক্তিও প্লাটফর্মের সন্ধানে ছুটে আসেন। শিল্পীর কর্তব্যও বড়ো দুরূহ। এ কথা অনস্বীকার্য—মার্কস-বাদ শিল্পী-ভাবুকের কাছে এক জীবনদৃষ্টি, সে দৃষ্টি আজ সব অস্পষ্টতা দূর করে বিশ্বকে স্পষ্ট করে তুলেছে। কোনো এক ঢঙে নয়—সমাজ-জীবনের নানা পরিবারের ও গোষ্ঠির থেকে নানা শিল্পী আসবে তাদের বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গি আর অভিজ্ঞতা নিয়ে; আর স্বাতন্ত্র্য থাকবেই। তার সীমাবদ্ধতাও থাকবেই। নবযুগের সমালোচক-ধাত্রীরা যথার্থ ধাত্রীর মতোই নবজাতকের পরিচর্যা করবেন—ভাবীকালের জন্য তাকে সবল আর দীর্ঘায়ু করে তুলবেন। শিল্পীদের মধ্যে কেউ-কেউ তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে থাকেন। তা করুন। কিন্তু শিল্পের নান্দনিক আবেদনের চেয়ে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দায়টাই যদি বড়ো হয়ে দেখা দেয়—তবে আর যাই হোক, সে সৃষ্টির আবেদন সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। যাকে বলে মুদ্রাদোষ—ম্যানারিজম, সাহিত্যে শিল্পে তা নিন্দিত। অন্তত সাহিত্যে তাকে বড়ো স্থান দেওয়া যায় না। ছটি কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা সাহিত্য, তার নান্দনিক আবেদন এত দীর্ঘস্থায়ী আর সর্বগ্রাসী, যে আর কোনো কলায় দেখা যায় না। সৃষ্টির সে-নৈপুণ্য আমাদের শুধু মুগ্ধ করে না, তা আমাদের মানবচেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করে। সেকালের ধ্বনি ও রস তাকে না-ই বললাম, একালে কী নাম তার হবে জানি না—বলতে পারি চরম রসসৃষ্টি। সে রসসৃষ্টিতে পৌঁছবার উপায়টাই যদি বড়ো হয়ে দেখা দেয়—ভাবী কাল কেন, বর্তমানও তাকে গ্রহণ করবে না। গোটা উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে।

সুশীল জানা

কবি জীবনানন্দের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভারত বুক এজেন্সি. কলিকাতা-৬। ১৯৮৬। ষাট টাকা।

জীবনানন্দের অনুরাগী পাঠকগবেষককে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক তাৎপর্য-পূর্ণ গ্রন্থ উপহার দিলেন। জীবনানন্দ-সম্পর্কিত অজস্র লেখার প্রাসঙ্গিক চয়ন এবং শেষাশেষি প্রয়োজনীয় অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা—নিজস্ব নির্মোহ মতামতের চালচিত্রে তাদের বর্ণময় বিন্যাস চমৎকার। ভাবীকালের যে-কোনো সতর্ক অনুসন্ধানীর কাছে এই পরিশ্রমী প্রয়াস প্রেয় প্রেরণা—অনেকটা মেটাফিজিক্যাল কবিদের কাছে কিং জেম্‌স্‌-এর বাইবেল ভাষান্তরণের মতো উৎসগ্রন্থ। একসঙ্গে এত বিচিত্র তথ্যের সুচারু পরিবেশনের গুরুত্ব বিরাট, আশাতীত এবং বলা বাহুল্য আদর্শস্থানীয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর "কালের পুতুল"-এ (১৯৫৫ সালে প্রকাশিত) লিখেছিলেন : 'বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর (জীবনানন্দের) আসনটি ঠিক কোথায় সে বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে, এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেইসব নাবালকদের হাতে, যারা আজ জীবনানন্দের স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে।' বুদ্ধদেব এই মুহূর্তে জীবিত থাকলে দেবীপ্রসাদকে সেই 'ঈর্ষাভাজন'দের প্রধানতম বলে চিহ্নিত করতেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদের স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন সমাপ্ত—জ্যোতি-বিকাশের পথে অন্যান্যদের হেঁটে যাওয়ার জন্য তাঁর সাদর নিমন্ত্রণ।

জীবনানন্দের জীবনকালের যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যের সংগ্রহ করেছেন দেবীপ্রসাদ, যদিও কিছু-কিছু অনায়ত্ত রয়ে গেছে যথেষ্ট যত্ন এবং শ্রম সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার জন্য। প্রথম ৩৮৪ পৃষ্ঠায় তিনি কবি-প্রসঙ্গে অজস্র লেখা, সমালোচনা, কবির কবিতা ও প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি সংকলন করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনানন্দকে লেখা পত্র দিয়ে এ প্রাসঙ্গিকীর শুরু এবং শেষ রচনাটি "সাহিত্যপত্র" পত্রিকায় প্রকাশিত আলোক সরকারের "জীবনানন্দ দাশের কবিতা" শীর্ষক আলোচনা। শেষ তিনটি রচনা কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বেরুনো। সম্ভবত এই তিনটি রচনা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে সংকলিত, যেহেতু ভূমিকাতে সম্পাদক-আলোচক দেবীপ্রসাদ এই গ্রন্থের সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন কবির জীবনকাল। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত জীবনানন্দ প্রসঙ্গে আরো অজস্র লেখা প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে কিছু রচনা মননশীলতায়, কবিতার রস-আস্বাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই, কিন্তু সম্পাদক-কৃত সময়সীমার দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করা অসঙ্গত বিবেচনা করি।

শেষ রচনা তিনটির একটি নরেশ গুহ-কৃত "শ্রেষ্ঠ কবিতা"র আলোচনা। স্মৃতির ছায়াচ্ছন্ন পথে ক্ষণিক পরিক্রমার পর তিনি কবিতা প্রসঙ্গে প্রখর হয়ে

উঠেছেন। তবে তাঁর একটি বাক্যবন্ধ সত্য নয় : 'জীবনানন্দ শুধুই কবিতা লিখেছেন, কবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখেন নি।' জীবনানন্দের উপন্যাস, ছোটোগল্প এবং প্রবন্ধের প্রকাশ পরবর্তী কালে আমরা দেখেছি। এমন কি জীবনানন্দের জীবনকালেও বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে সচেতন দেবীপ্রসাদ পরিমিত উচ্চারণে বলেছেন : 'জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের আরেক গন্ধধারা অতি প্রতিভান্বিত বলে গৌরবিত হতে দেখি, সে অধ্যায়ের সুরু আমাদের এই বইয়ের অন্তত বিশ বছর পর।' স্বভাবতই আদ্যন্ত এই গ্রন্থ কবি জীবনানন্দের আলোচনা বলে চিহ্নিত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন এবং "ধূসর পাণ্ডুলিপি" প্রসঙ্গে এই কথাই বিশদ করেছিলেন 'তাকিয়ে দেখবার আনন্দ' বলে। জীবনানন্দ-আগ্রহী ও প্রচারক বুদ্ধদেব বসুও প্রায় একই কথা বলেছিলেন : 'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।' পরে নানাভাবে 'অনামে এবং স্বনামে' জীবনানন্দের লেখাকে 'সোচ্ছ্বাস সংবর্ধনা করেছিলেন বুদ্ধদেব এবং এখন বিশেষ করে লক্ষ করতে হয় —এ ব্যক্তি বুদ্ধদেব কিন্তু সেই বুদ্ধদেবই "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-"বনলতা সেন"-পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "মহাপৃথিবী"র আলোচনায় বেশ অকরুণ : 'কোনো কবি যখন নিজের অনুকরণ করেন তখন দেবতারা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।' এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ লিখেছেন, 'জীবনানন্দের কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত বিশুদ্ধ সহজ আয়তনটিতে' বুদ্ধদেবের 'একাগ্র লক্ষ্য' ছিল। কিন্তু 'জীবনানন্দের উত্তর-পর্বের লেখা কবিজীবনের এক নতুন অঙ্ক বলে চিহ্নিত করেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য।' স্বপ্নমেদুর জগৎ ছেড়ে তখন জীবনানন্দ মেধা আর মননের পথে জটিলসমস্যা-ঘেরা জীবনের প্রতিভাস তুলে আনছেন কবিতায়—সেই কবিতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব প্রায়-নীরব। তবু জীবনানন্দ অভিযুক্ত হলেন অ্যানটি-মার্কসিস্ট কবি হিসেবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন, 'তাঁর কল্পনার স্বাধীনতা মানুষের হাতের শৃঙ্খলকে চিরস্থায়ী করে। মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট শিল্পতত্ত্বের সুকঠোর ও সরলীকৃত পার্টি-লাইনই আমাদের সাহিত্যে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু স্বয়ং লেনিনও বলেছিলেন যে শিল্পীচিত্তে বাস্তবের যে প্রতিফলন ঘটে সে ঠিক নির্বিশেষ বা সার্বভৌম হয় না, তাতে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে বিষয়ীরও ব্যক্তিগত বোধ বা ঈক্ষণ, শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কল্পনার বিশেষ ক্রিয়া ও শিল্পের বিশেষ আয়তনের স্থানও নাকচ করা যায় না। ১৯৪৯ সালে "পূর্বাশা" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কবি জীবনানন্দ লিখলেন : 'মার্কসীয় পদ্ধতিতে নির্ভুল প্রামাণ্য কবিতা আমি ঠিক জানি না জিনিসটি কি…'এই বিষয়ে দেবীপ্রসাদের সিদ্ধান্ত যুক্তি- ও তথ্য-নির্ভর—তিনি লিখেছেন—'সঙ্ঘ-শাসনের কিছু চাপ বা তাপ তাঁকে হয়তো ভোগ করতে হয়েছে।'

এরই সূত্র ধরে "কবিতা"য় বেরুনো (বৈশাখ, ১৩৪৫) জীবনানন্দের প্রবন্ধ "কবিতার কথা" (পরে সিগনেট থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) উল্লেখনীয়। 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করেছে। সাহায্য করেছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।' মূলত দীর্ঘ এই প্রবন্ধটির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের নিজস্ব কাব্যবোধ। এই প্রবন্ধেই তিনি কাব্যের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ, কবি কি লোকশিক্ষক, জীবনের পক্ষে কবিতার প্রয়োজন ইত্যাদি বহু বিতর্কিত প্রশ্নের উত্থাপন এবং তার উত্তর অনুসন্ধান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত কবিতা 'মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্যে শুধু—সকলের জন্যে নয়—অনেকের জন্যে নয়' এই পক্ষপাতটুকু দ্বিধাহীন জানিয়েছেন। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধের দীর্ঘ পাদটীকায় সুভাষচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি চিঠির উল্লেখ এবং উদ্ধার করেছেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল 'আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজ-লভ্য করতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয় তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে আর তাতে আর্ট নির্জিত ও খর্বই হয়ে যায়…'। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রপাঠান্তে যে মন্তব্য লিখে পাঠান তা শুধু চমৎকার নয়, শিল্প ও গণপাঠকের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক

পর্যালোচনা। পুরো চিঠিটিই উৎকলন-যোগ্য বিবেচনা করে সম্পাদক উৎসাহী পাঠকদের জন্য সংকলিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক-সঙ্ঘের ইশতেহার, মুন্সী প্রেমচন্দ-এর ভাষণ, অরুণ মিত্র-র কিছু কথাও উল্লেখ করেছেন। এই পাদটীকাতে সমর সেনের সেই বিখ্যাত উক্তিও সংকলিত: 'রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বলভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীকস্বর্গ।' এমনি আরো অজস্র তথ্যনির্দেশিকা ও পাদটীকা দেবীপ্রসাদের গ্রন্থটিকে অসম্ভব মূল্যবান করে তুলেছে। পাঠক তার নিজস্ব রুচি ও বিশ্বাসমত সিদ্ধান্ত নিতে নিশ্চিত আগ্রহী হয়ে উঠবেন এর ফলে।

'কল্লোলের শান্ততম কবি' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত অভিধা) তিরিশ দশকের 'নির্জনতম' কবি সমালোচনার আঘাতে শেষাবধি 'নিঃসঙ্গ' থাকতে পারেন নি এবং নানা গদ্যলেখায় সেই প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্তও। তাঁর বিখ্যাত 'সমারূঢ়' কবিতাও এমনি একটি প্রতিক্রিয়া। কাব্যজীবনের প্রথম পর্বে "শনিবারের চিঠি"র সজনীকান্ত দাস প্রায় প্রতি সংখ্যাতে যে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করেছেন জীবনানন্দকে (জীবানন্দ নয়) তা হয়তো এক অর্থে নিমের বাতাসের মতো উপকারী হয়ে দেখা দিয়েছিল। সজনীকান্ত একজন অক্লান্ত পড়ুয়া, যদিও তাঁর বিশুদ্ধ পাঠের মধ্যে পুরাতন সংস্কার ক্রিয়াশীল, তবু তিনি পরিহাস-প্রবণতায় জীবনানন্দের যে মূল্যায়ন করেছেন তার মধ্যে যাথার্থ্য সর্বাংশে না থাকলেও তা বুদ্ধদেবকে আরো জীবনানন্দ-আগ্রহী করে তুলেছিল। বিপ্রতীপভাবে সজনীকান্তের প্রহাস-প্রলম্ব-টিপ্পনী সময়-সময় বুদ্ধদেবের পর্যবেক্ষণ-আগ্রহী। দেবীপ্রসাদ এই-সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন এবং ১৯৪৩ সালের পরবর্তী কালে সজনীকান্তের 'অবৈর প্রণয়তা' লক্ষ করেছেন জীবনানন্দের জন্যে।

প্রথম পর্বের পটভূমি নির্মাণের পরে দেবীপ্রসাদ জীবনানন্দ দাশের বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত লিখেছেন। জীবনানন্দের কবিজীবনের বিকাশ-প্রসঙ্গে যে পশ্চাৎপটের বিন্যাস করেছেন তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা, দেশজ উপকরণ, রবীন্দ্র-নজরুল-সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-প্রভাবী পরিমণ্ডল থেকে শুরু করে ইউরোপ-আমেরিকার সাহিত্য থেকে গৃহীত প্রতীকযান, ভাব আর ভাষার উপস্থাপনা উল্লেখনীয়। জীবনানন্দের 'হাওয়ামণ্ডলে'র তলায় অনেকে কবিতা রচনা করেছেন—সমসাময়িক অনেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন, পরবর্তী কালে জীবনানন্দ তো একটি school। দেবীপ্রসাদ এই বিষয়েও একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায় লিখেছেন। জীবনানন্দের একটি প্রিয় প্রতীকযান 'ঘোড়া' যা সম্পাদককে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ রচনায় আগ্রহী করেছে। এই পর্যায়েই রয়েছে 'লাসকাটা ঘর' শীর্ষক একটি আলোচনা। পল এলুয়ার, হাক্সলি, হুইটম্যানের প্রসঙ্গ নিয়ে মূল্যবান বিচারও করেছেন প্রসঙ্গত।

কোথাও-কোথাও খটকাও লেগেছে। যেমন জীবনানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন 'আমাদের পরিবার খুব বড়—কিন্তু সাহিত্যপ্রীতি ও রচনারীতির উৎকর্ষ লক্ষ্য করেছি বাবার জীবনে। তিনি অনেক ইংরেজী ও দেশী বই কিনতেন ও পড়তেন, ভালো Library ছিল তাঁর; সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী যুবা ও প্রৌঢ়দের আনাগোনা ছিল তাঁর গ্রন্থাগারে। বাবা মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন তাঁদের বিদেশী ও দেশী সাহিত্য। নিজে বিশেষ কিছু লিখতেন না। যে কটি তাঁর রচনা পেয়েছি তাতে উচ্ছ্বাস কম—সংহতি বেশী' (পৃষ্ঠা ২৪৮-২৪৯)। কিন্তু দেবীপ্রসাদ 'বিকাশ প্রতিষ্ঠায় ইতিবৃত্ত' পর্যায়ে লিখেছেন 'বাবা সত্যানন্দ দাস ছিলেন নিয়মিত অনবচ্ছিন্ন নিবন্ধ রচয়িতা' (পৃষ্ঠা ৩৮৭)। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কে ঠিক? জীবনানন্দ কি পিতা সত্যানন্দ প্রসঙ্গে বিশেষ খবর-বার্তা রাখতেন না? আবার "নীলিমা" কবিতাটির প্রকাশের সময় দু জায়গায় দু-রকম বলা হয়েছে—৩৮৯ পৃষ্ঠায় ফাল্গুন, ১৩২২ এবং ৪৫৬ পৃষ্ঠায় ফাল্গুন, ১৩৩২। এ ছাড়া গ্রন্থশেষে উল্লেখ-পঞ্জিতে যৎসামান্য কিছু অসম্পূর্ণতাও রয়ে গেছে।

বুদ্ধদেব বসু একদা লিখেছিলেন, 'জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ; তিনি ঝড়ের মত উড়ে এসে পাঠকের মন এক দমকায় কেড়ে নিয়ে যান না। তাঁর কবিতা একটু ধীরে সুস্থে পড়তে হয়, এবং আস্তে আস্তে বুঝতে হয়।' জীবনানন্দের কবিতা এবং তাঁর মনের মায়ালোক বুঝতে গেলে এই গ্রন্থপাঠ আবশ্যিক এবং জরুরি। কবিকে ঘিরে যে অজস্র জিজ্ঞাসা আর অপরিসীম কৌতূহল একালীন পাঠকের মনকে আলোড়িত করে, তার অনেক উত্তর সতর্ক সম্পাদক দেবীপ্রসাদ মৌলিক বিশ্লেষণে আমাদের দিয়েছেন। নিশ্চিত করে বলা যায় জীবনানন্দ

প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা করতে গেলে এই গ্রন্থকে বাদ দিয়ে করা যাবে না।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

বাংলা গদ্যশৈলী : আদিরূপ

বাঙলা গদ্যচর্চা: বিদ্যাসাগরগোষ্ঠী—অপূর্বকুমার রায়। জিজ্ঞাসা, কলকাতা ৯। কুড়ি টাকা।

উনিশ শতকে বাঙলা গদ্যের রূপ-রীতি নিয়ে ভাবতে হয়েছে গদ্যসাধকদের। কিন্তু সে ছিল ছেদচিহ্নের স্বল্পতা, দুরান্বয়, শব্দব্যবহারের বিশেষত্ব এবং বাক্যগঠনপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়। অতঃপর রীতিগত বিচার। স্থান পেল রূপগত বৈচিত্র্য এবং প্রকারগত বিভিন্নতা। বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য নিয়ে ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও উনিশ শতকেই গদ্যের রূপ আবিষ্কারে নানাবিধ কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের অনুসন্ধানে স্রষ্টার আনন্দ বেদনা নির্দিষ্ট স্থূলার্থ ছাড়িয়ে উপার্জন এবং উপলব্ধি যে সৃষ্টিকে বাঙ্‌ময় করে তোলে তার স্বরূপকে চিহ্নিত করার আয়োজনই প্রধান হয়ে উঠেছে। সে আয়োজন যতিস্থাপনা, ভাষাসংগঠন, লিপিশরীর নিয়মবিশ্লেষণে আবদ্ধ নয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধে গদ্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন রাজনারায়ণ বসু এবং রামগতি ন্যায়রত্ন যথাক্রমে "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" আর "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে। উভয়েই প্রধানত গদ্য-বাক্যের বিভিন্নতা, শব্দপ্রয়োগ, সুবোধ্যতা ইত্যাদি বিষয়েই তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। গদ্যের শব্দ, বাক্যের অন্বয়ভঙ্গি, অনুচ্ছেদ-রীতি, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের দায়িত্ব ছাড়া পৃথক-পৃথক লেখকের বিভিন্ন মনোভঙ্গি, তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্বাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আলোচনা অনেক পরবর্তী কালের। যুক্তিবিশ্লেষণকে অতিক্রম করে গদ্যের ইন্দ্রিয়লভ্য বিভিন্ন চিত্ররূপও বাঙলা ভাষায় গদ্য-ভঙ্গির অন্যতম উপাদান—এসব আধুনিক কালের গবেষকদের আবিষ্কার।

গদ্যরূপরীতি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সূত্রপাত করেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। আচার্য সেনের 'Bengali Prose Style' (১৯১১)-এর পর গদ্য-বিষয় ও গদ্যরীতি নিয়ে আলোচনার আগ্রহ বেড়েছে সন্দেহ নেই। তবে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিশ শতকের আশি দশকের মাঝামাঝি বাঙলা গদ্য-রীতির আলোচনা এবং গবেষণায় মনোনিবেশ অপেক্ষাকৃত অধিক। এই পঞ্চাশ বছরের গবেষণাকর্মে অনেক বিদগ্ধজনের নাম মনে পড়ে।

এই কালসীমায় সকল গবেষকই তাঁদের আলোচনায় নৈপুণ্য, বিচার-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন। অনুসন্ধান করেছেন, সুনির্দিষ্ট নিয়মের শাসনহীন গদ্যে, গদ্যসাধকগণ কিভাবে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছেন। বিশ্লেষণ করেছেন বাঙলা গদ্যের ক্রমবর্ধমান বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য; নানা লেখকের গদ্যে প্রতিফলিত গাম্ভীর্য, বিস্ময়, কৌতুক, জিজ্ঞাসা, প্রচার ও ব্যাখ্যার সংকল্প, এবং গদ্যরূপের বিভিন্ন স্বাদ। বাঙলা গদ্যের ক্রম-পরিচয়দানে সৃজ্যমান গদ্যের আলোচনায় স্রষ্টার মানসিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছেন অনেকে। অনেকেই বাক্যগঠন, শব্দবিন্যাস, অনুচ্ছেদবন্ধনের বৈশিষ্ট্য খুঁজতে চেয়েছেন। সাধুভাষা চলিতভাষা প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের সংকল্পও লক্ষ করা গেছে অনেক গবেষকদের মধ্যে।

অপূর্বকুমার রায়ের 'বাঙলা গদ্যচর্চা ও বিদ্যাসাগরগোষ্ঠী' প্রবন্ধগ্রন্থ প্রসঙ্গে এসব কথা সততই এসে যায়। 'নিবেদন' অংশে লেখক জানিয়েছেন, 'বাঙলা গদ্যের অগ্রগতিতে বিদ্যাসাগরগোষ্ঠীর অনর্ঘ্য অবদানের বিষয়টি শৈলীশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভাসিত করতে সচেষ্ট থেকেছি।' সঙ্গে-সঙ্গে লেখক আমাদের সচেতন করেছেন, 'শৈলীশাস্ত্র বিষয়টি' 'সাগরপারের', এবং তা 'যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাপ্ত ও বিজ্ঞানসম্মত।' সাগরপারের শৈলীশাস্ত্র অর্থাৎ stylisties বা রীতিবিজ্ঞান বিষয়ে Graham Hough প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'How does the method advance our understanding of particular literary works or in a wider context of the phenomenon of literature itself.' এবং এই প্রশ্নানুসারেই বোধহয়, তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চান যে, শৈলীশাস্ত্র নিঃসন্দেহে ভাষা-অনুশীলনেই আবদ্ধ। দেখা গেল, ড. রায় তাঁর গ্রন্থের যে সাতটি অধ্যায়বিভাজন করেছেন তা যথার্থ শৈলীশাস্ত্রের অধীন। তাঁর আলোচনার সবিশেষ উল্লেখ্য বিষয়:

'বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্ক' (৩য় অধ্যায়) 'বিদ্যাসাগরগোষ্ঠীর রচনা : বাক্যসজ্জা' (৪র্থ অধ্যায়), এবং 'বিদ্যাসাগরগোষ্ঠী শব্দসজ্জা' (৫ম অধ্যায়)।

সমগ্র গ্রন্থের অধ্যায়বিভাজনে সতর্ক সমগ্র দৃষ্টির ছাপ রয়েছে। ড. রায় তাঁর অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত রেখেছেন এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে যে, 'এই গোষ্ঠীর (বিদ্যাসাগরগোষ্ঠী) গদ্যকারদের সংস্কৃত, ইংরেজি যুগপৎ চর্চা বাংলা গদ্যের সম্ভার বৃদ্ধিতে ও রচনাশৈলী বিকাশে' কিভাবে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। তবে দেখা যায় যে, ড. রায়ের মনোনিবেশের একাগ্রতায় ইংরেজি বিষয়, শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের তুলনা-ভিত্তিক বিশ্লেষণই সমগ্র গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে। উপযুক্ত অধ্যায়গুলি সহ 'বিষয়বস্তু : বিদ্যাসাগরগোষ্ঠীর গদ্যচর্চা' (২য় অধ্যায়), 'অনুবাদের নমুনা : বিদ্যাসাগরগোষ্ঠী' (৬ষ্ঠ অধ্যায়) আলোচনা অংশ এরকম ভাবনা গড়ে তুলতেই সাহায্য করে। বাঙলা গদ্যে ইংরেজি ভাষা এবং রচনারীতি প্রয়োগে বিদ্যাসাগরগোষ্ঠীর ঔৎসুক্য সম্পর্কে ড. রায়ের অধিকতর লক্ষ্য, উক্ত গোষ্ঠীর প্রকাশের ক্ষমতা ও নিজস্বতা বিষয়টিকে কিন্তু স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করে তুলতে পারেনি। ফলে, ৩য় অধ্যায়ের সূচনা অংশের মন্তব্য—'বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষা অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে আবদ্ধ,' অনালোচিত থেকে গেল।

'বিষয়বস্তু বিস্তারের সঙ্গে বিষয়ানুসারী ভাষা যে সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।'—লেখকের এই অভিমত যথার্থ। কিন্তু বিদ্যাসাগরগোষ্ঠীর সচেষ্টতা সেক্ষেত্রে কতটুকু? ড. রায় বিদ্যাসাগরগোষ্ঠী রূপে যাঁদের তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী গবেষকদের যে মন্তব্য দেখা গেছে, সেই মন্তব্য কিন্তু ড. রায়ের সপ্তম-অধ্যায়-সংমবলিত গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনায় খণ্ডন করা সম্ভব হয় নি। পূর্ববর্তী গবেষকগণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন,—এঁদের গদ্যচর্চার প্রয়াস ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীদের সঙ্গে তুলনায়। এবং এসব কারণেই—বিদ্যাসাগরের মতোই জাতীয় উন্নতির প্রয়োজনে ইংরেজি উৎস থেকে বাংলা গদ্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন, বা 'বিদ্যাসাগর তথা তাঁর গোষ্ঠীর অন্যান্য গদ্যকার জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি তথা জাতীয় উন্নতির তাগিদে লেখনী ধারণ করেছিলেন'—মন্তব্যগুলি যথেষ্ট যুক্তিবিচেনাপ্রসূত বলে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। বাঙলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পীর সবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,—'রুদ্ধভাষা আঁধারের থুলিল যবনিকা।' সেই গদ্যের সম্ভাবনার প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিদ্যাসাগরের 'অতিথি'রূপে চিহ্নিত করে ধন্য হয়েছেন। উচ্চারিত হয়েছে—'ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমার অতিথি।

শৈলীশাস্ত্রের অধীনে ভাষার আলোচনায় সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের বিদ্যাসাগরের সমগোত্রীয়রূপে উন্নতিকরণ ড. রায়ের প্রয়াস (৩৫ পৃষ্ঠা) সম্পর্কে বলতেই হয় যে, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাখ্যান, সাংবাদিকতার গদ্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার চর্চা বিদ্যাসাগরের ধারাতেই পুষ্ট হয়েছিল। ঐ ধারার আশ্রয়ে বিদ্যাসাগর-গোষ্ঠী অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের অনুশীলন পরিমার্জিত হয় মাত্র। বাক্যগঠন, শব্দব্যবহার, প্রকরণবিশ্লেষণ অঙ্গ বা শরীরপরিচিতির পক্ষে ড. রায়ের প্রতুল প্রয়াস সত্ত্বেও একথা খণ্ডিত হয় নি যে, যে শব্দব্যবহার, বাক্যান্বয়চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে বৃহদ্বদ্ধ করা অসম্ভব বিদ্যাসাগরগোষ্ঠী বলে কথিত পণ্ডিতগণের সে অধিকার ছিল গৌণ এবং প্রায় অনুপস্থিত। সেই কারণেই ভাষার আলোচনায় বিদ্যাসাগরের স্নেহচ্ছায়া-পুষ্ট গদ্যকারদের বিদ্যাসাগরগোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করায় সুবিবেচনার যোগ কতটুকু,—এরকম প্রশ্ন এড়ানো সম্ভব হয় না।

ড. রায় তাঁর আলোচনায় প্রভূত ও বহুবিচিত্র পাঠনের পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য পর্বের গদ্যকারদের বিভিন্ন বই থেকে বহুবিধ উদাহরণ সযত্নে তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি শুধু সংখ্যাপরিমাণনির্ণয়ে আবদ্ধ থাকেন নি, প্রত্যেক গদ্যকারদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং একটি ধারাবাহিক ক্রম আবিষ্কারে লক্ষ্য স্থির করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানসিদ্ধ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রশংসনীয়। 'অনুবাদের নমুনা : বিদ্যাসাগরগোষ্ঠী' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়টি মূল্যবান সংযোজন; তবে এই অধ্যায়টি বিস্তারের সুযোগ লেখক গ্রহণ করেন নি। শৈলীশাস্ত্রের অধীন গদ্য আলোচনা এখনো সীমিত পরিসরে আবদ্ধ, ড. রায় তাঁর গ্রন্থে সার্থক সামর্থ্যের সংযোজনে উত্তরসূরীদের কাছে এই সীমাবিস্তৃতির আমন্ত্রণ জানালেন।

কান্তি গুপ্ত

থিয়েটার-কর্মীর চোখে সমালোচক

বেশ কয়েক বছর ধরে থিয়েটার-থিয়েটার করে ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে উঁকি দিচ্ছি। থিয়েটার এখানে যাওয়া হচ্ছে সত্যিকারের থিয়েটার-সমালোচকের দর্শন একেবারেই হচ্ছে না। থিয়েটারের সঙ্গে যাঁরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন তাঁরা প্রত্যেকে এটা উপলব্ধি করেন। শুধু উপলব্ধি নয়, সত্যিকারের সমালোচক না থাকলে থিয়েটারের উন্নতি হবে না। গত দশ বছরে কলকাতায় যে এখানকার গ্রুপ থিয়েটার এবং ব্যবসায়িক মঞ্চের পাশাপাশি সর্বভারতীয় থিয়েটারের একটা চেহারাও কলকাতা থিয়েটার-প্রেমীরা চাক্ষুষ করতে পারছেন। মহারাষ্ট্রের নাটক বাঙলায় অনূদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। বিজয় তেণ্ডুলকর এখানে খুবই জনপ্রিয় নাট্যকার। হিন্দির "অন্ধযুগ" অথবা কানাড়ি ভাষার "হয়বদন" (ঘোড়ামুখো পালা) এখানে তার নিজের ভাষা ছাড়াও বাঙলা ভাষার চেহারা পেয়েছে। কিন্তু থিয়েটারের একটা নিজস্ব ভাষা থাকাতে অন্য ভাষার নাটকও তার মূলা নিরূপণ করতে আমাদের সাহায্য করে। উচ্চাঙ্গের থিয়েটার হবার জন্যই এখানে তার সমাদর পেয়েছে। ডাঃ শ্রীরাম লাগু, সদাশিব অমরপুরকর, সুহাস যোশী অভিনীত বিজয় তেণ্ডুলকরের মারাঠি "কন্যাদান" নাটক সদাশিব অমরপুরকরের পরিচালনায় মারাঠি-না-জানা বাঙালিদের মোটামুটি আয়ত্তে এসেছে তার থিয়েটারি প্রসাদগুণের জন্য। হাবীব তনবীর এখন আমাদের ঘরের লোক হয়ে গেছেন। তাঁর ছত্তিশগড়ি ভাষায় তৈরি "চরণদাস চোর" কাহিনী এখন বাঙালির ঘরে-ঘরে সমাদৃত। নভেম্বর ডিসেম্বরে নান্দীকার ও দিল্লীর সন্দীত নাটক অকাদমীর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় উৎসব হয়েছে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ও রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। সেখানেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নাটকের দলের সঙ্গে হাবীব তনবীর, ডাঃ জব্বর প্যাটেল, বি. ভি. কারন্থ, এম. কে. রায়না, বি. জয়শ্রী প্রমুখ তাঁদের নূতন আর পুরানো নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। রাজ্য সরকার নতুন মঞ্চ করেছেন প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ করে বাগবাজারে গিরিশ ঘোষের বাড়ির কাছে। তাই তার নাম গিরিশ মঞ্চ। আরো নতুন মঞ্চ করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে। থিয়েটারের উন্নতিকল্পে একটা সংহতি রক্ষার চেষ্টায় সমালোচকদের ভূমিকা এখন একটা মস্ত ভূমিকা। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই আলোচনা।

নাটক

শিশির ভাদুড়ীর আক্ষেপ ছিল, 'আমাদের দেশে নাট্য-সমালোচনা সাহিত্যের পর্যায়ে তোলা দরকার। ইংরেজি কাগজে নাটক বর্জন করাই হয়েছে।'

বিশেষ শিক্ষিত ভিন্ন নাটক-সমালোচনা সাহিত্য হবে কী করে? বিলেতে নাটক সমালোচনা করে উচ্চাঙ্গের সমালোচনা-সাহিত্য বানিয়েছে, আমাদের দেশে তেমন হল কই? আমরা সবাই এই মুহূর্তে এক জায়গায় আটকে আছি এটা কিন্তু মনে-মনে সকলেই স্বীকার করি, মুখে বলি আর নাই বলি। ইউরোপ-আমেরিকায় সমালোচকরা অনেক এগিয়ে ভারতে পারেন, আমাদেরই কেবল বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। থিয়েটার-সমালোচকরাও সৃষ্টিশীল সমালোচনার দিকে একবারও ঝুঁকলেন না। হয়তো চেষ্টা করেও পারলেন না। আসলে তাঁরা তো কেউ থিয়েটারের লোক নন। থিয়েটারের সমালোচক অথচ থিয়েটারের লোক নন, এটা কেবল ভারতবর্ষেই সম্ভব।

থিয়েটার সম্পর্কে জারমানির আরউইন পিসকাটরের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত বর্তমানে নিউইয়র্কবাসী জারমান ইহুদি ওলফ্‌গঙ রথের বক্তব্য হল, Theatre is not literature. It is an extension of literature through the devotion and work of many craftsmen who are not necessarily men of letters but are guided by theatre instinct and knowledge, not by literary or dogmatic theories.

দিল্লীতে বছর পনেরো আগে থিয়েটারের কর্মীদের সঙ্গে থিয়েটারের লড়াই লেগেছিল (অবশ্যই কাগজে-কলমে)। এখনও লাগে মাঝে-মাঝে। কলকাতায় তো লেগেই আছে। ১৯৮১ সালে পূর্ব জারমানির ওয়াইমার ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেকটর ফ্রিট্‌স্ বেনেডিক্টের নির্দেশনায় কলকাতার সাতটি নাটকের দলের সম্মিলিত প্রযোজনা বার্টল্‌ট ব্রেখ্‌টের 'গ্যালিলিও গালিলাই' নাটকে সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আর ধরণী ঘোষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আর শম্ভু মিত্র। এর ফলে কলকাতায় তুমুল চৈ-চৈ পড়ে যায়। একজন থিয়েটার-কর্মী হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের জঘন্য আচরণের

প্রতিবাদে আমিও সে নাটককে বয়কট করি।

বোম্বাইতেও থিয়েটার-কর্মীদের সঙ্গে সমালোচকদের যুদ্ধ লাগে মাঝে-মাঝে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে 'দিল্লীর' ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা অ্যানড এশিয়ান থিয়েটার ইনস্টিটিউট বম্বে, পুনে, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি শহরে তাদের অন্য নাটকের সঙ্গে একদা ব্রেশ্‌টের সহকর্মী বর্তমানে আমেরিকানিবাসী কার্ল ওয়েবারের পরিচালনায় 'ককেশিয়ান চকসার্কেল' (খড়িয়া কা ঘেরা) এবং ওয়াইমার ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেকটর ফ্রিট্‌স্ বেনেডিক্টের পরিচালনায় 'থ্রি পেনি অপেরা' (তিন টাকা কী সয়াভ) মঞ্চস্থ করে এলেন। অল্প কিছুদিন পরেই কলকাতার নান্দীকার গোষ্ঠী 'তিন পয়সার পালা' দেখিয়ে এলেন বম্বেতে। "ধর্মযুগে"র কোনো সমালোচক লিখলেন দিল্লীর তুলনায় কলকাতার "তিন পয়সার পালা" অনেক ভালো। ফ্রিট্‌স্ বেনেডিক্টের তুলনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কম শক্তিশালী, এটা স্বীকারে কোনো লজ্জা নেই। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামাকে ছোটো করে দেখানোই হয়তো "ধর্মযুগে"র সমালোচকের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৭৭ সালে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার রেপার্টরি কোমপানি পাঁচটি নাটক করে গেলেন কলকাতার ডালহৌসি ইনস্টিটিউটের খোলা মঞ্চে এবং বিদ্যামন্দিরে। সমালোচকেরা তারস্বরে চিৎকার করে তাঁদের সমস্ত মনোবলকে দমিয়ে দিলেন। দাম্ভিক, উন্নাসিক বাঙালিরা নিজেদের শক্তি নিঃশেষিত দেখে এখন খালি আক্রমণকারীর ভূমিকায় নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। রেপার্টরির শক্তিশালী অভিনেত্রী ও পরিচালিকা মারাঠি মেয়ে উত্তরা বাওকর ১৯৮৪ সালে তাঁর নাট্যজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ সঙ্গীত নাটক অকাদেমীর পুরস্কার পেলে কলকাতার কাগজে তার জন্য এক কলমও ব্যয় করা হয় নি। এর থেকেই 'বাঙালি মানসিকতার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। কেয়া চক্রবর্তীর পর একমাত্র কাজল চৌধুরীর সঙ্গেই উত্তরা বাওকরের একটা তুলনা করা চলে।

কলকাতার "স্টেটসম্যানে"র সমালোচকও নান্দীকারের "তিন পয়সার পালা"র বিরূপ সমালোচনা করে বিরক্তির কারণ হয়েছিলেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ সমালোচক কেনেথ টাইনান পরে দুঃখ করেছিলেন যে তাঁর প্রযোজক বন্ধু অসকার হোনার স্টেনের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটল মৃত্যুর আগে আর তা জোড়া লাগল না। সুতরাং নান্দীকার-স্টেটসম্যানে আবার বন্ধুত্ব হোক, এটাই আমরা চাই। সমালোচনা কিভাবে লিখতে হবে সেটা শেখাবে কে? এখানে তো সমালোচকদের জন্য কোনো স্কুল নেই। থাকলেও কেউ ভরতি হবেন কিনা সন্দেহ। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামাতে স্কলারশিপ দেওয়া হয়, তাই সেখানে ছেলেমেয়েরা তিন বছর সময় কাটিয়ে আসেন। থিয়েটারকে পা-দানি করে অধিকাংশরাই সিনেমায় টেলিভিশনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রবীন্দ্রভারতীতে ডিগ্রী পাওয়াটাই এখন মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা এ দু জায়গাতেই পড়ে পাশ করে, তারা বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। আর সমালোচকরা এহেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা মাড়াবেন না, এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ তাঁরা তো সবাই পেশাদারি সমালোচক। এসব সমালোচকদের জন্য রাশিয়ার মতো যদি ড্রামাটিক লিটারেচর, ইতিহাস, আর্ট, সংগীত এবং দর্শনের ওপর পাঁচ বছরের পড়ার কোনো ব্যবস্থা থাকত, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের অভিনয়ও করতে হত এবং অভিনয়ের নির্দেশনাও দিতে হত, তাহলে দেখা যেত এক বছরও কেউ পূর্ণ করতে পারছে না। সেটা বড়ো কষ্টসাধ্য ব্যাপার হত। তার চেয়ে ভালো মন্দ কিছু নাটকের বই পড়ে তার সাহিত্যরস কিছুটা আস্বাদন করে থিয়েটার-সমালোচক তৈরি হয়ে যাওয়া অনেক সহজ। অনেকে আবার সেটুকুও করতে রাজি নন।

সিনিক ডিজাইন, থিয়েটার আরকিটেকচার, সাউনড ইনজিনীয়ারিং, কসটিউম ডিজাইন, মেক-আপ, মাইম, ডান্‌সকোরিওগ্রাফি, লাইটিং প্রভৃতি বিষয়ে বুঝবার চেষ্টা করেন না অনেকেই। সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা ছেড়েই দিলাম, খোদ আমেরিকাতে এমন একটিও বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানে ড্রামা ডিপার্টমেণ্ট নেই। প্রত্যেকটি ড্রামা ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে একটি করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ আছে। সেখানে সিন্ আর কসটিউম ডিজাইন শেখানো হয়। কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনটারন্যাশনাল ড্রামার জন্য একটি গ্র্যাজুয়েট স্কুল আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি অডিটরিয়ম থাকতেও সেটি ব্যবহারের অযোগ্য বলে ছাত্রছাত্রীদের অন্য মঞ্চের দ্বারস্থ হতে হয়। হাতেকলমে নাটক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই, এটা আশ্চর্যের হলেও সত্যি। প্রেসিডেনসি কলেজের বেকার হল (বর্তমান নাম ডিরোজিও হল) একেবারেই বেকার।

এদেশে ব্যাকস্টেজ টেকনলজি না বুঝেও যে-কেউ থিয়েটারের ভাষা বুঝতে পারে, যদি সে বাঙলা, ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠি দুকলম লিখতে পারে। অজিতেশবাবু একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, 'তিন বছর চেষ্টা করে ব্রেখটের কোনো নাটক অভিনয় করলাম, ক্রিটিকরা সেখানে অন্তত ছমাস পড়বে তো?' অজিতেশবাবুর কথায় অতিরঞ্জন থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু ক্রিটিকদের ছমাস অন্তত পড়া উচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি সভায় অজিতেশবাবু একবার বলেছিলেন যে, 'নাটক বৃহত্তম দর্শকশ্রেণীর জন্য, জনসাধারণের জন্য, এবং সমালোচক সেই জনসাধারণেরই একজন মাত্র, তাঁর ব্যক্তিগত ভালোলাগা, মন্দলাগায় কিছু যায় আসে না। বিষয়কে ছেড়ে আঙ্গিক নয়, আঙ্গিকের সঙ্গে বিষয়ের কোনো বিরোধ নেই। আনন্দবাজারের সমালোচক লিখেছেন ব্রেশ্‌টের "পুনটিলা"তে (শেখর চট্টোপাধ্যায়ের "পঙ্ক লাহা") শুধু চারলি চাপলিনের "সিটি লাইটের" ছায়া দেখতে পেয়েছেন তিনি। কিন্তু যেটা পান নি সেটা হল ফিনল্যানডের লোককাহিনী এবং হেলা উওলিজকির নাটকের একটা খসড়ার প্রভাব। আসলে গভীরে যাবার সময় নেই তাঁদের। (সুতরাং ভালো করে ব্রেশ্‌ট পড়ার কারোরই সময় নেই। তাই ব্রেশ্‌ট আর বেকেট মাঝে-মাঝে একাকার হয়ে যান।)

দৈনিক পত্রিকায় ব্যবসায়িক কারণে এবং জায়গার অভাবের জন্য লিটল ম্যাগাজিনে গুরুত্বপূর্ণ থিয়েটার-সিনেমার জন্য বেশ কিছুটা জায়গা বরাদ্দ করা হয়। যিনি অল্পদিনের ব্যবধানে তিন-তিনটে নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছেন একমাত্র তিনিই থিয়েটারের সমালোচনা লেখার অধিকারী। নাটকের বক্তব্য প্রগতিবাদী কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল হল, এ নিয়েই তাঁরা লড়ে গেলেন। থিয়েটারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিশেষজ্ঞ নেই, তার বোধহয় দরকারও নেই। সুতরাং অজিতেশবাবুর ক্ষোভের কারণ বুঝি। সব পরিচালক যেমন অজিতেশবাবুর মতো পরিশ্রমী নন, সব সমালোচকও তেমনি চালিয়াতি করে সমালোচনা করেন না।

গত পনেরো বছরে পশ্চিমবাঙলায় এবং ভারতের অন্যত্র একাঙ্ক নাটক-প্রতিযোগিতার প্রতি ঝোঁক খুব বেড়ে গেছে। মফস্সলের মানুষেরা অল্প পয়সায় প্রতিদিন চার-পাঁচটা নাটক দেখতে পান। স্থানীয় এবং বহিরাগত দলের নাটক একসঙ্গে দেখার ফলে তুলনাটা করা সম্ভব হয়। নিজেদের চোখ আর রুচি তাঁরা এভাবে তৈরি করতে পারেন। অন্য পক্ষে দলগুলি উৎসাহ-উদ্দীপনাও প্রচুর পায় এর থেকে। তবে ইদানীং ব্যাপারটা বড্ড বেশি একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। প্রতিবারই রাধারমণ ঘোষ অথবা রতনকুমার ঘোষের কাঁচা নাটক তাঁরা মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি নেই। প্রায় সকলেই এখনও পর্যন্ত প্রম্পট-নির্ভর। অনুশীলন এবং রিহারসালের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহটুকু আছে, অভাব শুধু নিষ্ঠার। সমালোচকের ভূমিকায় যাঁরা বসেন তাঁরা বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় বেশির ভাগ দলই বিচারকদের ওপর অখুশি। তাই বিচারকদের চিন্তাশীল কোনো মন্তব্যকেই কখনও তাঁরা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেন না। করলে সামগ্রিকভাবে থিয়েটারের উন্নতি হত।

থিয়েটারের কোনো কর্মীকে চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীকক্ষে দেখতে পাই না। সেখানে কিছু শিল্পী আসেন এবং তাঁদের পরিচিত বন্ধুরা। থিয়েটার-কর্মী বিশেষ করে থিয়েটার-সমালোচকরা এদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন কেন? সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত বম্বের দীনেশ ঠাকুর ও মীনাক্ষী ঠাকুর তাঁদের তিন দিনের তিনটি বিদেশী নাটকের হিন্দি রূপান্তরে মঞ্চসজ্জার যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছিলেন কলকাতার সমালোচকরা সে বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। লক্ষ করবার বিষয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ড্রামা ইনস্টিটিউটে অ্যাকটিং কোরসে যত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হন, তার দশভাগের একভাগও স্টেজক্রাফ্‌ট নিয়ে পড়তে আগ্রহী নন। ১৯৮৫ সালে নাট্যকার মনোজ মিত্রের সঙ্গে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার থিয়েটার আর্কিটেকচার ও কসটিউম ডিজাইনের প্রাক্তন অধ্যাপক ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন নৃত্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী গোবর্ধন পাঞ্চাল সঙ্গীত নাটক অকাদমীর পুরস্কার পেলে কলকাতার কাগজের সমালোচকরা এক লাইনও তাঁর সম্পর্কে লেখেন নি।

চিত্রশিল্পের গভীরে প্রবেশ করলে আমরা অনেকভাবেই উপকৃত হতে পারি। তার রঙ, তার কমপোজিশন, তার নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা থিয়েটারের কাজে লাগাতে পারি। মঞ্চশিল্পীর প্রাথমিক দায়িত্বই হচ্ছে ডিজাইনের ওপরে নজর রাখা। সমা-

লোচক যদি এসব না বোঝেন মঞ্চ-শিল্পীরা তাঁদের ত্রুটি শুধরে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন কী করে?

কিন্তু আমার প্রশ্ন, ভালো করে থিয়েটার বোঝার দর্শক বাড়বে কবে? ক্যাসপার নেহার, কার্লভন আপেন, থিও অটো যেমন ব্রেটোল্ট ব্রেখ্‌টের মঞ্চসজ্জাকর হিসেবে থিয়েটারকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছিলেন, বাঙলা থিয়েটারে তেমন প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাব না হলেও খালেদ চৌধুরী (১৯৮৬ সালে সঙ্গীত নাটক অকাদমীর পুরস্কারে ভূষিত), নির্মল গুহরায় প্রভৃতি দু-একজন মঞ্চসজ্জাকর হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উৎপল দত্ত প্রমুখ থিয়েটার-কর্মীদের অসহযোগিতায় নির্মল গুহরায়কে নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে হল। এতে বাঙলা থিয়েটারের সমূহ ক্ষতি হল। লাভ হল কিছু অশিক্ষিত ব্যবসায়িক মঞ্চশিল্পীদের। নকশালবাড়ি কৃষকবিদ্রোহে অনুপ্রাণিত শিল্পী নির্মল গুহরায় বর্তমানে জড়িত রয়েছেন ব্যবসায়িক মঞ্চের সঙ্গে। "স্টেটসম্যানে"র সমালোচক অভিযোগ করেছিলেন মঞ্চসজ্জায় উল্লেখযোগ্য কিছুই পান না। তাই এ দিকটায় তাঁরা একদম নজর দেন না। আমার মনে হয় তাঁদের নন্দনতত্ত্বের সীমাবদ্ধতার কথা অকপটে স্বীকার করে নেওয়াই উচিত।

আলোকসজ্জার দিক দিয়ে তাপস সেন-জয় সেন-কনিক সেন-ভানু বিশ্বাসরা যা দেখাচ্ছেন তাতেই সমালোচকরা খুশি থাকছেন। প্রয়োজন হল শিক্ষিত সমালোচকদের আলোকসজ্জা সম্বন্ধে পড়াশুনা করা, কলকাতায় বসে বিদেশী নাটকের প্রযোজনা দেখা এবং সীমিত জ্ঞানের অধিকারী এসব আলোকসম্পাতশিল্পীদের দৃষ্টিশক্তিকে আরো প্রসারিত করতে সাহায্য করা।

বাঙলা থিয়েটারের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক দীর্ঘকালের। ইদানীং "মারীচ-সংবাদে"র পর বাঙলা গান থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তাপস সেনের স্ত্রী গীতা সেন প্রতিনিয়তই বাঙলা থিয়েটারের গান মঞ্চে পরিবেশন করে চলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা থিয়েটারের অনেক হারিয়ে-যাওয়া গান তিনি উদ্ধার করে আমাদের মধ্যে আজও তাকে সজীব করে রেখেছেন। অথচ সমালোচকরা সংগীত-বিশেষজ্ঞ হতে বিশেষ একটা চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। গান শোনার জন্য যদি ঠিকমত কান তৈরি না হয় তাহলে ভুল গানের প্রয়োগকে শুধরে দেবার দায়িত্ব কে নেবেন?

১৯৮৩ সালে নান্দীকার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ এবং ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার যৌথ উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দু-মাসের থিয়েটার ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হয়। কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় ৩১টি ছেলেমেয়ে এই ওয়ার্কশপে যোগ দেয়। গিরীশ কারনাডের "হয়বদন" এবং ধর্মবীর ভারতীর "অন্ধযুগ" নাটক দুটি অভিনীত হয়। প্রায় ১ লক্ষ টাকা খরচ করে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা হাতেকলমে সকলকে থিয়েটারের সমস্ত কাজ শেখান। কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের একটু নামজাদা সভ্যরা এই ওয়ার্কশপে যোগ দেন নি। দিলে তাঁরা লাভবান হতেন। লক্ষ করার বিষয়, এই ওয়ার্কশপে কলকাতার কোনো সমালোচক যোগ দেন নি। দেবেন্দ্ররাজ অঙ্কুরের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের "সমাপ্তি" এবং মণি মুখোপাধ্যায়ের "দখল" গল্প দুটি (নাট্যরূপ ছাড়াই) হবহু মঞ্চে তুলে ধরেন বলিষ্ঠ অভিনয়ের মাধ্যমে। শিল্পীরা মুখের সাহায্যে আবহসংগীত পরিবেশন করেন। অ্যাক্রবেটিক্‌সের প্রাধান্য খুব একটা বেশি না থাকলেও এ ধরনের অভিনয় পরিবেশন কলকাতার মঞ্চে এই প্রথম। গন্ধর্বের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটিমাত্র বাড়তি অভিনয়ের ব্যবস্থা করা ছাড়া কলকাতায় আর দ্বিতীয়বার এই অভিনয়ের পুনরভিনয় ঘটে নি। সমালোচকরা সমস্ত ব্যবস্থাটার প্রতিই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন।

১৯৮৬ সালে পঃ বঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৩০টি দলের ছমাস-ব্যাপী এক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শিশিরমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে। ওয়ান ওয়াল থিয়েটার এবং শ্রুতিনাটককে গ্রুপ থিয়েটার কর্মীরা ভালো চোখে দেখেন না। এতে ক্ষতিটা তাঁদেরই হচ্ছে। একেবারে ছকে বাঁধা নিয়রুচির তাঁদের এই নাটককে বয়কট করে দর্শকেরা যদি শ্রুতিনাটকের প্রতি আকর্ষিত হয় তাহলে নিজেদের থিয়েটারের অক্ষমতার কথা আগেভাগে স্বীকার করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শ্রুতিনাটকে মঞ্চসজ্জা ও আলোকসজ্জার জন্য যে খরচটা বাঁচানো যায় সেটা খুব কম অঙ্কের ব্যাপার নয়। আর রেডিও-টেলিভিশনের একটা মিশ্রিত রূপ যদি মঞ্চে উপভোগ্য করে তোলা যায় শুধু গলার মাধ্যমে তাহলে তার প্রশংসা থেকে শিল্পীকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আর গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয় যদি কমার্শিয়াল থিয়েটারের মতো গ্ল্যামার-সর্বস্ব হয় তাহলে অবশ্য অন্য কথা।

সোমেন গুহ

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি

খাজিম আহমেদ

মুখবন্ধ

চতুরঙ্গ' (অক্টোবর, ১৯৮৬) পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনা-বিভাগে ড. রশীদ আল ফারুকী 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম'—(খোন্দকার সিরাজুল হক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। একশত টাকা) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন '……উভয়বিধ সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকাতে একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় (এলিট) গড়ে ওঠে—যাঁরা ১৯২৬ সালে "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" নামে এক প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আত্মপ্রকাশ করেন। এঁদের মটো ছিল বুদ্ধির মুক্তি। "শিখা" পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁদের কার্যক্রম বিকশিত এবং বিস্তারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দলটিকে মুসলিম জাগরণের দূত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়—যদিও তাঁদের কার্যক্রম কোনোপ্রকার সাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। এই কারণে "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" নাম হলেও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহু অমুসলমানও জড়িত ছিলেন—যদিও তাঁদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল মুসলিম চিন্তা এবং চেতনাকে ঘিরে।

সাহিত্য : সমাজ : সংস্কৃতি

"আজ আমরা যখন বাঙলার জাগরণের কথা বলি, তখন অনেক সময়ই তাঁদের কথা স্মরণ করি না। শুধু তাই নয়, তাঁদের অস্তিত্বও ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।" "……তাঁরা যে একটি অসাধারণ নীতির ধারক, সেকথা আমরা মনে রাখি না।"[১]

খণ্ডিত পশ্চিমবাঙলায় "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" আর তার নায়করা প্রায় অনালোচিত। এই স্বল্পদেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। মূল আলোচনার শুরুতে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এবং 'বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তি' সম্পর্কে সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের অভিমত উদ্ধৃত হল :

'১২১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি কালে পূর্ববঙ্গের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়। পরের দশকগুলিতে যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন পূর্ববঙ্গে প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পরিচালিত হয়। নতুন বিদ্যালয়-শহর ঢাকায় বিচিত্র ভাবনাচিন্তার আন্দোলন শুরু হয়। "যুক্তিভিত্তিক চিন্তার প্রসারের উদ্দেশ্যে" মুসলমান বুদ্ধি-

জীবীদের ছোট ছোট গোষ্ঠী সভাসমিতি গড়ে তুলতে শুরু করেন। তাঁদের এই সব প্রচেষ্টা আবার ঐতিহ্যপন্থী মুসলমান নেতৃত্বের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এ সম্বন্ধে নীচের বিবরণটি মনোজ্ঞ :

"১৯২৬ সালে জনাব আবুল হুসেন এবং অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদের নেতৃত্বে বিশিষ্ট কিছু সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাব্রতী একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠা করেন। সভাটির নাম দেওয়া হয় "ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ"। "বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তি"র জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তোলা এবং মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যুক্তিভিত্তিক চিন্তার চর্চা বাড়ানো ছিল এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ। আন্দোলনটি বুদ্ধিবাদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল ; তা সত্ত্বেও নেতারা নিগ্রহ থেকে রেহাই পান নি। অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছ থেকেই এই নিগ্রহ এসেছিল—ঢাকার নবাব ছিলেন নিগ্রহকারীদের নেতা।"[২]

'......আরো অনেক শিক্ষিত সাহিত্যপ্রেমী বাঙালী হিন্দুর মত আমিও বহুদিন পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যকৃতি বিষয়ে প্রায় অজ্ঞ ছিলাম। মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, কাজী আবদুল ওদুদ, গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া সেকালে কোন বাঙালী মুসলমানের রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল ?—কায়কোবাদ, রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, বেগম রোকেয়া হোসেন, ইমদাদুল হক, নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদ, 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক আবুল হোসেন, আবুল ফজল প্রভৃতির রচনাবলী বাংলাদেশে যাবার আগে অন্তত আমি পড়িনি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাম অবশ্য আমি শুনেছিলাম।' 'বিশের দশকের শেষে ও ত্রিশের গোড়ায় ঢাকার অধ্যাপক হুসেনের নেতৃত্বে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সৃজনধর্মী সাহিত্যে তারই উত্তরাধিকারকে ফলপ্রসূ করেছিলেন ওয়ালীউল্লাহ।'[৩]

'মুল্লাব্যাখ্যাত ধর্মীয় বিধিনিষেধ আর অলৌকিক নানা উপাখ্যানকে বাঙালী মন ইসলামের সঙ্গে সমীকৃত করেছে। আল্-রাজি, আল-ফারাবি, ইবনেসিনা, ইবন খলদুন, ইবন-রুশদ, আল্-হাজেন, হুনেন ইত্যাদির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনাদি নিয়ে বাংলা ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা হলে ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে বঙ্গীয় মানসের হয়ত বা অর্থবহ পরিবর্তন ঘটত। বিশ শতকের সূচনায় রোকেয়ার অসামান্য প্রবন্ধাবলীতে এবং পরবর্তী কালে 'শিখা' ও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে যে রেনেসাঁসী মনস্বিতার প্রতিশ্রুতি আভাসিত পূর্বোক্ত চিন্তকদের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় থাকলে তা হয়ত শিক্ষিত হিন্দুদের দ্বারা অবহেলিত এবং গোঁড়া মুসলমানের দ্বারা দমিত নাও হতে পারত।'[৪] 'বুদ্ধির মুক্তি', আন্দোলনের স্মৃতিচারণ শুনি ঢাকায় প্রখ্যাত ছান্দসিক আবদুল কাদিরের কাছে, চট্টগ্রামে মনস্বী সাহিত্যিক আবুল ফজলের মুখে'—(১৯৭৫)।[৫]

'......'শিখা'ই হল 'মুসলমান সাহিত্য-সমাজে'র মুখপত্র। মাত্র ৫/৬ বছরের জন্য 'শিখা' চিন্তার আগুন জেলেছিল। এই পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল : "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" চিন্তার আন্দোলনের এই শিখা যাঁরা জেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল প্রমুখ। এই শিখাগোষ্ঠী সেদিন ঢাকার পথে নেবেছিল।......এ ধরণের সমাজ-সম্পর্কবিহীন বৌদ্ধিক চিন্তার সংগ্রাম পরাধীন দেশে কোন সমাজেই বেশিদিন টেকে না। আর সেকালের মুসলমান সমাজে যে ছ-বছর এই 'শিখা' নিবে যায় নি সেই তো পরম সৌভাগ্যের কথা।'[৬]

'১৯২৬-এর ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' ও 'শিখা'-সংকলনের (৯২৭-৩১) মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের যে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের পাওয়া গিয়েছিল, তাঁদের প্রচেষ্টা পরবর্তী বিশ বছরে (১৯৩১-১৯৫১) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বাধাপ্রাপ্ত ও পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী প্রমাণ করল তা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় নি। ......কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল, আবুল হোসেন প্রমুখ 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নেতারা আধুনিক জগতের ভাবনা-চিন্তার দ্বারা চিন্তাশীল বাঙালী মনকে পরিশীলিত করে, তাকে স্বচ্ছ, সুস্থ ও প্রসারিত করার সাধনা করে বিদায় নিয়েছেন।'[৭]

"১৯২৬-এ ঢাকার ওদুদ শাহেব ; অধ্যাপক আবুল হোসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), আবদুল কাদির (জ ১৯০৬), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৭) প্রমুখের সহযোগিতায় 'বুদ্ধির মুক্তি' ভাব-আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই তরুণ তুর্কীরা "শিখা" গোষ্ঠী নামে খ্যাত হন। এঁদের প্রধান নেতা ছিলেন ওদুদ

সাহেব। ঢাকার বাংলা একাডেমী আব্দুল কাদির বিরচিত 'কাজী আবদুল ওদুদ' জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।"[৮]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে ঘোরতর সংকট দেখা দিয়েছিল। অকস্মাৎ বিস্তর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের উত্থান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাসের মাত্রাকে তীব্রতর করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে ঢাকায় কতিপয় মুসলমান বুদ্ধিজীবী, মুসলমানদের মধ্যে যুক্তিবাদী-গণতান্ত্রিক এবং মানবতাবাদী ভাবধারার বিকাশ ও প্রসারের জন্য অদৃষ্টপূর্ব সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা ১৯২৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অখণ্ড বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ১৯৩৬ সাল তক এই 'সাহিত্য-সমাজে'র ভূমিকা অতুলনীয়। এই আন্দোলন মূলত বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানসে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন নামে সবিশেষ পরিচিত। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের (emancipation of the intellect) মুখপত্র হিসেবে 'শিখা' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকার মারফত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করা হয়েছিল। যে-সমস্ত বুদ্ধিজীবী বিবেচক ব্যক্তি এই পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত ছিলেন, তাঁদের 'শিখা গোষ্ঠী' নামে অনেকে চিহ্নিত করেন। যদিচ তাঁরা 'অভিযান' এবং 'জাগরণ' নামে দুখানি মাসিক পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছিলেন। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এক শ্রেণীর রক্ষণশীল সংকীর্ণতাবাদী মুসলমান এর চূড়ান্ত বিরোধিতা করে আসছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল 'শিখা' পত্রিকার মারফত বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে অ-ইসলামী আদর্শের প্রচার করা হচ্ছে। স্বভাবতই 'সমাজ' এবং 'শিখা' প্রচারিত যুক্তিবাদী আদর্শের সঙ্গে সংরক্ষণবাদীদের একটি সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) 'মানবজীবন' এবং 'উন্নত জীবন' ; কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের মধ্যে স্থিত রক্ষণশীলতার কেন্দ্রস্থলে গভীর আঘাত হেনেছিলেন। জনাব লুৎফর রহমান বিশেষ এক প্রবন্ধে লিখলেন যে জ্ঞানচর্চা উপেক্ষা করে যাঁরা প্রার্থনা করেন তাঁরা অপদার্থ। এমন একটা মুহূর্তে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯:২) বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীমুক্তির মহানায়িকা হিসেবে আবির্ভাব বিস্ময়কর ঘটনা। বেগম রোকেয়া সম্পর্কে ড. অমলেন্দু দে Islam in Modern India গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন এইভাবে—'a pioneer in the movement for emancipation of women in Bengali Muslim society'। তিনি নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে উদ্বোধিত হয়ে কলকাতায় মুসলিম মহিলাদের জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল' স্থাপন করেন। বেগম রোকেয়া নারীপুরুষের সাম্যের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামে ব্রতী হন। তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা রক্ষণশীল মুসলমানদের ভীত করে তুলেছিল। এই 'ত্রয়ী' মুসলিম সমাজে যে বিচারশীল যুক্তিবাদী মানসিকতা প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন তার ধারা তীব্রতর হল কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে। কাজী নজরুলকে হিন্দুরা 'পাতিনেড়ে' এবং মুসলমানেরা 'কাফের' অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন। যদিও এমন সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যে কাজী নজরুল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। কাজী আবদুল আবদুল ওদুদ এবং অধ্যাপক আবুল হোসেন আলোচিত পূর্বসূরীদের ভাবধারাকে দৃঢ়মূলে প্রোথিত করার উদ্দেশ্যেই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ছাত্রাবস্থায় কাজী আবদুল ওদুদ স্বচ্ছ এবং সরল বাঙলায় তাঁর সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিম জীবন নিয়ে তাঁর ছোটোগল্পের সংকলন "মীর পরিবার" (১৯১৮) প্রকাশিত হয়েছিল। "নদীবক্ষে" নামক উপন্যাসে মুসলিম কৃষকপরিবারের জীবনগাথা বিবৃত করলেন অসীম দক্ষতার সঙ্গে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থের সজীবতা এবং নতুনত্ব সম্পর্কে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন (১৫ই বৈশাখ, ১৩২৬)। অতঃপর প্রকাশিত হল তাঁর মননশীল প্রবন্ধ "সাহিত্যিকের সাধনা" (মোসলেম ভারত, বৈশাখ, ১৩২৭)। প্রমথ চৌধুরী ভূয়সী সাধুবাদ উচ্চারণ করলেন এই নিবন্ধের (সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭)।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন সুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ কাজী আবদুল ওদুদকে ঢাকা ইনটারমিডিয়েট কলেজের বাঙলার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করেছিলেন। ১৯২০ সালে সেই কাজ নিয়ে তিনি

ঢাকায় চলে যান। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ফিরে এসেছিলেন কলকাতায় টেক্সট্ বুক কমিটির সম্পাদক হিসেবে। আজীবন সেই কাজ করেই অবসর নেন। ঢাকা ইনটারমিডিয়েট কলেজে ছাত্রদের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সঞ্চারিত করেছিলেন। অন্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বোধিত করাই ছিল তাঁর মহান ব্রত। এখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যকাণ্ড থেকে 'বুদ্ধির মুক্তি' শব্দদ্বয় চয়ন করেছিলেন। 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কথা' (সংকল্প, কলকাতা, ১৩৭২) প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ স্বয়ং লিখেছেন যে অতঃপর তিনি মহাত্মা গান্ধী, রোমাঁ রোলাঁ, রামমোহন রায়, গীতা, কোরআন, গোটে, ইমারসান এবং সাদীর প্রচারিত আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের ধর্মীয় গোড়ামি এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এঁরা সকলেই মানবতাবাদী ছিলেন। ধর্মও মানতেন। এঁদের কাছে ধর্ম ছিল মানবাত্মার মহত্বে অপরাজিত বিশ্বাস। প্রথম সভাপতি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯২৬)। ভাবযোগী কাজী আবদুল ওদুদ। কর্মযোগী অধ্যাপক আবুল হোসেন। সহযোগী হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির, আবদুল কাদির, অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেন, আবুল ফজল. মোতাহের হোসেন চৌধুরি (১৯০৩-১৯৫৬), খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আমীনউদ্দীন আহমদ (১৯০৬-১৯৪৩) প্রমুখ। কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের আদর্শ প্রচারে চেতন-জীবনে বরাবর সচেষ্ট ছিলেন। দশম বার্ষিক সভায় (১৯৩৬) সভাপতিত্ব করেছিলেন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে শ্রী চট্টোপাধ্যায় মুসলমান সমাজ নিয়ে একটি উপন্যাস রচনার আশা প্রকাশ করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। ১৯৩৮ সালেই তাঁর মৃত্যু হয় (সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, আবুল ফজল)। এটিই ছিল ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' এর শেষ সম্মেলন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হোসেন অনুপ্রাণিত হলেন হজরত মোহাম্মদের এই বাণী থেকে—"Be embellished with the virtues of the Allah।" কাজী আবদুল ওদুদ এবং অধ্যাপক আবুল হোসেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মর্মকথা তাঁদের বিভিন্ন সাহিত্যালোচনায় স্পষ্ট করে তুললেন। কাজী আবদুল ওদুদ 'Prophet Muhammed' নামক একটি আলোচনায় সার্বজনীন এবং বিশ্বপ্রেমিকরূপে চিত্রিত করলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় 'মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র এক আসরে 'মুস্তাফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠের মারফত খিলাফতের উচ্ছেদকে সমর্থন করলেন। এতে যুক্তি এবং ইতিহাসচেতনা প্রাধান্য পেল। শাস্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ববাদের পরিবর্তে তিনি সমর্থন করলেন মুস্তাফা কামালের সাহসী এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবনের আদর্শকে। 'প্যান-ইসলামী' আন্দোলনের অনিষ্টকর প্রভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেও তিনি বিস্মৃত হন নি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, স্যার সৈয়দ আহমদ খানও 'খিলাফত' এবং 'প্যান-ইসলামী' আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি।

জাতীয় নেতা মৌলানা আহমদ আলী, কাজী আব্দুল ওদুদের নির্ভীক মতামতকে সমর্থন করলেন নিঃশঙ্ক চিত্তে। তাঁর এই নিবন্ধ কলকাতা এবং ঢাকার শিক্ষিত মুসলিম সমাজে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করল। ঢাকার মুসলিম হলে এবং রমনার বিভিন্ন মুসলিম ছাত্রাবাসে আলোচনার ঝড় উঠল। অধ্যাপক আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদের আদর্শকে ছাত্রদের সামনে বিশ্লেষণ করলেন। উদ্দীপনার তরঙ্গ বয়ে গেল। ঠিক এহেন একটা সময়ে অধ্যাপক আবুল হোসেন 'অহমিকা', 'সত্য', 'অগমানুবর্তিতা', নামীয় পরপর তিনটি প্রবন্ধের মাধ্যমে যুবসমাজের মনে গভীর জিজ্ঞাসার উদ্রেক করতে সমর্থ হলেন। ১৯২৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গ্রন্থ "বাঙ্গলার বলশী"। এই গ্রন্থে চারটি অর্থনৈতিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছিল—(১) বাঙ্গলার বলশী, (২) কৃষকের আর্তনাদ, (৩) কৃষকের দুর্দশা, (৪) কৃষিবিপ্লবের সূচনা।[৯]

এইভাবে কাজী আবদুল ওদুদ এবং অধ্যাপক আবুল হোসেন বাঙালি মুসলমানদের চিন্তাভাবনার জগতে একটি নতুন দিক উন্মোচিত করলেন। স্বভাবতই মুসলমান যুবকদের মনে ধর্ম, দেশ, সমাজ এবং সাহিত্য সম্পর্কে অনুসান্ধৎসু মানসিকতার উন্মেষ ঘটল।

ইতিমধ্যে ১৯২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি ঢাকায়, কাজী আবদুল ওদুদ এবং অধ্যাপক আবুল হোসেনের মতাদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হল। ছাত্রদের মধ্যে আবদুল কাদির, আবদুল মজিদ সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করলেন। অধ্যাপক আবুল হোসেন সম্পাদক মনোনীত হলেন। মূলত মুসলিম সমাজকে যুক্তিবাদে দীক্ষিত করাই ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। অবশ্য 'মুসলিম'—এই শব্দটি ব্যবহারের অন্য কোনো তাৎপর্য ছিল না। বাস্তবে এই 'সমাজ' হিন্দু এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের ভাববিনিময় এবং সাধনার কেন্দ্র হিসেবে লালিত হয়েছিল।

ঢাকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় দারুণভাবে আচ্ছন্ন। শান্তিনিকেতনের অনুকরণে ঢাকায় শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করলেন "বিশ্বভারতী সম্মিলনী"। 'বাণীমন্দির" নামে একটা গ্রন্থবিপণিও স্থাপন করেছিলেন শ্রী চৌধুরী। তৎকালীন ঢাকার হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবী-ও ছাত্র-সম্প্রদায় এই 'বাণীমন্দির' থেকেই শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল-এর প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ কিনতেন।

"বিশ্বভারতী সম্মিলনী" রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়েছিল। পরিশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানরা এখানে সমবেত হতেন গভীর আগ্রহে। স্মর্তব্য, শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত এই "সম্মিলনী"র সম্পাদক ছিলেন আবদুল হক এবং আবুল ফজল। কাজী আবদুল ওদুদ "সম্মিলনী"-আয়োজিত অনুষ্ঠানে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনটি অপরিসীম মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকায় আগমন উপলক্ষেও 'সম্মিলনী' কর্তৃপক্ষ কয়েকটি আলোচনার সুব্যবস্থা করেছিলেন।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠার স্বল্প কয়েকদিন পরেই খবর এল রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসছেন। তাঁর আগমনের খবর 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী,' 'সাহিত্য-সমাজ' এবং ঢাকার শিক্ষিত মহলকে উদ্বেলিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি বক্তৃতা কাজী আবদুল ওদুদ এবং অধ্যাপক আবুল হোসেন, আবুল ফজল এবং অন্যান্য সদস্যরা গভীর অভিনিবেশসহকারে শুনলেন। ১৯২৬ সালের ৭ ফেবরুয়ারি থেকে ১৪ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় ছিলেন। ঢাকায় হিন্দু এবং মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে তখন একটি হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা করেছেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট প্রাণপুরুষ আবুল ফজল তাঁর 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' নামক নিবন্ধে (তরুণপত্র, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৭২)।

'সাহিত্য-সমাজে'র প্রতিটি সম্মেলনেই বিশেষ বিশেষ নিবন্ধ পঠিত হত। বিষয়বস্তুর নির্বাচন থেকেই 'সাহিত্য-সমাজে'র সঙ্গে জড়িত হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদার অ-সাম্প্রদায়িক চেতনা পরিষ্কার হয়ে যায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাঠের উল্লেখ করা যায়: 'রবীন্দ্রনাথ' (পাঠক : তাহেরউদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম. এ. ক্লাশের ছাত্র, ৩১ জানুয়ারি ১৯২৬, সভাপতি শ্রী চারু বন্দ্যোপাধ্যায়); 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' (আবুল হোসেন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬, সভাপতি খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান); 'কাজী ইমদাদুল হক স্মরণে' (কাজী আবদুল ওদুদ, ১০ এপ্রিল, ১৯২৬); 'সাহিত্য-সৃষ্টি' (বক্তা : হেমন্তকুমার সরকার এবং কাজী নজরুল ইসলাম, ২৭ জুন, ১৯২৬); 'সম্মোহিত মুসলমান' (কাজী আবদুল ওদুদ, ৮ই জুলাই, ১৯২৬); 'বাহাই ধর্ম' (আবুল ফজল, ৫ সেপ্টেমবর, ১৯২৬)। দ্বিতীয় বর্ষের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ নিম্নরূপ : 'আদর্শের নিগ্রহ' (আবুল হোসেন), 'আনন্দচর্চা ও মুসলমান সমাজ' (কাজী মোতাহের হোসেন); 'বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যত' (আবুল হোসেন), 'পল্লীসঙ্গীতে লীলাবাদ' (আবদুল কাদির)। তৃতীয় বর্ষের সম্মেলনে শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল উপস্থিত ছিলেন। 'সাহিত্য-সমাজ' এর প্রগতিশীল চিন্তাধারা তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। 'সমাজ'-এর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। শ্রী চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন।[১০]

প্রতিটি সম্মেলনেই ঢাকার হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রসমাজ গভীর আগ্রহ নিয়ে যোগদান করেছিলেন। পঠিত প্রবন্ধের ওপর বাদানুবাদ আর আলোচনা হত। সংগীতের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করা হত। বিখ্যাত কবি ও গায়ক অধ্যক্ষ সুরেশ মৈত্র গান গেয়েছিলেন। অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তচিন্তার সপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছিলেন। আনোয়ারুল কাদির ঢাকা কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তী কালে স্কুলের বিভাগীয় পরিদর্শকের দায়িত্বে আসীন হন। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিক এবং মুক্তবুদ্ধ চিন্তাবিদদের যুগ্ম-সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠভূমি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' বাৎসরিক মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে। 'সমাজের' বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত মননশীল রচনাগুলোর সংকলন করা হত 'শিখা' পত্রিকায়। মোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত অর্থনৈতিক দায় আবুল হোসেন বহন করতেন। তিনিই ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। অবশ্য শেষতম সংকলনের সম্পাদক হিসেবে আবুল ফজলের নাম মুদ্রিত হয়েছে। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের আদর্শকেই 'শিখা' প্রতিবিম্বিত করেছিল। এই পত্রিকার শুরুতেই কয়েকজন উদারবাদী প্রগতিশীল মুসলিম লেখকের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এই উত্তাল ঢেউ কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল। 'বুদ্ধির মুক্তি' এবং 'উদার মানবতাবাদী' চিন্তার প্রকাশ-ক্ষেত্র হিসেবে মাসিক ও সাপ্তাহিক 'সওগাত' পত্রিকার আবির্ভাব। জনাব নাসিরুদ্দীন ছিলেন 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, এস. ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, কবি আবদুল কাদির, ফজলুর রহমান, হাবিবুল্লাহ বাহার এবং উক্ত আন্দোলনের বহু সমর্থক 'সওগাত' পত্রিকায় বিস্তর লিখেছেন। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র 'সওগাত' পত্রিকায় সম্পাদকীয় নোট লিখতেন। স্বভাবতই এই পত্রিকা শিক্ষিত মহলে সবিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। 'সওগাত' পত্রিকার প্রত্যক্ষ উৎসাহে মুসলিম মহিলারাও সাহিত্যচর্চায় যোগ দিতে শুরু করেন। গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি অংশও আলোকিত হওয়ার প্রাথমিক সুযোগ পেল।

কাজী আবদুল ওদুদ মুসলিম সমাজের ধর্মান্ধতা এবং অস্বচ্ছ চিন্তার বিরুদ্ধে তুলনারহিত সংগ্রাম শুরু করেন। ধর্মীয় নির্দেশের প্রতি 'অন্ধ আনুগত্যের' পরিবর্তে 'সতর্ক মনের উজ্জীবন' আশা করেছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একদিনের আহারে যেমন অন্যদিন চলে না, তেমনি এক যুগের চিন্তাও অন্য যুগে অচল। পৃথিবী যেমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে নেই, তেমনি মানুষের চিন্তাও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর "শাশ্বত বঙ্গ" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন॥

অধ্যাপক আবুল হোসেন মনে করতেন, যে-শিক্ষা হৃদয়বৃত্তির ঔদার্যকে রুদ্ধ করে, সুসংস্কৃত মননের সৃষ্টি করে না, কুসংস্কার জীইয়ে রাখে এবং জীবনের সঙ্গে সংযোগহীন, সে-শিক্ষা অর্থহীন। তিনি ধর্ম এবং রাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ পৃথকী-করণের পক্ষপাতী ছিলেন। পবিত্র কোরানের নির্দেশ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন যে মুসলমানদের দুটো জরুরি কর্তব্য হচ্ছে, আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ এবং মানবকল্যাণ। হিন্দুরাও বিশ্বাস করেন পরমব্রহ্মের কাছে আত্মসমর্পণ একান্ত জরুরি। সেই সঙ্গে মানবকল্যাণের প্রসঙ্গও উচ্চারিত।

স্বভাবতই কোরানের নির্দেশ অনুসারেই মুসলমানদের হিন্দুদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে থাকার সঙ্গত কারণ নেই। বিচ্ছিন্নতাবাদকেও তিনি সমর্থন করেন নি। ভালোবাসা এবং সৌহার্দের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় দেশব্রতী হোক, এটাই ছিল অধ্যাপক আবুল হোসেনের প্রত্যাশা। তিনি এইভাবে চিন্তা করতেন, মুসলমানের চেয়ে মানুষ বড়ো। 'মজহাব'-এর চেয়ে মাতৃভূমি অনেক মহৎ ভাবনার বিষয়। পৃথক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নেও তিনি আপোস করেন নি। The Gandhi Irwin Truce & the Muslims নামক আলোচনায় তিনি তা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল হোসেন সম্পর্কে কয়েকটি কথা পরিষ্কার বলে রাখা দরকার। জনাব আবদুর রহিম মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকুরিতে শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ সংরক্ষণের পক্ষে প্রস্তাব রেখেছিলেন। অধ্যাপক আবুল হোসেন 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' নামক মননশীল প্রবন্ধে এই প্রস্তাবের যুক্তিগ্রাহ্য বিরোধিতা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে মুসলিম যুবকরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে সভ্য জগতে টিকে থাকতে আগ্রহী। তাঁর এই মন্তব্যে বহু লীগ নেতা তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপনার পদ ছেড়ে দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হতে বলেন।

অসাধারণ স্বাধীনচেতা, জেদি পুরুষ আবুল হোসেন অধ্যাপনার নিরাপদ চাকুরি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেন। চ্যালেনজের মুখোমুখি হন। আবুল হোসেনের জন্ম (১৮৯৭-১৯৩৮)। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Master of Law (ML) ডিগ্রী অর্জন করেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। অতঃপর ঢাকা বারে যোগ দিলেও ১৯৩২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে খুবই সীমিত সময়ের মধ্যে অসাধারণ আইনব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে প্রতিপক্ষকে হতচকিত করে দিয়েছিলেন।[১১]

অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান সুপ্রমাণিত হয়েছে 'বাংলার বলশী' এবং Helots of Bengal গ্রন্থে। ১৭৯৩ সালে ভূমিরাজস্ব এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে বাঙালি কৃষকের অবর্ণনীয় দুর্দশার কারণ হয়েছে, তার ক্ষুরধার বিশ্লেষণ করেছিলেন ওই বই দুটিতে। বাঙলার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি নদীনালা সংস্কারের প্রস্তাব রেখেছিলেন তাঁর River Problem in Bengal গ্রন্থে। ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদগ্ধ পণ্ডিতকে Tagore Law Lectures দেবার জন্য সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই মূল্যবান বক্তৃতাগুলো তাঁর The History of Develoqment of Muslim Law (1534, Calcutta) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামি আইনশাস্ত্র তাঁর নখদর্পণে ছিল। তিনি লেখেন যে অনেকেই এটি বিশ্বাস করে থাকেন, মানবসভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ হজরত মোহাম্মদ তৎকালীন আরবের প্রয়োজনানুসারে যে আইন প্রচলন করেন তা চিরকাল পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মানবসভ্যতা এই বিশ্বাসকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারে না। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই ব্রিটিশ প্রভু, আরব, বোখারা খোরাসান, সমরখন্দের ওপর তৎকালীন যুগে প্রযোজ্য আইন ভারতবর্ষের মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

উপরন্তু ভারতবর্ষীয় মুসলিম আইনকে তিনি Anglo-Muslim আইন হিসেবেই বিবেচনা করতেন। তালাক, অ-নিয়ন্ত্রিত বিবাহ, নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি মানবীয় মূল্যায়নে সবিশেষ উদগ্রীব এবং আগ্রহী ছিলেন।

গভীর দুঃসাহসের ওপর ভর করে আবদুল হোসেন শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজ এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাগ্রসর ধ্যানধারণার ব্যাপক প্রচার করেছিলেন তাঁর সুবিশাল সাহিত্যকাণ্ডে। তাঁর পুরো রচনা আবদুল কাদির সম্পাদনা করেছেন "আবুল হোসেনের রচনাবলী"—এই নামে [১৯৬৮ : ঢাকা]। নিঃসীম বেদনার কথা মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনশিখা নির্বাপিত হয়।

কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হোসেন 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' এর মারফত বাঙালি মুসলমান সমাজের নিস্তরঙ্গ ও স্থবির জীবনে জাগরণের মুক্ত হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন। উভয়েই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এই কালজয়ী বাণীতে বিশ্বাস রেখেছিলেন—'জ্ঞানের রাজ্যে অসহযোগ মৃত্যু।'

কাজী ওদুদ পুরোগামী দার্শনিক, ভাবুক। তিনি ধর্মান্ধতা, রক্ষণশীলতা এবং সংকীর্ণতার শিকড় ধরে টান দিয়েছিলেন। স্বভাবতই মৌলবাদীরা (fundamentalistas) কাজী ওদুদকে 'কাফের' এবং 'মুসলমানের শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেন। এমন কি সুপণ্ডিত মৌলানা আকরাম খান কাজী আবদুল ওদুদকে তাঁর 'নবপর্যায়' গ্রন্থে সন্নিবেশিত "সম্মোহিত মুসলমান" (Fascinated Musalman) প্রবন্ধের জন্য "মাসিক মোহাম্মদী" পত্রিকায় ছ'মাস ধরে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে ধিক্কার জানান। "মাসিক মোহাম্মদী" পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং মৌলানা আকরাম খান। "নবপর্যায়" প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৩ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থের জন্য কাজী আবদুল ওদুদকে দারুণভাবে প্রশংসা করেছিলেন। [তথ্যসূত্র : সংকল্প, কলকাতা, ১৩৭২]।

এই সময়ে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর উৎসাহী তরুণরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে 'আল মামুন ক্লাব' এবং 'অ্যানটি পর্দা লীগ স্থাপন করেন। পরদা-প্রথাকে উপেক্ষা করে মিস ফাজিলতউন্নিসা বাঙালি মুসলমান নারীসমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন। 'অ্যানটি পর্দা লীগ' তাঁকে ঢাকায় বিপুল সংবর্ধনা জানায়। মুসলিম লীগ এবং মৌলানারা সর্ববিধ উপায়ে কাজী ওদুদ এবং সহযোগীদের আক্রমণ করেন। এমন কি কাজী আবদুল ওদুদের জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। অভিজাত মুসলমানরা ঢাকার নবাব-প্রাসাদে তাঁদের বিচারের দাবি জানায়। ক্রমেই মুসলিম লীগের অপ্রতিহত প্রভাব সমাজ-জীবনকে গ্রাস করে। কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হোসেনকে সমাজচ্যুত করা হয়। জনাব আবুল ফজল "সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা" নামক গ্রন্থে এর প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য বর্ণনা দিয়েছেন।

এমন সংকটের মধ্যেও কাজী ওদুদ নিজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। ১৯৩৫ সালে বিশ্বভারতী "নিজাম বক্তৃতামালা"য় 'হিন্দু-মুসলমান'-এর বিরোধ সম্পর্কে তাঁর জোরালো বক্তব্য রাখেন। ১৯৩৬ সালে কলকাতা থেকে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই বক্তৃতাগুলো কবির আমন্ত্রণে ওদুদ সাহেব ১৯৩৫ সালের ২৬-২৮ মার্চ শান্তিনিকেতনে

দিয়েছিলেন। "হিন্দু-মুসলমান বিরোধ" সম্পর্কে ওই বক্তৃতা-অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতেন বলে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন [রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪]। ২৬ মার্চ 'মুসলমানের পরিচয়,' ২৭ মার্চ 'হৃদয়ের জাগরণ' এবং ২৮ মার্চ 'ব্যর্থতার প্রতিকার' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন কাজী ওদুদ।

১৯৩৬ সাল থেকে কয়েকজন শক্তিশালী মুসলিম সাহিত্যিক 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধিতা শুরু করেন। "মাসিক মোহাম্মদী" এবং "দৈনিক আজাদ" পত্রিকা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আবুল কালাম শামসুদ্দিন কাজী আবদুল ওদুদকে 'রামমোহনপন্থী' বলে সমালোচনা করেন ["অতীত দিনের স্মৃতি," ১৯৬৮, আবুল কালাম শামসুদ্দিন ; এবং "ত্রিশ দশকের বাঙালী মুসলমান সমাজ," সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদসংখ্যা, ঢাকা ১৯৭৭]। এমন-কি এককালীন সুহৃদ আবুল মনসুর আহমদও ধর্মের ভিত্তিতে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন।

এমন অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে রক্ষণশীলতা এবং গোঁড়ামির সঙ্গে যুক্তিবাদী উদার চিন্তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ 'দ্বিজাতিতত্ত্বে'র (theoy of two nations, ১৯৪০, মার্চ, পাকিস্তান প্রস্তাব) আওয়াজ তুলে শিক্ষিত মুসলমানদের মনকে দোদুল্যমান করে দেয়। 'হিন্দু সংস্কৃতি' এবং মুসলিম 'তহজীব-তমুদ্দনে'র নামে হিন্দু-মুসলিম যুগ্ম সংস্কৃতিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ড. অমলেন্দু দে"বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ" নামক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিচারশীল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এদিকে ১৯৩৬ সালে আবুল হোসেন ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় আইন ব্যাবসা শুরু করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত কলকাতা ছিল তাঁর বাসভূমি। ১৯৩৯ সালে ঢাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হয়ে উঠল। কাজী আবদুল ওদুদ নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ১৯৪০ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন। ছাত্র ও যুব-শ্রেণীর অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠশেষে জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়লেন। আবুল ফজল চট্টগ্রামে শিক্ষকতা করছেন সেই সময়। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের একমাত্র 'শিখা' হিসেবে ঢাকায় রয়ে গেলেন।

খুব বিলম্বে হলেও বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে জাগরণের যে প্রবাহ শুরু হয়েছিল তা শুদ্ধ হয়ে গেল অকস্মাৎ। দেশবিভাগের ফলে সেকথা প্রমাণিত হয়ে গেল।

অবশ্য বিভাগোত্তর পূর্বপাকিস্তানে আবুল ফজল (সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা), সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী (সংস্কৃতি-কথা, ঢাকা, ১৯৩৫), আনোয়ারুল কাদির (আমাদের দুঃখ), 'সাহিত্য-সমাজে'র ধারা আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' বিশ্বাস করতেন যে বাঙালি মুসলমানদের প্রাণের ভাষা হল বাঙলা ভাষা। সেই বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির হাত ধরেই পূর্ব পাকিস্থান, স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। [আগুনঝরা ফাগুন, সম্পাদনা : ড. রশীদ আল্ ফারুকী, ১৯৮০]।

ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কলকাতায় হল কাজী আবদুল ওদুদের সংস্কৃতি-সাধনার পীঠভূমি। নিঃসঙ্গ সৈনিক আমৃত্যু (১৮৯৪-১৯৭০) যুক্তিবাদী মননের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাসই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীনতা-উত্তর খণ্ডিত বাঙলার নয়া প্রজন্ম কাজী আবদুল ওদুদকে প্রায়শই জানেন না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, কে এই মুক্ত বুদ্ধ সুদর্শন অসাধারণ পুরুষ ? খুবই সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর ব্যক্তিজীবন আলোচিত হচ্ছে।

পূর্ব বাঙলার ফরিদপুর জেলার বাগমারী গ্রামে ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম হয়েছিল অভিজাত কাজী বংশে। পণ্ডিত-দার্শনিক-মনীষী এই রাবীন্দ্রিকের প্রয়াণ প্রায় নিঃশব্দে ঘটেছিল সত্তর দশকের শুরুতেই। তারিখ ছিল ১৯ মে, ১৯৭০। কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে তারক দত্ত রোডেই ছিল তাঁর নিজস্ব বাসভবন। জীবনের শেষ দশ বছর পারকিনসন রোগে ভুগেছেন। মূলত কান্তিময়, সুস্বাস্থ্যের মানুষ ছিলেন।

১৯১৩ সালে ফরিদপুর থেকেই ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেনসি কলেজে ভর্তি হন। থাকতেন ওয়েলেসলি অঞ্চলের 'বেকার গভরনমেনট হোস্টেলে' (৮ স্মিথ লেন, কলকাতা-১৩)। ১৯১৭ সালে প্রেসিডেনসি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত সহপাঠী : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, বিচারপতি আমিন

আহমেদ (ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন)। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনে কিছুদিন 'মোসলেম ভারত'-এর আফজালুল হকের সঙ্গে ছিলেন।

বেঙ্গল পুলিশ ইনসপেকটর নজীর-উদ-দীনের (স্বমাতুল) কন্যা জমিলা খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কাজী-সাহেবের বহু আগেই জমিলা খাতুনের জীবনান্ত হয়েছিল।

"নদীবক্ষে" (১৯১৯) এবং "মীর পরিবার" (১৯১৮) তাঁর ছাত্রজীবনের রচনা। এই সময়েই "ভারতী" এবং "প্রবাসী" পত্রিকায় "বিরাজ বৌ" এবং "রবীন্দ্রকাব্যপাঠ" (১৩৪৪) এর ওপর বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৩২৬-এর ১৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ কাজী আবদুল ওদুদের "নদীবক্ষে" সম্পর্কে এক চিঠিতে লেখেন, 'আপনার লিখিত "নদীবক্ষে" উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষী গৃহস্থের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরসতা ও নূতনত্বে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি, এই কারণে আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন।' কবি, কাজী আবদুল ওদুদকে পুনশ্চ অভিনন্দিত করলেন "নবপর্যায়" (১৩৩৩, প্রথম খণ্ড) প্রবন্ধ-সংকলনের জন্য। কবি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'এতে মনের জোর, বুদ্ধির জোর, কলমের জোর একসঙ্গে মিশেছে।' "রবীন্দ্রকাব্যপাঠ" (১৩৪৪, মাঘ, ঢাকা) আলোচনাগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমার রচনা এমন সরস বিচারপূর্ণ সমাদর আরো কারো হাতে লাভ করেছে বলে মনে পড়ে না। এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম সহানুভূতি ও ভাষানৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা বিস্ময়কর। তোমার মতো পাঠক পাওয়া কবির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়।'

তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা ছিল এই যে, তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, শ্রুতিধর, সময়ের অগ্রবর্তী ভাবুক ছিলেন। সূক্ষ্মার্থে জীবনশিল্পী। পবিত্র কোরআন, গীতা, উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথ, গোটে, রামমোহন এবং বিদেশী সাহিত্য থেকে তত্ত্বমন্থনে গভীর আনন্দ অনুভব করতেন। বাঙালি ওদুদ সাংস্কৃতিক সীমারেখায় বিশ্বাসী ছিলেন না। শাশ্বত বঙ্গভূমিই তাঁর মাতৃভূমি। দেশবিভাগের পর তাই কলকাতা হল তাঁর মূল ঠাঁই। ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'বাংলার জাগরণ' সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'শরৎচন্দ্র' সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন।

তাঁর মহৎ সাহিত্যসাধনা : "রবীন্দ্রকাব্যপাঠ" (১৩৪৪), "মীর পরিবার" (১৯১৮), "নদীবক্ষে" (১৯১৯), "আজাদ তরুণ" (১৩৫৫), "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ" (১৩৪২), "পথ ও বিপথ" (বিশ্বভারতী, ১৩৪৬), "নবপর্যায়" (২ খণ্ড, ১৩৩৩ এবং ১৩৩৬), "বাংলার জাগরণ" (বিশ্বভারতী, ১৩৫৬), "শরৎচন্দ্র ও তারপর" (১৯৬১), "নজরুলপ্রতিভা" (১৯৪০), "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ" (২ খণ্ড, ১৩৬৯ এবং ১৩৭৬), "কবিগুরু গোটে" (১৩৫৩, দুখণ্ড), "হজরত মহম্মদ ও ইসলাম" (১৩৭৩), "শাশ্বত বঙ্গ" (১৩৫৮, দ্বি-সং, ঢাকা, ১৯৮৩)। "ব্যবহারিক শব্দকোষ" তিনি সংকলন করেছিলেন। Creative Bengal তাঁর প্রবন্ধাবলীর ইংরেজি অনুবাদের সংকলন। "স্বাধীনতা দিনের উপহার" নামক একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

জারমান মহাকবি গোটে সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যে এমন রসোজ্জ্বল বিচারশীল বই দ্বিতীয়টি লেখা হয় নি। সচেতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই তাঁর নির্দেশক। অধ্যাপক ওদুদ একশোভাগ নৈয়ায়িক বাঙালি। রামমোহন-সম্পর্কিত আলোচনা বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সালে। অমূল্য গবেষণাগ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে কাজী সাহেবের "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ"-এর দ্বিতীয় খণ্ডটি যেন অধিকতর সমৃদ্ধ এবং মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সাহিত্যসাধনার পরিচয়, যে কী অসীম পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফল তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। "হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম" এবং পবিত্র কোরানের অনুবাদ-এর মতো সুকঠিন এবং প্রায় অসাধ্য কাজ পরিণত বয়সে করেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। সারা জীবন চর্চিত ও অর্জিত জ্ঞানের ফসল "হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম"। এই গ্রন্থে মহান-পুরুষের আধুনিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের অনুবাদে ভাষান্তর যে এত সুললিত হতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন। অনুবাদের মাত্র একটি উদাহরণ ; 'যার পরিমণ্ডল আমি পুণ্যময় করেছি, যেন দেখাতে পারি আমার কিছু নিদর্শন।'

কাজী ওদুদ "নজরুল নিরাময় সমিতি" এবং নজরুল একাডেমি'-র সাধারণ সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। কলকাতা থেকে মাসিক

"সংকল্প" (১৯৬১) এবং "তরুণ পত্র" নামীয় মননশীল সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তরুণ এবং যুবশ্রেণীর মনে নূতন চিন্তার স্ফুরণই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বাঙলা সাহিত্যের সমালোচক এবং ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকার হিসেবে 'শিশিরকুমার পুরস্কার' পেয়েছিলেন। 'আত্মজীবনী'-র একটি পরিচ্ছেদ শ্রুতি-লিখিত হয়েছিল। 'আত্মজীবনী' খণ্ডিত রয়ে গেছে। বিরাট একটি জীবনের অলিখিত অধ্যায় আমাদের অগোচরে থেকে গেল।

রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গ শেষ করা হচ্ছে : 'এদেশের হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না ; তখন মাঝে মাঝে দূরে দেখতে পাই বিপরীত দুই কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন একটা সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্ত-বৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটা প্রশস্ত পথকল্পে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে, তখনি আশান্বিত মনে তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মনন-শীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাঙলা ভাষায় তাঁর প্রকাশশক্তির বিশিষ্টতা।'

'বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তি'-আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নায়ক হিসেবে আবদুল কাদিরের প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়া একান্ত জরুরি। জনাব কাদির প্রয়াত কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ-এর জামাতা। কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়ার আড়াইসিদ্ধা গ্রামে ১৯০৬ সালের ১ জুন তাঁর জন্ম (১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩)। পিতা হাজী আকসাব-উদ-দীন এবং মাতা আরজ-উন-নিসা। মাত্র দু-বছর বয়সে মাতৃহীন হন। স্ব-গ্রামীণ পাঠশালা, চারতলা মাইনর স্কুল এবং ব্রাহ্মণবেড়িয়া অন্নদা হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯২৩ সালে। ১৯২৫ সালে ঢাকা ইনটারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই. এসসি. পাশ করেন। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন, গভীর সাহিত্যপ্রীতি তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঢাকা ইনটারমিডিয়েট কলেজে তাঁর শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। "শিখা" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশক ছিলেন আবদুল কাদির। ঢাকার মাসিক "সঞ্চয়" পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত ছিলেন।

১৯৩০ সালে কলকাতা করপোরেশনের স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি নেন। এখানে তাঁর সহকর্মী ছিলেন কবি বন্দে আলী মিঞা, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং বেগম সুফিয়া কামাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পাবলি-সিটি বিভাগের অনুবাদকের কাজ করেছিলেন। অতঃপর বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগে সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীন স্ট্যাটিসটিক্যাল বোর্ডের ইনসপেকটার, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের আঞ্চলিক প্রচার অধিকর্তার কাজও করেছিলেন। অ্যাপক মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের পরে "মাহে নও" পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রকাশন অফিসার পদে উন্নীত হন। প্রগতিশীল স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত "সওগাত" (কলকাতা, ১৯১৮-৫০) পত্রিকার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। ১৯৩৭ সালে সাপ্তাহিক "নবশক্তি" পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে তাঁর সহকর্মী ছিলেন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ এবং সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মন। ১৯৩৮ সালে দৈনিক "যুগান্তর" পত্রিকার বার্তা-বিভাগে যোগদেন। ১৯৪২ সালে কাজী নজরুল ইসলামের দৈনিক "নবযুগ" পত্রিকার বার্তাসম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে মাসিক "জয়তী" পত্রিকার সম্পাদক হন এবং দু বছরে ১৪টি সংখ্যা প্রকাশ করেন। তাঁর রচনাসমূহ : "দিলরুবা" (কাব্য, ১৩৩৩), "উত্তর বসন্ত" (কাব্য, ১৯৬৭), "কবি নজরুল" (প্রবন্ধ, ১৯৭০), "কাজী আবদুল ওদুদ" (জীবনী, ১৯৭৬), "ছন্দ-সমীক্ষণ" (১৯৭৯)। এ ছাড়া "আবুল হোসেনের রচনাবলী", "রোকেয়া রচনাবলী", "লুৎফর রহমান রচনা-বলী", "মাসহাদী রচনাবলী", "ইমদাদুল হক রচনাবলী", "এয়াকুব আলী চৌধুরী রচনাবলী" "আ:ল ফজল রচনাবলী" এবং "নজরুল রচনাবলী" (৪ খণ্ড) সম্পাদনা করেন। পুরস্কার পেয়েছেন, "বাংলা একাডেমী পুরস্কার", "মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার", এবং "নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক"।

১৯৩৮ সালের ১০ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ "দিলরুবা"

কাব্য সম্পর্কে চিঠি লিখে আবদুল কাদিরকে জানান : "তোমার 'দিলরুবা' কাব্যখানি পড়ে খুসি হলুম। ভাষা ও ছন্দে তোমার প্রভাব অপ্রতিহত। তোমার বলিষ্ঠ লেখনীর গতিবেগ কোথাও ক্লান্ত হয় না। বাংলার কবি-সভায় তোমার আসনের অধিকার অসংশয়িত। বিষয় অনুসারে যে কবিতায় তুমি মাঝে মাঝে আরবি পারসি শব্দ ব্যবহার করেছ আমার কাছে তা অসঙ্গত বোধ হয়নি।"……'বুদ্ধি ও বিবেকে'র মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট পুরুষ ছান্দসিক জনাব আবদুল কাদির আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত নাম। ১৯৮৪-তে তাঁর জীবনাশিখা নির্বাপিত হয়।

১৯৩২-৩৩ সালে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র সম্পাদক ছিলেন কুমিল্লা জেলার আমীন উদ্দীন আহমদ (১৯০৬-১৯৪৩)। ঘোরতর আর্থিক সংকটের মধ্যে তিনি ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি সাহিত্যে অনার্স ও ১৯৩৩-এ এম. এ. পাশ করেন। ম্যাট্রিকুলেশন এবং আই. এ. পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল খুলনা কাজদিয়ার হাইমাদ্রাসা, ঢাকা সরকারি মুসলিম হাইস্কুল এবং ১৯৩৬-এ ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আরবি-শিক্ষকপদে যোগ দেন। "মোসলেম" দর্পণ, "সওগাত", "মোহাম্মদী", "বুলবুল", "বিচিত্রা", "বঙ্গভূমি" প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় তাঁর মননশীল প্রবন্ধ আর কবিতা প্রকাশিত হত।

"১৯৩৮-এ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্বরচিত 'মলয়দূত' কাব্য উপহার দেন। ১৯৪৩এর ১১ এপ্রিল ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন।"[১২]

'কখনো কখনো যে নিজের সৃষ্টিকে অতিক্রম করেন স্রষ্টা, এবং লেখার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ান লেখক তার প্রমাণ আবুল ফজল। ১৯৮৩ সালের ৪ঠা মে, মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের বিশিষ্ট পথিকৃৎ, সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ আবুল ফজলের মৃত্যুতে বাংলাদেশের স্বাধীন চিন্তা তথা মননশীলতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে এক মহাশূন্যতা। সে-দেশের সাহিত্যসংসার হারিয়েছে তার বনস্পতিতুল্য অভিভাবককে, এবং দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন হারিয়েছে তার অগ্রসেনানীকে।[১৩] দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয় ৬ মে, ১৯৮৩তে মন্তব্য করা হয়েছিল এইভাবে —'আজ এই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে যখন সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীদের অনেকে বিলাসব্যসনে মগ্ন হয়ে দেশের মানুষের কথা ভুলতে বসেছেন কিংবা সংকটের কল্পনায় ম্রিয়মাণ হয়ে ভীরুতার বিবরে আত্মগোপন করেছেন, সে সময়ে আবুল ফজলের ইন্তেকাল একটি অপূরণীয় ক্ষতি।' 'জাতির বিবেক' আবুল ফজলের সাহস এবং সততাকে স্মরণ করে বলা হয় : 'আমাদের ভয়ার্ত শঙ্কালিত মুহূর্তেও তিনি ছিলেন সাহসের বার্তাবাহী।' [দৈনিক সংবাদ, সম্পাদকীয়, ৬ মে, ১৯৮৩]

স্বাধীন চিন্তক মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা আবুল ফজল কলম ধরেছিলেন সর্ববিধ মূঢ়তা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। "সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা"য় তিনি লেখেন, 'ধর্ম আর সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার……যাঁরা সংস্কৃতিচর্চাকে সব সময় ধর্মের আলখাল্লা পরাতে চান তাঁরা ধার্মিক যেমন নন তেমন নন সংস্কৃতিসেবীও।' 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি স্রেফ ভাঁওতা ছাড়া কিছু না।……এ রাজনীতি মানুষকে মেলায় না, বরং বন্ধুকে শত্রু বানায়।' [ধর্মভিত্তিক রাজ-নীতির বিপদ]। 'ঐক্যের নামে যে ধর্মের উল্লেখ করা হয়, তা অতীতে সব দেশেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।' [পাকিস্তানী জাতীয়তার বনিয়াদ]। 'বিদেশী 'ইজম্' কথাটার অর্থ কি'?—নামক আলোচনায় মুক্তবুদ্ধি আবুল ফজল মন্তব্য করেছেন 'ইসলামতন্ত্র যদি সমাজতন্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ হয় তা হলে আপন শ্রেষ্ঠত্বের জোরেই তা সমাজ-তন্ত্রকে পরাভূত করে ছাড়বে। বলা বাহুল্য ডাণ্ডার জোরে কোন কিছুরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। সূর্য জানে যে সে চেরাগের চেয়ে অনেক বড়, তাই চেরাগটাকে থাবা মেরে নিবিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করে না।' ষাটটির বেশি গ্রন্থে আবুল ফজল এইভাবেই 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দো-লনকে জোরদার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আবুল ফজল "সমকালীন চিন্তা" (ঢাকা, ১৯৭০) নামক গ্রন্থে সম-কালীন বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। সময়ের ব্যবধানে তাঁর বক্তব্যও স্বচ্ছ হয়েছে। আবুল ফজল লিখেছেন, 'রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থনৈতিক সমতা ছাড়া সামাজিক সমতা আসতেই পারে না। এ তিন ক্ষেত্রে সমতা ছাড়া সমাজ-দেহ থেকে অবিচার আর শ্রেণীগত বাবধান দূর হওয়ার নয়।' [সমকালীন চিন্তা', ঢাকা, ১৯৭০], পৃষ্ঠা ১৯৬। 'সাহিত্য-শিল্পী আবুল ফজল' (১৯৭৬) নামক জীবনী-গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে সবিশেষ মূল্যায়ন করেছেন আনোয়ার পাশা।

'বুদ্ধির মুক্তি'র চেয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি যে বাঙালি মুসলমান সমাজের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় ছিল, এ কথা এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছিল—এমন অভিযোগ করেছেন হাল আমলের কয়েকজন গবেষক। "বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি" নামক গবেষণাকর্মে নাজমা জেসমিন চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এক ধরণের বুর্জোয়া উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী আন্দোলন। এর কেন্দ্রীয় চেতনা যেমন সামন্তবাদবিরোধী তেমনি আবার মার্কসবাদবিরোধীও। এই আন্দোলন মানব-মুক্তির বস্তুগত ভিত্তিকে উপেক্ষা করে এবং সামন্তবাদী ও ভাববাদীদের মতো উদার বুর্জোয়া আইডিয়া গ্রহণ করাকেই মুক্তির পথ বলে বিবেচনা করে। এঁরা আস্থাশীল ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর। ইউরোপীয় সভ্যতার এঁরা অনুরাগী ছিলেন এবং পশ্চিমের অনুকরণে এদেশে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটাবেন বলে আশা করতেন। কিন্তু বস্তুগত ভিত্তি ছাড়া যে আধুনিকতা আসতে পারে না, সংস্কৃতির উপর-কাঠামো যে অর্থনীতির মূল কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল এই সত্যটি তাঁদের অজানা না থাকলেও তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় গুরুত্বলাভ করেনি।"[১৪]

"বুদ্ধির মুক্তি" আন্দোলনের নায়ক ছিলেন দুজন—কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন। এঁদের মধ্যে আবুল হুসেন রাজনীতি আর অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু ওই আন্দোলনের ওপর আবুল হুসেনের তুলনায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রভাব ছিল অধিক। আবদুল ওদুদ মূলত সাহিত্যিক এবং তাঁর চিন্তায় অর্থনীতি তেমন প্রাধান্য পায় নি। "সাহিত্য-সমাজ" নাম-করণেও সাহিত্যের প্রতি এঁদের বিশেষ পক্ষপাত প্রতিফলিত। এ ছাড়া "বুদ্ধির মুক্তি" আন্দোলন জনগণের আন্দোলন ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই এ আন্দোলন ছিল সীমাবদ্ধ। 'বুদ্ধির মুক্তি' রাজনীতিবহির্ভূত আন্দোলন—অল্প কিছু লোকের বুদ্ধিতে খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টির মধ্যেই এ আন্দোলনের কর্মসীমা নির্দিষ্ট ছিল।"[১৫]

পাদটীকা

১. রশীদ আল ফারুকী, চতুরঙ্গ, অক্টোবর, ১৯৮৬, শারদ সংকলন। ২. A Sociopolitical History of Bengal and the Birth of Bangladesh. কামরুদ্দীন আহমদ ; 'স্বকীয় ভূমিকার সন্ধানে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়' —ড. কামাল হোসেন, 'জিজ্ঞাসা' (১৩৮৮), বর্ষ ২, সংখ্যা ৪। ৩. শিবনারায়ণ রায়, শারদীয়া 'প্রতিক্ষণ', ১৩৯১. ৪. শিবনারায়ণ রায়, 'জিজ্ঞাসা' (১৩৮৮), বর্ষ ২, সংখ্যা ৩। ৫. 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব : বাংলাদেশ থেকে ফিরে,' 'দেশ', ২৮ এপ্রিল-২১ জুলাই, ১৯৮৪—শিবনারায়ণ রায়। ৬. চতুরঙ্গ, মে, ১৯৮৪, আলোচনা-বিভাগ, হোসেনুর রহমান। ৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ৮. রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ চিঠি, ভূঁইয়া ইকবাল, 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯১। ৯. আবদুল কাদির সম্পাদিত আবুল হোসেনের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৮। ১০. Islam in Modern India, Amalendu De. ১১. অধ্যাপক এ. ডব্লিউ. মাহমুদ এবং অধ্যাপক রেজাউল করীম বর্তমান প্রবন্ধকারকে প্রত্যক্ষ আলোচনায় বলেছেন। ১২. সূত্র ৮. ১৩. চতুরঙ্গ, মে, ১৯৮৪, আলোচনা বিভাগ, অমলেন্দু সেনগুপ্ত। ১৪. বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, নাজমা জেসমিন চৌধুরী, পৃ: ২৮৬-৮৭ ১৫. সূত্র ১৪.

তথ্য সংগ্রহে মূল সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা : ১. 'Islam in Modern India',—Amalendu De. ২. 'কাজী আবদুল ওদুদ' (ঢাকা, ১৯৭৬)—আবদুল কাদির। ৩ 'বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' অমলেন্দু দে, ৪. 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' ; 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র", ৫. 'সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল"—আনোয়ার পাশা, ৬. অতীত দিনের স্মৃতি"—আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ৭. সুনন্দর জার্নাল : 'একজন রাবীন্দ্রিকের প্রয়াণ" (৬ জুন, ১৯৭০, 'দেশ"), ৮. 'জীবন দার্শনিক ওদুদ' (২৭ জুন, ১৯৭০, 'দেশ'), ৯. 'অমৃত" (১৯ জুন, ১৯৭০), ১০. শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সরোজ সেনগুপ্তা"র আলোচনা; কাজী আবদুল ওদুদ স্মরণসভা : র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট হল, ১৮ মে, ১৯৭৪, ১১. নিরঞ্জন হালদার, 'কালি ও কলম"—(মাঘ ১৩৮০), ১২. 'পুরোগামী" (বর্ষ ৫, সংখ্যা দশ)।

কারিয়ালা

প্রশ্ন ॥ তুমি কেরা দেশ তে আয়ে, কেরা তোহাড্ডা জিলা ?
উত্তর ॥ শাড্ডা জিলা পেপসু।
প্রশ্ন ॥ তোহাগ্‌টা জাত কি হেগি ?
উত্তর ॥ নাট্‌।
প্রশ্ন ॥ তোহাড্ডি পোশিন মুসলমান জি হ্যায় ?
উত্তর ॥ নেঁহি নেঁহি ভারাওয়া। আসিঁ মুসলমান নেহি হোন্দে। আসিঁ হিন্দু হন।

উপরের সংলাপ হিমাচলের লোকনাট্য 'কারিয়ালা' থেকে গৃহীত। এই সংলাপ মূলত পাহাড়ি ভাষায়, তার সঙ্গে মিশ্রণ রয়েছে হিন্দি, উরদু আর পানজাবির।

হিমাচলের দূর পাহাড়ি গাঁয়ে আধুনিক আনন্দানুষ্ঠানের সুযোগ কম। কারিয়ালা লোকরঞ্জনের সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে। বস্তুত আনন্দ-দানই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কারিয়ালা কৌতুক-কেন্দ্রিক। অনেকে বলেন, কারিয়ালা নাট্যানুষ্ঠানের সূচনার মূলে রয়েছে পূজা-উপাসনা, যখন সারা রাত জেগে থাকতে হত দেবপূজার জন্যে (অনেকটা আমাদের শিবচতুর্দশী বা কালীপূজার মতো)। ক্রমজনপ্রিয়তার ফলে কারিয়ালা স্বয়ং প্রতিষ্ঠালাভ করে এক অনন্যনির্ভর কৌতুক-আনন্দের উৎসব হিসেবে। লোকপ্রিয় নৃত্য-গীতও কারিয়ালার রঙ্গ-ব্যঙ্গের অভিনয়ের ফাঁকে-ফাঁকে অনুপ্রবেশ লাভ করে। এগুলি গৃহীত হয় অতিরিক্ত আকর্ষণ রূপে।

দেওয়ালির আগে বা শীতের দিনে যখন কৃষিকাজ থেকে সাময়িক বিশ্রাম, তখন হিমাচলের পাহাড়ে-পাহাড়ে কারিয়ালার রঙ্গব্যঙ্গ কৌতুকনাট্যের অভিনয়।

কারিয়ালার উদ্ভব হিমাচলের মণ্ডী আর মাহাসু জেলায়। বর্তমানে শাকরোসি, ধামী অঞ্চলের কারিয়ালিদের খ্যাতি সমধিক। তারা রামপুর, থিয়োনা, সোলন, কুসুমটি প্রভৃতি অঞ্চলে যায় কারিয়ালার অনুষ্ঠান করতে। আহার্য ছাড়া এদের প্রতি-রাতে পারিশ্রমিক ২০০ টাকার বেশি।

কারিয়ালার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় হারমোনিয়ম, করনাল (শিঙ্গা),

প্রতিবেশী
সাহিত্য : সংস্কৃতি

নাগারা (মাঝারি সাইজের ঢাক), সানাই প্রভৃতি। গানের সুরে ঝুলনা, লুড্ডি, দাদরা আর কাহারবার প্রাধান্য।

একটু উঁচু জায়গায় বসানো হয় কারিয়ালার 'আখরা' (স্টেজ) যাতে চারদিক থেকে অভিনয় দেখা যায়। আখরার চারকোণে থাকে চারটি কলাগাছের চারা আর চারধার সাজানো হয় গাঁদা আর আমের পাতা দিয়ে। একটি অগ্নিকুণ্ডও রাখা হয়, যেটিকে সবাই পবিত্র বলে মান্য করে। মৃৎপ্রদীপ আর মশাল থাকে রঙ্গভূমি ঘিরে। একটু দূরে উপযুক্ত স্থানটি অথবা সবচেয়ে কাছের বাড়িটি ব্যবহৃত হয় গ্রীনরুম হিসেবে।

কারিয়ালার অভিনয়ে পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার। যথাযোগ্য বেশে সজ্জিত হয়ে মেয়েদের ভূমিকাগুলিতেও তারাই অভিনয় করে।

এই অনুষ্ঠানগুলি অনেকটা একই ধরনের। তবে যেখানে কারিয়ালা অনুষ্ঠান হয় সেখানকার লোকরুচি অনুযায়ী অল্পবিস্তর তাৎক্ষণিক সংযোজনাও হয়ে থাকে।

আসরে সর্বপ্রথম প্রবেশ সখীসহ চন্দ্রাবলীর। দুজন লোক নারীর সজ্জায়। চন্দ্রাবলীর সাজ অনেকটা লক্ষ্মীর মতো। জলন্ত ধূপবাতি হাতে ঈশ্বরের আরাধনা মিনিট দশেক। সমাপ্তি 'জয় জগদীশ হরে'র মধ্যে।

এরপর দু-তিনজন লোক আসে কৃষ্ণ এবং সখীর বেশে। সখীরা 'ব্রহ্মানন্দ'-ধর্মগ্রন্থ থেকে কৃষ্ণের ভজন গায়।

কারিয়ালার তিন বা চারটি অংশ, কিন্তু একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো সংযোগ নেই। সাধুর 'সোয়াং' (ক্যারিকেচার) দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। তিনজন সাধু গেরুয়া কাপড় পরে মঞ্চে আসে। দুজন সাধু জ্ঞানীর ভূমিকায়, একজন ভাঁড়ের। বিজ্ঞরা যা বলবে সে সবসময় তার উলটোটা করবে বা বলবে। হাসি-উপহারের পাত্র তৃতীয় এই চরিত্রটিকে বলা হয় 'চিড়নিয়ো'।

দ্বিতীয় অংশে আসে দুজন নাট এবং একজন নাটান (বা নাটি)। নাটদের পরনে লম্বা ডোরাকাটা পাজামা আর লম্বা কুর্তা। তৃতীয় নাটির হিমাচলী রমণীর পোশাক।

এই তিন নাট-নাটির অভিনয় নাটকের মধ্যে কৌতুকাবহ আর-এক নাটিকা। শুরুতে দেখা হবার পরেই প্রথম নাট দ্বিতীয় নাটের সঙ্গিনী

নাটিকে নিজের স্ত্রী বলে দাবি করে। কিন্তু দ্বিতীয় নাট বলে—রমণীটি তার স্ত্রী। এই নিয়ে কলহ। শেষ পর্যন্ত দুই নাটই মীমাংসার ভার দেয় নাটানের উপর—সে যাকে স্বীকার করে নেবে সেই পাবে স্বামিত্বের অধিকার। নাটি বলে, 'তা হলে তোমাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। দুজনের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দর কবিতা বলে মুগ্ধ করতে পারবে—তাকে আমি স্বামী বলে মেনে নেব।' নাট দুজন সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। প্রথম নাট তার কবিতা সুর করে বলতে শুরু করে।

"হোন্দিয়া না বন্দে দিয়া আশা কদি পুরিয়া।

কল্পদা হি রহন্দা বড়া (বহুৎ) ফিবৃভি রন্দিয়া আধুরিয়া।"

(**মর্মার্থ**। লোকের অনেক আশা। সারাজীবন আশা পূরণের জন্যে কল্পনা করে যায়, কিন্তু আশা পূর্ণ হয় না।) এরপর দ্বিতীয় নাট আবেগভরে গলা কাঁপিয়ে গাইতে শুরু করে—

"ই দেশ হ্যায় বীর জোয়ানকা, আলবেলে কা মাস্তানোনকা

ইশ্ দেশদা ইয়ারো ক্যা কাহানা।"

—কিন্তু এর কোনোটিই নাটিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে চলে যায়। নাট দুজন ঝগড়া করতেই থাকে।

কারিয়ালার উপরের অংশ দুটিতে রঙ্গ-ব্যঙ্গ হাসি কৌতুক দিয়ে আসর জমাবার প্রাথমিক উপকরণ। তৃতীয় অংশটিতে একটি নিটোল কাহিনী—যা বিভিন্ন চরিত্র আর বিচিত্র ঘটনাবর্তে যথার্থই নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে পূর্ণ।

এই তৃতীয় অংশে অভিনীত একটি জনপ্রিয় নাট্য-কাহিনীর উল্লেখে কারিয়ালার স্বরূপ সুন্দরভাবে বোঝা যাবে। এটিতে পিতামাতার **ইচ্ছার** বিরুদ্ধে আধুনিকা মেয়ের স্বনির্বাচিত অজ্ঞাতকুলশীল পাত্রকে বিবাহের করুণ পরিণতি রূপায়িত। নাটকের শুরু এইভাবে—

মুনসেফের মেয়ে মীনা সহেলী প্রেমলতার সঙ্গে স্কুল থেকে ফিরছিল। রাস্তায় দেখা হয় নূর মোহাম্মদ নামে এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে। নূর মোহাম্মদ নাম জিজ্ঞাসা করে মীনার। অচেনা পুরুষ তার নাম জানতে চাওয়ায় মীনা বিরক্ত হয়। কিন্তু নূর মোহাম্মদ নাছোড়বান্দা। বলে, 'আ জী, শরাফৎ সে পুছনা ভি কোই গুনাহ হ্যায়?" মীনা—'আচ্ছা, আপ থাইয়ে, আপনা রাস্তা নাপিয়ে।'

নূর মোহাম্মদ প্রথম সাক্ষাতে আর বেশিদূর না এগিয়ে চলে যায়। যাবার আগে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানায়। মীনাও হাত নাড়িয়ে উত্তর দেয়। সখী প্রেমলতা এটা পছন্দ করে না। কিন্তু মীনা খুব সহজ মেয়ে নয়, সে বলে—কই, আমি তো হাত নাড়িয়ে প্রত্যুত্তর দিই নি; গালের উপর একটা মশা বসেছিল—হাত দিয়ে সেটাকেই তাড়িয়ে দিলাম।

পরের দৃশ্য। মুনসেফ আর তার দেওয়ান অপেক্ষা করছে মীনা কখন স্কুল থেকে ফিরবে। মীনা ফিরলে মুনসেফ জিজ্ঞাসা করলেন, ফিরতে এত দেরি হল কেন? স্বভাবতই নূর মোহাম্মদের কথা বলল না মীনা, বরং বললে, স্কুলে ড্রামা ছিল বলে দেরি হয়ে গেল।

এরপরে বিরতি। বিরতির পরে মুনসেফ কোর্টের দৃশ্য। জনৈকা শ্যামলতা তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চায়। কারণ তার স্বামী অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু বছর তার থেকে দূরে। না দেয় পেটের খাবার, না পরনের কাপড়। পরনের ছিন্ন কাপড় সে বিচারককে দেখায়। বিচারক শ্যামলতার স্বামীকে ডাকেন। সব শুনে অবশেষে রায় দেন শ্যামলতার পক্ষে।

ওদিকে সন্ধের সময় মীনা বেড়াতে যেতে চায় পাহাড়ের যেদিকে নতুন রাস্তা বানানো হচ্ছে সেদিকে। উঁচু ঘরের মেয়েদের এইভাবে বাইরে বেড়াতে যাওয়া ভালো নয়, কিন্তু সহেলীর সঙ্গে কখনও-সখনও অভিভাবকেরা যেতে দেন। সঙ্গিনী প্রেমলতার সঙ্গে বেড়াতে যাবার অনুমতি পায় সে।

মীনা কিন্তু রাস্তা বানাবার দিকে না গিয়ে, স্কুল থেকে ফেরবার পথে যেখানে নূর মোহাম্মদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেখানে যায়। নূর মোহাম্মদ প্রতীক্ষায় ছিল। প্রেমলতার এই দেখা-সাক্ষাৎ ভালো লাগে না। মীনার বাবা মুনসেফকে বলে দেবে বলে ভয় দেখায়। টাকা দিয়ে প্রেমলতার মুখ বন্ধ করতে চায় নূর মোহাম্মদ, কিন্তু প্রেমলতা রাজি হয় না। আস্তে-আস্তে টাকার অঙ্ক বাড়ায় প্রেমিক এবং শেষ পর্যন্ত তখনই দশ হাজার টাকা দিতে চায়। প্রেমলতা তখন খুশি মনে তা গ্রহণ করে। কিন্তু নূর মোহাম্মদ তাকে দশ হাজার নকল নোট দেয়, আর প্রেমলতা আসল ভেবে সেই টাকা বুকের খাঁজে গোঁজে।

কাহিনী এগিয়ে চলে। রুদ্ধশ্বাস দর্শকেরা উন্মুখ আগ্রহে দেখে কারিয়ালার দৃশ্য—এরপর কী ঘটে।

মুনসেফ তাঁর দেওয়ানকে মীনার জন্যে পাত্র দেখতে বলেন। দেওয়ান বলেন, এখানকার সামাজিক নিয়মানুসারে পাত্রপক্ষই তো বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে। মুনসেফ আর দেওয়ানের কথাবার্তার মধ্যে মীনা ঘরে ফেরে, পা টিপে-টিপে। ভিতরে যেতে-যেতে পাশের ঘরের কথাবার্তা শুনে নেয় সে, আর শুনেই খবর দিতে ছোটে নূর মোহাম্মদকে। দুজনে পরামর্শ করে—কিভাবে পালানো যায়। আর এদিকে কথাবার্তা ঠিক হয়ে যেদিন বিয়ে সেই দিনই নূর মোহাম্মদের সঙ্গে পালায় মীনা। মুনসেফ পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেন। অনেক কষ্টে প্রেমিকযুগলকে খুঁজে বার করে পুলিশ। তারপর মীনার পিতা যে কোর্টের মুনসেফ সেইখানেই বিচার বসে। আদালতে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করে নূর মোহাম্মদ, সব দোষ চাপিয়ে দেয় মীনার ঘাড়ে। মীনা সব অপরাধের দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে বলে—সে সাবালিকা। নিজের ইচ্ছেমতো বর পছন্দ করার অধিকার তার আছে। পিতা আর বিচারক—দুই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে বিচারক জয়ী হল। মুনসেফ ইচ্ছার বিরুদ্ধে মীনার পক্ষে রায় দেন। আদালতের কাজ শেষ হয়ে গেলে দুঃখভারাক্রান্ত মনে, একটু পরে, মীনাকে ডেকে বলেন—জীবনে সে যেন কোনদিন আর তার কলঙ্কী মুখ তার বাবাকে না-দেখায়।

নূর মোহাম্মদ তার এলাহাবাদের বাড়িতে আসে মীনাকে নিয়ে। সেখানে এসে মীনা জানতে পারে—নূর মোহাম্মদ খুব গরিব। তা ছাড়া, পূর্ববিবাহিত, স্ত্রী এবং চার-চারটি ছেলেমেয়ে বর্তমান। হতাশা আর যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে কয়েকদিন পরেই আত্মহত্যা করে মীনা।

স্পষ্টতই, এই কারিয়ালায় পিতামাতার উপদেশ লঙ্ঘনকারী অর্বাচীন তরুণীর অভিশপ্ত জীবনচিত্র নাট্যায়িত।

এই নাটকের সমাপ্তি বিষাদের মধ্যে। কিন্তু হিমাচলের পাহাড়ি মানুষ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিরতে চায় না। তাছাড়া, তখনও রাত শেষ হয় নি। এমন সময় কারিয়ালার অনুষ্ঠান শেষ হলে উঁচু-নীচু পাহাড়ি প্রদেশে ঘরে ফিরবার বাস্তব অসুবিধা রয়েছে। তাই মীনা নাট্যকাহিনী শেষ হয়ে যাবার পরে আর-একটি রসরঙ্গভরা কৌতুকনাটিকার অভিনয়। কারিয়ালার শুরু হাস্যকৌতুকের মধ্যে, সমাপ্তিও রঙ্গ-রসের ভিতরে।

রাহলু সোয়াং-এ (ক্যারিকেচার) চারটি চরিত্র। শাহ্, শাহের মুনিম (কর্মচারী), রাহলু শাহের ভৃত্য, যার ভাবভঙ্গি অনেকটা ভাঁড়ের মতো এবং শাহানী—শাহের স্ত্রী।

শাহানী বাপের বাড়িতে। শাহ্ তাকে নিয়ে আসবার কথা বলেছে। মুনিম আর রোহ্‌লু আলোচনা করছে—কে যাবে আনতে। শেষ পর্যন্ত রোহ্‌লুকে পাঠানো হল শাহানীকে আনতে।

রোহ্‌লু আপাদমস্তক মূর্খ। তার সমস্ত হাবভাব শুধু কৌতুকের সৃষ্টি করে। দশ টাকার ভাঙানি আনতে বললে সে কাগজের নোটটাই দশ টুকরো করে নিয়ে আসে।

শাহানীকে আনতে গিয়ে দু পা এগিয়ে যাচ্ছে, আবার দু পা পেছিয়ে আসছে—এমনি করে এক সময় সে শাহানীর বাপের বাড়িতে পৌঁছল, আর সেখানে গিয়ে শাহানীকে একেবারে কাঁধে উঠিয়ে শাহের কাছে নিয়ে এসে হাজির।

শেষের দিকে অসুখে মারা গিয়েছে শাহ। শাহানী বিলাপ করে কাঁদছে। রোহ্‌লুও বিলাপ করছে, সঙ্গে-সঙ্গে সে সান্ত্বনাও দিচ্ছে। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে শাহানীকে বলছে—শাহ্ মারা গিয়েছে তো কী হয়েছে? রোহ্‌লু তো আছে, শাহানীকে বিয়ে করে সে-ই শাহ হয়ে বসবে।

দর্শকদের উচ্চ হাস্যরোলের মধ্যে পূর্বদিকের পাহাড়গুলির পশ্চাৎপট থেকে রক্তিম আভা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। শেষ হয় তিনভাগে বিভক্ত কারিয়ালায় সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠান, দর্শকরা তখন খুশি মনে ঘরের পথে।

কিরণশঙ্কর মৈত্র

"মতামত" বিভাগে **"য়্যা-ধ্বনির প্রতীকচিহ্ন"** নামে একটি রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। স্থানাভাবে তা সম্ভব হল না। রচনাটি জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ : মানবতা ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে

অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য

জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিরূপে রবীন্দ্রনাথ কামনা জানিয়েছিলেন :

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক।
আর কিছু নয়
এই হোক শেষ পরিচয়।

[পরিচয়, সেঁজুতি, ১৩ মাঘ, ১৩৪৩]

উদ্ধৃত কাব্যাংশটির 'আর কিছু নয়' এই সরল শব্দ তিনটির প্রতি লক্ষ রাখলেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক, মহামানব, বিশ্বপথিক, কবিসার্বভৌম ইত্যাদি মহান, সমুচ্চ ও সাধারণের অনধিগম্য পরিচয়ের নভঃস্পর্শী গৌরবের রশ্মিচ্ছটা মুছে ফেলে তাঁর যে পরিচয়টুকুকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রূপে চিহ্নিত করে রাখতে চাচ্ছেন, তা হল তিনি মানুষেরই কবি।

এই দাবির যৌক্তিকতা বিচারের পূর্বে একটা বিষয় চিন্তনীয়। যিনি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত, বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজে দার্শনিক এবং মহামানবরূপে স্বীকৃত, এবং স্বদেশে ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা গুরুদেবরূপে নিয়তনন্দিত, তিনি এই পরিচয়টুকুর জন্যে আকাঙ্ক্ষিত কেন? যিনি আত্মকথনে সদা-সংকুচিত, আঘাতে-অপমানে জর্জরিত হয়েও অসাধারণ আত্মসংযমে সমাহিত—সেই কবি এখানে যেন তাঁর অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে প্রার্থী-রূপে প্রকাশিত। যেন তাঁর হাতের মুদ্রা সফলতার শীর্ষে বসেও বরাভয়ের পরিবর্তে মাধুকরীর ভঙ্গিমায় রূপান্তরিত। এর অন্তর্গূঢ় কারণটি বিশ্লেষণ-যোগ্য।

যে-কবির উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত মানবতারই তীর্থ-পরিক্রমা, তাঁকেও বারবার এই অভিযোগ শুনতে হয়েছে যে তিনি অতিলৌকিক জগতের অধিবাসী। যুধিষ্ঠিরের রথের মতো মাটির সঙ্গে তাঁর কাব্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এই অভিযোগে ইন্ধন জুগিয়েছে তাঁর বংশপরিচয়, তাঁর চেহারা, তাঁর পোশাকপরিচ্ছদ। শুধু নিন্দুকের দলই নয়, তাঁর ভক্তমণ্ডলীও দেবতার জ্যোতির্বলয়ের মতো তাঁদের গুরুদেবকে ঘিরে এমন এক ভাবপরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিলেন, যে ব্যূহ ভেদ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিল কঠিন। অধিকন্তু তাঁর চরিত্রে ছিল এক ধরনের দার্শনিক নিস্পৃহতা আর সহজাত আভিজাত্য যা তাঁকে সাধারণের থেকে দূরে রেখেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এদেশে কোনদিনই বাঞ্ছনীয় নয়।

এই কারণগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির কিছু বক্তব্য যা আত্মসমীক্ষার নামান্তর এবং অনেকাংশে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ বিনয়বচন। কিন্তু সেগুলিকেও জবানবন্দীর মতো ব্যবহার করে তাঁকে শনাক্ত করা হয়েছে অপরাধী-রূপে।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

বা মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

["জন্মদিনে", ১০ সংখ্যক কবিতা]

অনেক ক্ষেত্রে মূল কবিতার উপজীব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর তূণ থেকে সংগৃহীত এ-জাতীয় উক্তিগুলি প্রতিপক্ষ মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন তাঁরই বিরুদ্ধে। যেন ইচ্ছে করেই ভুলে যাওয়া হয়েছে—সমালোচ্য কবিতার মূল উদ্দেশ্য আত্মসমালোচনাই নয়, গণসাহিত্যের নামে যে কৃত্রিম পশরা সাজানো হচ্ছিল, সে সম্পর্কে সময়োচিত সাবধান-বাণী :

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ। [ঐ]

কবির এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা কতখানি, ইতিহাসই তার বিচার করেছে। প্রদীপ্ত যৌবনে যে কবি-মানস উদ্দীপ্ত আবেগে ঘোষণা করেছিল :

এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা—এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—
— — — — —
কবি তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।

[এবার ফিরাও মোরে—চিত্রা]

কর্ম-জীবনের বাস্তবতায় তা রূপায়িত হয় নি বলে কবির মনের কোণে একটা বেদনাবোধ কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। সেই বেদনাবোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উত্তরজীবনে বারবার। কিন্তু তা কি তাঁর ভাববাদিতার লক্ষণ, না মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসারই নিবিড় পরিচয়—সহানুভূতির সঙ্গে তা বিবেচিত হয় নি। রবীন্দ্রমানসে ধ্যানী ও কর্মী সত্তার একত্র সমাবেশ তাঁর চিরগতিশীল ব্যক্তিত্বেরই স্বাক্ষর। এই দুই সত্তারই টানাপোড়েনে নির্মিত তাঁর চিরচঞ্চল, চিরসন্ধানী জীবনের সামগ্রিকতা। আমরা দেখব, কবির জীবনবিহঙ্গ যতই উড়ুক নিঃসীম নভোনীলিমায়, সে বারে বারে ফিরে আসে মাটিতেই, যেখানে তার স্থায়ী নীড় বাঁধা। তাই 'কী পাই নি তার হিসাব' না মিলিয়ে, কী পেয়েছি তাঁর মধ্যে, তার হিসেব করলে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির ভ্রান্তি আর অস্পষ্টতা দূর হবে এবং আমাদের অন্বিষ্টও সিদ্ধ হবে।

প্রথম যৌবনে রচিত "কড়ি ও কোমল" কাব্যের ভূমিকায় পরবর্তী কালে "কবির মন্তব্য" অংশে কবি লিখেছেন : 'এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

যা "নৈবেদ্যে" আর-এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' মানবপ্রেম এবং মর্ত্যপ্রীতি—যা তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনার বীজমন্ত্র, তার সূচনা যৌবনের প্রারম্ভেই।

কবির ব্যক্তি-জীবন আর সাহিত্যজীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হল পূর্ণ যৌবনে যেদিন পিতার আদেশে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে কবিকে যেতে হল পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে জমিদার-রূপে। জমিদার রবীন্দ্র-নাথের মাসিক বৃত্তি তিনশ টাকা। এবং এই আয়েই তাঁকে সংসারের দায়িত্বপালন, অতিথিসংকার, বইপত্র কেনাকাটা এবং নানা আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার নির্বাহ করতে হয়েছে। পদ্মাতীরের এই জমিদারিতেই তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে বিচিত্র সাহিত্যের সোনার ফসলে। রচিত হয়েছে "সোনার তরী", "চিত্রা", "চৈতালী" কাব্য এবং "গল্প-গুচ্ছে"র গল্পগুলি। এগুলির মধ্যে কবির কোন্ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে? শুধুই কি প্রমত্তা পদ্মার জ্যোৎস্নাবিধৌত রূপের মুগ্ধ আরতি বা তরুছায়ামসীমাখা মেঘেঢাকা গ্রামের সিলুয়েট ছবি? সামন্ততান্ত্রিক শোষণে জর্জর গ্রামীণ কৃষক-মজুরের সম্পর্কে কতখানি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি থাকলে লেখা সম্ভব—

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির—
মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ ; নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে—
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।

[এবার ফিরাও মোরে—চিত্রা]

অথবা গল্পগুচ্ছের "শাস্তি" গল্পের সেই আকস্মিক হত্যা-দৃশ্যের পশ্চাৎপটে তিল তিল করে জমে থাকা জীবন-যন্ত্রণা ও অসহায় বিক্ষোভের নাটকীয়তা-বর্ণিত বর্ণনা :

'ক্ষুধিত দুখিরাম আর কাল বিলম্ব না করিয়া বলিল, 'ভাত-দে'। বড়ো বউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মতো একমুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া উঠিল, 'ভাত কোথায় যে দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।'

'সারাদিনের শ্রান্তি আর লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কখন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, 'কী বললি'। বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।' কোন্ পটভূমি চিরসহনশীল এই মানুষটিকে হত্যাকারী করে তুলল?

'হুশিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারিঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্রলোকমাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদাস্ত করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জলপড়িতেছিল, তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে—উচিতমতো পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে সকল অন্যায় কটুকথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।'

উদাহরণ-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। একটি উল্লেখই যথেষ্ট যে গল্পগুচ্ছের তিনটি খণ্ডের ৯০টি গল্পের প্রায় সব কটিরই পটভূমি গ্রাম-বাঙলা আর তার সাধারণ মানুষ আর সেই মানুষের জীবনসমস্যা।

এ-পর্বের সাহিত্য নির্জন অবসরের আত্মরতি নয়, দার্শনিক চিন্তাবিলাসও নয়—বিচ্ছিন্নতা এবং একাকিত্ব থেকে মুক্তি এবং সজীব মৃত্তিকার আহ্বান :

আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
ওগো মা মৃন্ময়ী
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই
ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে। [বসুন্ধরা : সোনার তরী]

বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে এগুলি কোনো প্রক্ষিপ্ত অংশ-মাত্র নয়। কবির মানসলোক এবং সাহিত্যসাধনার মূলে অনুস্যূত যে মানবতাবোধ—এ তারই উদ্যোগপর্ব। এবং এই সাহিত্যরচনার ফাঁকে-ফাঁকেই চলেছে জমিদারি পরিচালনায় অভিনব সব পদক্ষেপ যেগুলি স্মরণ করলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, তথাকথিত ভাববাদী কবি বাস্তব তথা প্রগতিশীল কর্মোদ্যোগে আমাদের লজ্জা দিতে পারেন।

জমিদারি চালাতে গিয়ে প্রথমেই চিরাচরিত প্রথার মূল ধরে টান দিলেন কবি। পুণ্যাহের উৎসবে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী জমিদার, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রজাদের জাতি-অনুযায়ী ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা তুলে দিলেন। এ নিয়ে চরম বিক্ষোভ হল। আমলারা একযোগে পদত্যাগ করলেন প্রতিবাদে। শান্ত অথচ দৃপ্ত ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

'এই মিলন-উৎসবে পরস্পরে ভেদ সৃষ্টি করে মধুর সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া চলবে না। প্রিয় প্রজারা, তোমরা সব পৃথক আসন, পৃথক ব্যবস্থা সব সরিয়ে দিয়ে, একসঙ্গে বোসো, আমিও বসবো। আমি তোমাদেরই লোক।'

এবং এই দিনেই জমিদার হিসাবে প্রথম কর্মসূচীর ঘোষণা :

'সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে। এটাই আমার সর্বপ্রধান কাজ।' মহাজনি শোষণ থেকে গরিব কৃষকদের মুক্তি আন্দোলনের নৈতিক দায়িত্ব তরুণ জমিদার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে স্বেচ্ছায়। অধিকন্তু

'যে যুগে আই. সি. এস. বা ব্যারিষ্টারী পড়া ধনী বাঙালী পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য, সেই সময় ধনী জমিদার রবীন্দ্রনাথের পুত্র, বন্ধুপুত্র ও জামাতাকে তার বদলে চাষবাস শিখতে বিদেশ পাঠানো অভূতপূর্ব দুঃসাহসিক ঘটনা। বলা বাহুল্য এই বিদেশ যাত্রার পেছনে কাজ করেছে জমিদারীর উন্নতি-বিধান এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও ফসল নিয়ে পরীক্ষার তাগিদ।"

['জমিদার রবীন্দ্রনাথ'—অমিতাভ চৌধুরী]

'তৈলঢালা স্নিগ্ধতনু নিদ্রারসে ভরা—

মাথায় খাটো, বহরে বড়ো বাঙালী সন্তান'কে শুধু—মৌখিক ধিক্কার জানিয়ে বা বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত করতালির মধ্যে কর্তব্যের যবনিকা না টেনে রবীন্দ্রনাথ হাতেকলমে কাজ শুরু করলেন এই উদ্দেশ্যকে মনে রেখে—

'আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা-অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে।'

এই উদ্দেশ্যেরই ফল সমবায়প্রথা, গ্রামীণ কৃষি-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, পুত্র রথীন্দ্রনাথের সহায়তায় উন্নত প্রথার চাষ। ব্যবহৃত হয় ট্রাকটর, পামপসেট, কৃষি-ল্যাবরেটরি। সেচ, পথ-নির্মাণ, কুটিরশিল্প এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও বাদ যায় নি। মনে রাখতে হবে, এগুলি ৭০ বছরেরও আগের ঘটনা এবং "বুর্জোয়া কবি"ই বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের পথিকৃৎ।

গ্রামবাঙলার চিরস্থায়ী ব্যাধির জীবাণুগুলিকে সন্ধানী দৃষ্টির অনুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সেই ব্যাধির প্রতিবিধানের জন্য বক্তৃতা-বটিকার পরিবর্তে বাস্তব কর্মোদ্যোগে যোগদান করেছেন পদ্মাতীরের পলিমাটি থেকে শান্তিনিকেতনের লাল মাটিতেও। স্বদেশ এবং সমাজের যে চুলচেরা বিশ্লেষণ কবি করেছেন "কালান্তর"-এর প্রবন্ধাবলীতে, তার তুল্য বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা এবং ভাবুকতার বাষ্পহীন সত্যের স্বচ্ছ আলোকবিচ্ছুরণ বাঙলা সাহিত্যে তুলনারহিত। আর আবেগসর্বস্ব এই দেশে রবীন্দ্রনাথ যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি, তা তাঁর এই উচ্ছ্বাসবর্জিত বৈজ্ঞানিক মনন এবং সত্যের উলঙ্গ উন্মোচনের জন্যই। "শিক্ষা" গ্রন্থের "ছাত্রদের প্রতি-সম্ভাষণ" নিবন্ধে দেশপ্রেমের ভাবোচ্ছ্বাসের অন্তঃসার-শূন্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, তাহা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।'

চিরাভ্যস্ত জড়তার অচলায়তনকে ভেঙে ফেলে মুক্ত-মতির মুক্তধারার প্লাবনকে অবাধ করাই রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা। বিচিত্র ব্যাপার এই—সমালোচনার দোধার তলোয়ারের আঘাত সইতে হয়েছে কবিকে—একই সঙ্গে ভাববাদিতা এবং ভাববাদিতার বিরোধিতার জন্যেও।

তাই দীর্ঘ জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই যিনি কাটিয়েছেন গ্রামবাঙলায়—মাটির টানে—দেশের প্রাণ-কেন্দ্রে, তার সমস্যাসঙ্কুল জটিলতার সঙ্গে জড়িয়ে তারই বন্ধনমুক্তির সাধনায়, তিনিই অভিযুক্ত হয়েছেন গজদন্ত-মিনারের অধিবাসী বলে। বৃদ্ধ বয়সে বড়ো দুঃখেই তাই বলেছেন :

'লোকে অনেক সময়েই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা? অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়। যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালো-বাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি—তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহঙ্কারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধা বুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না।"

[বাঁকুড়ায় প্রদত্ত সংবর্ধনার প্রত্যভিভাষণ]

কিন্তু বাঁধাবুলির দেশে স্বাধীন চিন্তা অবাঞ্ছনীয়, এবং বস্তুবাদের ঢক্কানিনাদের কাছে হৃদয়ের ভালোবাসার বংশী-ধ্বনি সহজেই চাপা পড়ে।

পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণ। সেখানেও সেই কর্মী-সত্তা। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি একক চ্যালেনজ। সত্যের সন্ধানে 'একলা চলো রে'। স্ত্রীর গায়ের গয়না বিক্রি করে ইস্কুল চালানো, নোবেল-পুরস্কারের সম্পূর্ণ টাকা গ্রামীণ-ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া (যে ব্যাঙ্ক পরে ফেল পড়ে)—এসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথের কোন্ পরিচয়কে বিজ্ঞাপিত করে, তা চিন্তনীয়।

ধর্মীয় আচারের অন্ধত্বের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী উদ্যত খড়্গের মতো এবং সে খড়্গ ধ্বংসের জন্য পাশবিক উল্লাসে ক্ষিপ্র নয়,—যুক্তির শানে শানিত :

'মনে রাখা দরকার ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধূ ধূ করে। তার উপরে, সেই অচলতাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

'ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে।……ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড়ো অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম—আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে অধর্ম।"

["কর্তার ইচ্ছায় কর্ম", "কালান্তর"]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম মানুষের ধর্ম এবং কালের যাত্রায় তিনি মানবধর্মেরই চারণ-কবি। তাঁর ঈশ্বর-চেতনার মূলে আছে এই সতর্ক সচেতনতা—

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি,
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।

ধর্মীয় প্রথার কাছে প্রেমের বলিদানের মর্মান্তিক ছবি এঁকে শেষ পর্যন্ত মানবপ্রেমকেই জয়ী করেছেন কবি "বিসর্জন" নাটকে—ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতিনিধি রঘুপতির কালীপ্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্নায়ু দুর্বল হয়ে যায়, স্থবিরত্ব তাকে গ্রাস করে,—শুধু দেহে নয়, মনেও। রবীন্দ্রনাথ যেন এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম। তাই তাঁর জীবনসায়াহ্নে 'পউষের পাতাঝরা তপোবনে' টলে পড়ে 'বসন্তের মাতাল বাতাস', বার্ধক্যের বিশ্রান্তি মুখর হয়ে ওঠে যৌবনের চঞ্চলতায়। আহ্বান জানান 'দুরন্ত' 'জীবন্ত' 'অশান্ত' 'প্রচণ্ড' 'প্রমত্ত' 'প্রমুক্ত' 'অমর' যৌবনকে জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে 'অফুরান প্রাণ' দেদার ছড়িয়ে দেবার জন্য।

জীবনসূর্য অস্তাচলগামী পশ্চিম দিগন্তের প্রদোষ-চ্ছায়ায়। কিন্তু 'বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা দেয় আলো।' এই অন্তরবির শোণিমায় কষিত কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কবির শেষ পর্যায়ের কাব্য—বেদধ্বনির মতো সরল, সংহত। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে 'রবীন্দ্রোত্তর' যুগের সোচ্চার ঘোষণা—কবি যাকে ঠাট্টা করে বলেছেন 'রবীন্দ্রধুত্তোর' যুগ। সে সময়ের উদীয়মান কবি অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত পস্টাপস্টি লিখেই ফেললেন—'সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর।' সমস্যা এখানেই—সত্যের প্রতিষ্ঠা চিৎকৃত ঘোষণায় হয় না। নিয়ত-সর্জমান কবির অফুরন্ত প্রাণশক্তি তখনো অম্লান, তখনো অনতিক্রম্য। সমসাময়িক পৃথিবীর প্রতি নিয়ত-সজাগ, তার অভিঘাতে আন্দোলিতচিত্ত কবি যেন পুনর্বার নিজেকে ভেঙে গড়লেন। সত্তার গভীর—গভীরতর প্রদেশে সৃষ্টি হল আলোড়ন—জাগল নতুন প্রশ্ন, আজাবনলালিত স্থির প্রত্যয় কম্পিত হল সভ্যতার বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে। শেষপর্বের কবিতায় তারই অগ্নিস্বাক্ষর :

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো
নিম্নে নিবিড় অতি-বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।
দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল
জাগিয়া উঠিছে গুপ্তগুহার
কালনাগিনীর দল।
[দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা। [প্রায়শ্চিত্ত : নবজাতক

তবু ইতিহাসের এই মসীকৃষ্ণ প্রেতচ্ছায়ার মধ্যেও কবি সৃষ্টির আলোকস্বপ্ন দেখেছেন, যে আলোর দিশারি হবে মানুষই।

সৃষ্টির হোমানলে হাসিমুখে যে-মানুষ আত্মাহুতি দেয়, সেই অতুলনীয় মানবমহিমার উদ্দেশে জানালেন প্রণতি :

দেহ-দুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা—
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি
সাথে সাথে পথে পথে—
এমন সেবার উৎস আগ্নেয় গহ্বর ভেদ করি
অফুরান প্রেমের পাথেয়।
[রোগশয্যায় / ৫ সংখ্যক কবিতা]

বার্ধক্যের একটা ধর্ম অতীতের রোমন্থন, কৃতকর্মের স্মরণ, অকৃতকর্মের জন্য চাপা দীর্ঘশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের শেষ-পর্বের কবিতায় এই সালতামামি অনেক স্থানেই প্রকাশিত এবং লক্ষণীয়, সেইসব আত্মসমীক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর অবমূল্যায়নের হেতু। এই পর্যায়টি আলোচনা করলে কবির

বিরুদ্ধে আনীত মূল অভিযোগের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং কবির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সেই অভিযোগগুলির যাথার্থ্যও নিরূপিত হবে।

আর আছে সেই বক্ষলগ্ন কাঁটা—যার অস্তিত্ব এই পর্বে থেকে-থেকেই মনে করিয়ে দিয়েছে সেই ব্যর্থতাবোধ, অগীত সংগীতের জন্য সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। সংগ্রামী মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে না-পারার অক্ষমতার জন্য বেদনাবোধ।

এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি 'বুর্জোয়া'-অপবাদের চান্দ্রায়ণে, নাকি এর অন্তর্লীন গভীর মানবতাবোধের প্রকৃত মূল্যায়নে, সেটাই বিচার্য। মানবতার প্রতি কী গভীর সম্মান নিবেদিত হয়েছে এই কবিতারই শেষাংশে, তার আন্তরিকতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না—

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়-জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায় ;
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে—
মর্তের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে 'পৃথিবীর কবি'র উদাসীন পৃথিবীর কাছে সেই নির্মোহ নিবেদন : 'দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে।'

[পত্রপুট / ৩-সংখ্যক]

'পুনশ্চ'-র 'শিশুতীর্থ' কবিতায় "জয় হোক মানুষের, জয় নবজাতকের, জয় চিরজীবিতের"—শাশ্বত মানবাত্মার এই জয়ধ্বনি শুধু উচ্চকিত ঘোষণা হয়েই অবসিত হল না, অনাদ্যন্ত কালের সেই মানবযাত্রায় সকল অভিধা সকল স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে কবি সহযাত্রী হলেন, সার্থক হলেন, ধন্য হলেন :

হে চিরকালের মানুষ, হে সকল কালের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে।
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।
[পত্রপুট / ১৫-সংখ্যক কবিতা]

দীর্ঘজীবনব্যাপী সমস্ত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, চরিতার্থতার আনন্দ আর অচরিতার্থতার গ্লানির ঊর্ধ্বে, ইতিহাসের ঘনায়মান প্রেতচ্ছায়ার মসীকৃষ্ণ তমসার মধ্যেও করে গেলেন চির-অপরাজেয় মনুষ্যত্বের জয়ঘোষণা শেষ জন্ম-দিনের এই বাণীতে :

'আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ ; কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। —মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।'

[সভ্যতার সংকট]

আর চাইলেন শেষ জন্মদিনের কবিতায় মানুষেরই কাছে এইমাত্র মানবিক কামনার 'শেষ-পারানির কড়ি'—মানুষের ভালোবাসা।

রবীন্দ্রসাহিত্যের মর্মদিশারি দার্শনিক সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবের এই বক্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় : 'কোনো কোনো দিক দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য পূর্বতন মূল্য হারিয়েছে ; আবার অন্য দিক থেকে নবযুগোচিত মূল্য সঞ্চয় করেছে ততোধিক। এ অনিত্য জগৎ ও জীবনে কাব্য-বিচারের মাপকাঠিও স্বভাবতই পরিবর্তনশীল। তবে জামা-কাপড় গয়নাগাঁটি দাড়িগোঁফের ফ্যাশানের মতো বছরে বছরে সাহিত্যের মূল্যায়ন বদলালে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বনাশ ঘটবে। মহত্তম মূল্যের পুনর্বিচারে, revaluation-এ, আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে, স্থবিরতা বর্জন করতে হবে ধাবমান সাহিত্যিক ফ্যাশানের পিছনে না-ছুটে।'

[সূচনা : পান্থজনের সখা]

বস্তুবাদী / জড়বাদী সমালোচনার নিরিখে রবীন্দ্র-নাথকে ভাববাদী এবং দোলাচলচিত্তরূপে বিচারের প্রবণতা এবং 'বুর্জোয়া কবি'রূপে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ঝোঁক আজো অবসিত হয় নি। আবার

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁর রচনায় প্রতিক্রিয়ার দূষিত অংশগুলিকে বাদসাদ দিয়ে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থাও লক্ষিত হয়। সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি নিয়ে অমীমাংসিত বিতর্ক-জালে না জড়িয়েও এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই। রসোত্তীর্ণতাই সাহিত্যের প্রথম এবং শেষ কথা। তার বাণী-নির্মিতিতে কোন্ মতবাদের কতটা মালমশলা খরচ হয়েছে, তার পরিসংখ্যান অপ্রয়োজনীয়। একজন কবি কেন কলম ছেড়ে ফেস্টুন ধরলেন না—এ অনুশোচনা শুধু অনর্থকই নয়, অবান্তর। তিনি যা লিখলেন, তা সাহিত্যসৃষ্টি হল কিনা—এটাই বিচার্য। বিদ্রোহী কবিরূপে চির-চিহ্নিত নজরুল কেন 'গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি, রঙীন প্রেমের গাই গজল' লিখলেন, এই বালখিল্য জিজ্ঞাসায় সাহিত্যরসিক মুচকি হাসবেন মাত্র। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত কবিতাটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়,
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো
পদলালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ জানো—

যিনি কবিতাকে নির্বাসন দিয়ে গদ্যের কড়া হাতুড়িকে বরণ করে নিলেন, বেদনার বিষজ্বালায় জর্জরিত সেই নীলকণ্ঠ কবি সেই বক্তব্য গদ্যে প্রকাশ না করে কবিতায় করলেন কেন? অধিকন্তু, এইটিই কি তাঁর শেষ কবিতা? এর উত্তর,—যিনি জাতকবি, কবিতা না-লিখে তাঁর মুক্তি নেই। আমৃত্যু এক অতৃপ্ত এষণা তাঁকে চালিত করবে, তাড়িত করবে সেই কবিতা-রূপিণী অধরা মায়াবিনীর অভিমুখে—হৃদয়ের গোপনচারী সব স্বপ্নসাধ, আঘাত-ব্যর্থতা, অনুভূতি-আকুতি তারই পায়ে ঢেলে দেবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক বা প্রগতিশীল নন। যুগযন্ত্রণার কবি নন—গায়ের জোরে একথা সহজেই বলা যায়। আধুনিকতার অর্থ যদি হয় অন্ধ আবেগের বিরুদ্ধে যুক্তিনির্ভর সত্যসন্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্মোহ মানসিকতা, প্রগতিশীলতার অর্থ যদি হয় সমসাময়িকতার স্রোতের প্রতিকূলে যাবার সাহসিকতা এবং অনাগত ও কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য নিরন্তর সংগ্রামশীলতা, তাহলে রবীন্দ্রনাথের তুল্য ব্যক্তি আজো দুর্লভ। যেদেশে প্রগতিশীলতার নির্মোকের অন্তরালে কুসংস্কারের প্রথানুবর্তন, আধুনিকতার বিজ্ঞাপিত প্রচ্ছদের আড়ালে পল্লবচারিতা এবং যুক্তিহীন আবেগের পোষকতা, মতবাদের ফতোয়ার আবরণে গুরুবাদের ফুস্‌মন্তর ও ব্যক্তিমানসের স্বাধীনচিন্তার না ভিখাস, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আজো এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

দীর্ঘজীবী এই কবির সংবেদনশীল চিত্তলোক বারেবারে আলোড়িত হয়েছে সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাতে। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্মীয়—কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিকই উপেক্ষিত হয় নি তাঁর বিশ্ববিসারী মানসলোকে।

স্বদেশের অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি, সামাজিক এবং জাতিগত বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্তঃপুরচারিণী নারী-সমাজের অবরুদ্ধ বেদনা, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আগ্রাসন, ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা, ঔপনিবেশিক শিক্ষার ছলনা, হিটলারি স্বৈরাচারের বীভৎসতা—কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এবং তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনার মূলে আছে একটি সদাজাগ্রত যুক্তিবাদী মন। তাই গান্ধীজীকে "মহাত্মা" আখ্যা দিয়েও চরকা-আন্দোলন-জাতীয় মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি, যৌবনের দূতরূপে বরণ করে নিয়েছেন তরুণ সুভাষচন্দ্রকে, সশ্রদ্ধ ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নিবেদিত-আত্মা ও প্রাণশক্তির প্রতি।

সত্যের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও তাকে শান্তচিত্তে গ্রহণ করার যে জীবনব্যাপী সাধনা, তার পরিসমাপ্তি ঘটল কঠিন সত্যকে ভালোবাসায়। সেই নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিক, নিষ্ঠুর সত্যের বরণমন্ত্র উচ্চারিত হল প্রয়াণের প্রাক্কালে—

সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

আন্তরিক রবীন্দ্রচর্চা ও চর্যার ফল আমাদের চিত্তশুদ্ধি। যে শান্তির অভাবে আমরা প্রতিমুহূর্তেই যন্ত্রণা অনুভব করছি, যার আশায় বিভ্রান্ত-চিত্তে 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' বলে ছুটে বেড়াচ্ছি, তার সন্ধান আমাদের হাতের কাছেই আছে। তারই নাম রবীন্দ্রনাথ।

* এই রচনাটি অনিবার্য কারণে মে ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

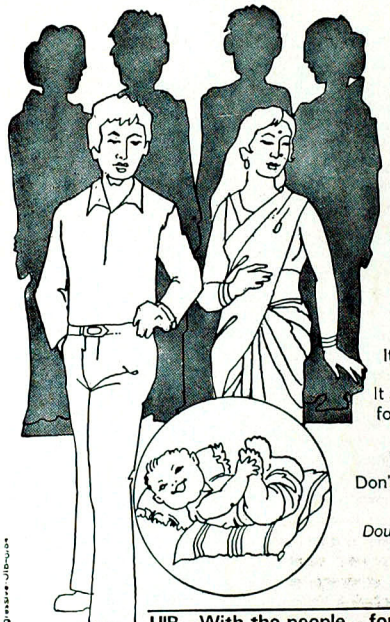

IN-LAWS OR OUTLAWS

There is nothing like a dowry to give any marriage a bad name And a bad start

It takes your son's pride away
It makes your daughter lose her dignity
It strains family relations for generations to come

Help eradicate dowry.
Educate your children
Don't subsidise a marriage

Remember,
Dowry is prohibited by law.

UIB—With the people ... for the people.

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED
Head Office : 17, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001
Regd. Office : 7, Red Cross Place, Calcutta-700 001